বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

গবেষক

এস. এম. জাওয়াদুন নাহীন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর – ১০০/২০১৩-১৪

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০১৮

অবতরণিকা

আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনামা '*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল বাছিরের তত্ত্বাবধানে আমি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল. গবেষণা কর্মে যুক্ত হই। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর কর্মজীবনের নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বর্তমানে আমি এ অভিসন্দর্ভটি মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপনে সক্ষম হয়েছি। বিশাল ও বিস্তৃত এ কাজটি করতে যেয়ে আমি প্রথমেই আমার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ককে স্মরণ করছি। গবেষণা কর্মের শুরু থেকে শেষ অবধি তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। গবেষণা কর্মের শিরোনাম নির্বাচন থেকে শুরু করে তথ্য সংগ্রহ, অধ্যায় বিন্যাসকরণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও সুচিন্তিত মতামত আমাকে গবেষণা কর্মে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে। গবেষক হিসেবে আমি তাঁর কাছে যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি তা আমার কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে। ছাত্র ও গবেষক হিসেবে আমি তাঁর কাছে ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে এম.এ. সম্পন্ন করেই আমি শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করি। কর্মজীবনের নানা বাঁধা উপেক্ষা করে এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান স্যারকে। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি আমাকে পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করেছিলেন। আমি এম.ফিল. প্রথম পর্বে স্যারকে আমার কোর্স শিক্ষক হিসেবেও পেয়েছি। বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্তের সংবাদ দিয়ে তিনি আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এম.ফিল. প্রথম পর্বে আমার অন্য একজন কোর্স শিক্ষক ছিলেন অধ্যাপক আতাউর রহমান বিশ্বাস। পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে নানাভাবে যে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তা আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এম.এ. 'খ' শাখার ছাত্র হিসেবে ক্লাসে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ

ইব্রাহিম স্যারের আলোচনা ও পর্যালোচনা এবং তথ্য-উপাত্তের উৎকর্ষতায় আমি প্রতিনিয়ত বিমোহিত হয়েছি যা আমাকে বর্তমান গবেষণার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। স্যার সহ বিভাগের সকল শিক্ষকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনা করার প্রয়োজনে আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কথা। এছাড়াও পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমি হতেও প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ সকল কাজে সহযোগিতার জন্য আমি গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি আমার পিতা এ. বি. এম. সাইফুল ইসলাম এবং মাতা জহুরা নাছিমা বেগমকে। তাদের সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ছিল বলেই আজ আমি এ অবস্থানে পৌছাতে পেরেছি। এই গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যার অবদান সর্বাধিক তিনি হলেন আমার স্ত্রী রোবাইয়াত আলম ঋতু। নিজ চাকরি এবং সাংসারিক নানা ব্যস্ততার মাঝেও সে আমাকে গবেষণা কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছে। আমার গবেষণার ব্যাপারে তাঁর যে আগ্রহ লক্ষ্য করেছি তা আমাকে নিরন্তর প্রেরণা দান করেছে। স্মরণ করছি শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আব্দুর রহমানকে। স্যার আমাকে গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগের জন্য যে সুযোগ করে দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান জনাব আবদুল গাফফার খান এবং বিভাগের সহকর্মী জনাব আব্দুল মুকিত কাবিল এর কাছ থেকেও গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ ও উৎসাহ পেয়েছি। এছাড়াও অন্যান্য আরো যাদের সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় আমার এ গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত হয়েছে তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এস. এম. জাওয়াদুন নাহীন
এম.ফিল. গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

অবতরণিকা

ভূমিকা ১-১৯

প্রথম অধ্যায় ২০-৪৮

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি রাজস্ব নীতি এবং নতুন সমাজবিন্যাস

দ্বিতীয় অধ্যায় ৪৯-৮২

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যনীতি এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির উন্মেষপর্ব

তৃতীয় অধ্যায় ৮৩-১১৩

ব্রিটিশ শিক্ষানীতি ও মধ্যবিত্তশ্রেণির রূপরেখা

চতুর্থ অধ্যায় ১১৪-১৪৩

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব

পঞ্চম অধ্যায় ১৪৪-১৮২

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিকাশ ও ভাবধারা

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৮৩-২১০

বঙ্গীয় রেনেসাঁসে কৃষকশ্রেণির প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান বিচার

উপসংহার ২১১-২১৮

গ্রন্থপঞ্জি ২১৯-২৩২

ভূমিকা

'*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' শীর্ষক গবেষণার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল ঔপনিবেশিক বাংলা। মুঘল সম্রাট জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) ১৫৮২ সালে সুবা বাঙলার যে রূপরেখা দেন তা ব্রিটিশ শাসনামলে ছিল বাংলা ভাষাভাষী একটি প্রদেশ। এই প্রদেশটি ভারতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বেঙ্গল প্রদেশ হিসেবে অভিহিত হত। তখন এই প্রদেশটি অবশ্য বাংলাদেশ ও বাংলা উভয় নামেই পরিচিত ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামল থেকেই বাংলা ভাষাভাষী ভূ ভাগটি বাঙালা বা বাংলা নামে পরিচিত হয়। এর পূর্ববর্তী যুগে অর্থাৎ হিন্দু এবং বৌদ্ধ যুগে এ অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিলক্ষিত হয়। যেমন বলা যেতে পারে – পশ্চিম বাংলা রাঢ় এবং উত্তর বাংলা বরেন্দ্র, লক্ষণাবতী ও পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত ছিল। আবার উত্তর ও পশ্চিম বাংলার কিছু অংশকে গৌড় নামে অভিহিত করা হত। অন্যদিকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা বঙ্গ, সমতট, বাঙ্গাল ও বাংলা নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে ইলিয়াস শাহী বংশের (১৩৪২-১৪১৫ খ্রি.) শাসক সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-৫৮ খ্রি.) সর্বপ্রথম এ সকল অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন। এ সময় হতেই সমগ্র বাংলা অঞ্চলটি সুলতানের গৃহীত উপাধির সাথে (শাহ-ই-বাঙ্গালা ও সুলতান-ই-বাঙ্গালা) মিল রেখে বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। বস্তুত এ ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালির ধর্ম ও কর্মকাণ্ডের উৎস ছিল। প্রাক পলাশী যুগে যার পরিচয় ছিল 'জান্নাতুল বিলাদ' নামে। প্রায় সমসাময়িক ইতিহাসবিদগণ বাংলার প্রাকৃতিক সীমারেখা পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করেছেন। তাদের বর্ণনা অনুসারে বাংলার দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে নেপাল, সিকিম ও ভুটানের পর্বতমালা। পূর্বে চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলের পর্বতপুঞ্জ। উত্তর-পশ্চিমে বিহার সুবা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা।

মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনকালে এ অঞ্চলটি সুবা বাংলা নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। সম্রাটের দরবারী ঐতিহাসিক আবুল ফজলের বর্ণনায় এ অঞ্চলের বাঙ্গালা নামের কারণ জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে, এ দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ, প্রাচীনকালে এর রাজারা ১০ গজ

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ ও ২০ গজ প্রশস্ত প্রকাণ্ড আল (বাঁধ) নির্মাণ করতেন যার জন্য এর নামকরণ হয়েছে 'বাঙ্গালা'। তিনি এ অঞ্চলের যে ভৌগলিক বিবরণ দিয়েছিলেন তা হল, বাঙ্গালা দ্বিতীয় আবহাওয়ায় অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম হতে গর্হি পর্যন্ত লম্বায় চারশত ক্রোশ। পূর্ব ও উত্তরে এটি পাহাড় পরিবেষ্টিত; এর দক্ষিণে সাগর এবং পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এর সীমান্তে কামরূপ ও আসাম অবস্থিত।[১] সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে চট্টগ্রাম হতে গর্হি পর্যন্ত বাংলা সুবার সীমারেখা নিদিষ্ট করেছেন।[২] ব্রিটিশ শাসনকালেও চট্টগ্রাম হতে রাজমহল এবং হিমালয়ের পাদদেশ হতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিস্তৃত ছিল। আমাদের আলোচনায় আমরা আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার বলে মনে করি আর তা হলো ঔপনিবেশিক ইংরেজ কোম্পানি (ইংরেজ শাসন) এবং ব্রিটিশ শাসন সমার্থবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়।

ভৌগলিকভাবে বিহার ও উড়িষ্যা ঔপনিবেশিক বাংলার অন্তর্গত হলেও বর্তমান গবেষণার পরিধি শুধুমাত্র বাংলা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তু '*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' এর শিরোনামে কোন নিদিষ্ট সময়কাল উল্লেখ না থাকলেও আলোচ্য অংশের আলোচনার বিস্তৃতি হল ইংরেজ শাসনের (কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসন) ১৯০ বছর। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, আধুনিক ভারতের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) সময় থেকে শুরু করে বিশ্বকবি ও প্রথম নোবেল বিজয়ী বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) অন্তর্ধান পর্যন্ত এ গবেষণার পরিধি বিস্তৃত।

ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে এবং এর থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রচার করে ভারতীয়দের আধুনিকতার প্রথম পথ দেখিয়েছেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর পথ ধরে পরবর্তীকালে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ খ্রি.), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রি.), রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭ খ্রি.), হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রি.), ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খ্রি.), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রি.), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬ খ্রি.), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩ খ্রি.), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩ খ্রি.), কেশব চন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রি.), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রি.), দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬ খ্রি.), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি.), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে '*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' শিরোনামটি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হল আমরা মনে করি গবেষণার জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা হয়েছে মর্মে জানা যায়নি। ফলে এ গবেষণার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি দিক আবিষ্কৃত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের নিরিখে ঔপনিবেশিক বাংলায় যে রেনেসাঁসের সৃষ্টি হয়েছিল এর প্রকৃতি, পরিধি ও ব্যাপ্তি অনুসন্ধান এবং সমাজের সর্বত্র এর প্রয়োগ কেমন ছিল তা খুঁজে বের করা। বিশেষ করে গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত বাংলার বৃহত্তর কৃষক সম্প্রদায়ের উপর এই রেনেসাঁসের কি প্রভাব ছিল তা অনুসন্ধান করাই আলোচ্য গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

'রেনেসাঁস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পুনর্জন্ম বা পুনর্জাগরন। খ্রিষ্টীয় পনের শতকে ইউরোপের নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় এবং এর দ্বারা সমকালীন ভাবজগতে যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে সেটাই 'রেনেসাঁস' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল লক্ষণ ছিল মানবতাবাদী, অনুসন্ধানী, যুক্তিবাদী, প্রশ্নকারী, আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গির জাগরণ। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর (১৪৫৩ খ্রি.) সেখান থেকে গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও দর্শনের পণ্ডিতরা ইতালিতে চলে এলে এই রেনেসাঁস বা জাগৃতির উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে মুসলিম অবদান তথা মুসলিম জ্ঞান বিজ্ঞানের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মুসলিম স্পেন সরাসরি ইউরোপীয় রেনেসাঁস সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আবার ঐতিহাসিক বর্ণনায় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বিকাশের পূর্বেই নবম ও দ্বাদশ শতাব্দীর এক রেনেসাঁসের কথাও জানা যায়। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ শতকের আগে ইউরোপে নগর বিপ্লবের ফলে পশ্চিম ইউরোপ বিশেষতঃ ইতালিতে এই নবজাগরণের বীজ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। রেনেসাঁসের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে ইতালির স্বাধীন নগর সমূহে। ইতালির ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, পিসা, ভেনিস বা পদুয়া শহরগুলো ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের জন্মভূমি। এখানে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক ধরে রেনেসাঁসের ধারণা জন্মলাভ করে। রেনেসাঁসের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে ইতালির নগর সমূহে, অথচ সেখানেই এর স্থায়িত্ব আসেনি। তবে তা ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ পরবর্তীকালে ফ্রান্সে তাঁর পরিপুষ্টি সাধিত হয়। কিন্তু বাস্তবে ইংল্যান্ডে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীব্যাপী রেনেসাঁসের বিকাশ একটি পরিণতি লাভ করে।

মূলত প্রাচীন যুগের সভ্যতার যে দিকগুলো পনের শতকের ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের এবং নব গঠিত বুর্জোয়া শ্রেণির ধারকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল সেগুলো হল – অনুসন্ধিৎসু মনোভাবের জাগরণ; যুক্তির আলোকে সবকিছু গ্রহণ করার প্রবণতা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ; সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহজাগতিকতা ও মানবতাবাদ অর্থাৎ মানবমুখীতার প্রাধান্য; রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সূচনা ইত্যাদি। ইউরোপের রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে হাজার বছরের মধ্যযুগীয় সভ্যতার অবসান হয়েছে এবং আধুনিক সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে। এর মাধ্যমে ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে উনিশ শতকের প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবে নগরবাসী বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালির জীবন ও মানসে যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বা পরিবর্তনের সপক্ষে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেটাই 'বাংলার রেনেসাঁস' বা 'বাংলার নবজাগরণ' নামে অভিহিত হয়ে আসছে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মূল কেন্দ্র ছিল কলকাতা। বলা বাহুল্য কলকাতার সঙ্গে ফ্লোরেন্সের তুলনা চলে না। কলকাতা শিল্পের শহর নয়, বাণিজ্যের শহর। উনবিংশ শতকের নবজাগরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য রাজা রামমোহন রায় প্রথম 'রেনেসাঁস' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং তার ধারাবাহিকতায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রি.), বিপিন চন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

পাল (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রি.) তাদের লেখনির মাধ্যমে উক্ত সময়কে বাংলার জন্য রেনেসাঁস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

রেনেসাঁস আন্দোলন বাংলায় শুরু হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মত। তবে সমাজের সর্বত্র তাঁর প্রভাব কি ছিল তা এখানে আলোচনা ও সমালোচনার দাবি রাখে। কারণ পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, এই বঙ্গীয় রেনেসাঁস বাংলার বৃহত্তর কৃষক ও সাধারণ মানুষের জন্য মুক্তি আনতে পারেনি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এটি তাদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে উনবিংশ শতক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলায় অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহের এক সময়কাল। অথচ এমন সময়েও প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার অধিকারী বাংলার নবজাগরণের নেতারা এই গণ সংগ্রামের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিদেশী ইংরেজ শাসনকে 'ভগবানের আশীর্বাদ' রূপে গণ্য করে নিজ স্বার্থে আপোষ নীতি অনুসরণ করেছেন। আলোচ্য গবেষণায় এ বিষয়টি মূল্যায়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার (১৭৫৬-৫৭ খ্রি.) পতন ঘটলে এদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এ সময় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রচলন একটি অভিনব ঘটনা। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার পরিণতিতে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১৭৭০ খ্রি.) দেখা দেয়। এ শাসন নীতির ব্যর্থতায় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী পরবর্তী সময়ে ১৭৯৩ সালে এদেশে প্রবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এ ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছিল বাংলার কৃষকদের উপর। পাশাপাশি ইংরেজ শাসকচক্র এদেশে তাদের শাসননীতির ফলস্বরূপ নব্যসৃষ্ট এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আনুগত্য লাভ করে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিটিই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তা।

'*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' শীর্ষক গবেষণার প্রয়োজনে বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার কাজে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয়েছে দেশি-বিদেশী লেখকদের অসংখ্য মূল্যবান ও তথ্যভিত্তিক গ্রন্থের উপর। '*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' শিরোনামে একক কোন গ্রন্থ লিখিত হয়নি তবে বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক ভাবে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই গ্রন্থ সমূহ বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল এবং সেখান থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নে একটি পর্যালোচনা মূলক ধারণা সন্নিবেশ করা হল –

বর্তমান গবেষণার শিরোনাম '*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' হলেও এ আলোচনায় রাজনৈতিক পটভূমিকে বাদ দেয়ার অবকাশ নেই, বিশেষ করে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পটভূমি ও ঘটনাবলী আলোচনা ব্যতিত এ গবেষণা কর্মের মূল আলোচনায় আসা যুক্তিযুক্ত নয়। ফলে বাংলার ইতিহাসের এ গুরুত্বপূর্ণ পর্বটির ওপর Samuel Charles Hill রচিত '*Bengal in 1756-1757*'[৩] (1905) গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিন খণ্ডে রচিত এ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ক্ষমতারোহণ, ইংরেজদের সাথে বিবাদ, পলাশীর যুদ্ধ এবং নবাবের পরাজয়ের ঘটনা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এতে ১১২ টি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির বর্ণনা আছে, যা ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৩-৫০৭ টি চিঠির বর্ণনা রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে Appendix 1 এ বিভিন্ন তথ্যবহুল আলোচনা (জাহাজের লগবুক এবং সামরিক জার্নাল সমূহের বিবরণ) পাওয়া যায়। Appendix 2 এ তৎকালীন পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। Appendix 3,4,5 হতেও অনেক তথ্যবহুল বিবরণ জানা যায়। এ গ্রন্থটিতে তৎকালীন বাংলার মুর্শিদাবাদের দরবার, নবাবের সভাসদ, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। কীভাবে নবাব ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বাংলার মসনদ হারান এবং ইংরেজরা পলাশীতে জয় লাভ করে এর উপর গবেষণার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তবে এ সকল আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে নবাবকেই নানা কারণে দায়ী করা হয়েছে, যা গবেষণার দাবী রাখে।

D.N. Bannerjea রচিত '*India's Nation Builders*'[৪] (1919) গ্রন্থে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সমকালের নায়ক রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মকাণ্ডের তথ্যবহুল বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। এ গ্রন্থটির বিভিন্ন তথ্য এই

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাকর্মের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের বর্ণনাকে অর্থবহ করেছে। তবে এক্ষেত্রে লেখকের আবেগকে পরিহার করা হয়েছে।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টির অবতারণা করতে হয় সেটি হচ্ছে এদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষিত একটি শ্রেণি তৈরি করতে সক্ষম হয় ইংরেজরা, যারা পরবর্তীকালে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবর্তন করে। এ বিষয়টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ হল Syed Nurullah ও J.P. Naik রচিত '*History of Education in India*'[৫] (1943)। ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার এক তথ্যবহুল আলোচনা আছে এ গ্রন্থটিতে। মোট ২৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হতে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে তিনটি পর্যায়ে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাসহ পুরো ভারতে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গবেষণা করতে গেলে এ তথ্যবহুল গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তবে গ্রন্থটি যে ত্রুটিমুক্ত তা মনে হয়নি।

Amit Sen রচিত '*Notes on the Bengal Renaissance*'[৬] (1946) গ্রন্থটিও গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান দিয়েছে। অমিত সেন বলে কেউ ছিলেন না। সুশোভন সরকার নিজে এ ছদ্মনামটি ব্যবহার করে এই বইটি লিখেছিলেন। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মকাণ্ডের তথ্যবহুল আলোচনা বিদ্যমান। এ গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা এই যে, এর আলোচনায় বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাদের অল্পকয়েক জনের বিবরণই শুধু পাওয়া যায়। অর্থাৎ এর আলোচনা সংক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে।

'*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' শীর্ষক গবেষণার প্রয়োজনে সামাজিক দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত জরুরি বলে প্রতীয়মান হয়। আর এ গবেষণার জন্য ভারতবর্ষের সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

পটভূমিতে রচিত A.R. Desai রচিত '*Social Background of Indian Nationalism*'[৭] (1948) গ্রন্থটি একটি অনবদ্য গ্রন্থ। বিশাল ও বিস্তৃত পটভূমিতে লেখা এ গ্রন্থটিতে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও ১৯ টি অধ্যায় বিদ্যমান। সকল অধ্যায় উক্ত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যভিত্তিক নয়। তবে তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় কৃষির রূপান্তর, নবম অধ্যায়ে আলোচিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসারে আধুনিক শিক্ষার ভূমিকা, একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত ভারতবর্ষে নতুন সামাজিক শ্রেণিসমূহের উদ্ভব, সপ্তদশ অধ্যায়ে আলোচিত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন কিছু সীমাবদ্ধতা সহ আমাদের গবেষণা কাজকে সহজতর করেছে।

N.K. Sinha রচিত '*The Economic History of Bengal*'[৮] (1956) গ্রন্থের ৩টি খণ্ডই এ গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনার পরিধি পলাশীর যুদ্ধ হতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম খণ্ডটির মোট ১০টি অধ্যায়ে তৎকালীন বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ফরাসি ও ডাচদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোম্পানির প্রাইভেট ব্যবসার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিভাবে বাংলা হতে আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সম্পদ পাচার হয়ে যায় তাঁর বর্ণনাও আছে আলোচ্য খণ্ডে। এ সকল বর্ণনাই গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে মোট ৯ টি অধ্যায়। এখানে প্রথম অধ্যায়ে মুর্শিদ কুলি খান থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি আলোচিত হয়েছে। এরপর মূলত ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা লাভের পর থেকেই তাদের গৃহীত ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে বিস্তৃতভাবে। বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পাঁচশালা, একশালা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় এ খণ্ডে। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটির আলোচনার বিস্তৃতি ১৭৯৩ সাল হতে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত। মোট ৮ টি অধ্যায়ে বিভক্ত এ খণ্ডের আলোচনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উত্তর বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার তথ্যবহুল পর্যালোচনা এ খণ্ডে বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

নবযুগের বাংলার প্রথম চিন্তাবিপ্লবকালে রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাঝখানে ডিরোজিও (১৮০৯-৩১ খ্রি.) এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিরাজ করেছেন। তাঁর জীবনচরিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের গবেষণার ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক উপাদান। এক্ষেত্রে যে গ্রন্থটির গুরুত্ব সর্বাধিক তা হল বিনয় ঘোষের রচিত *'বিদ্রোহী ডিরোজিও'*[৯] (১৯৫৭ খ্রি.) । এ গ্রন্থটিতে ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে, যা পর্যালোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা ক্ষেত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মধ্যবিত্তশ্রেণি। মূলত পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রি.) ইংরেজ শক্তির জয় লাভের ফলে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর যে নতুন ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাতে বাঙালি সমাজের নবোদ্ভুত শক্তিগুলো ইংরেজ শাসকদের সহযোগী একটি শ্রেণি হিসেবে বিকশিত হয়। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা এ অঞ্চলে নতুন অর্থনীতি, নতুন ধরনের প্রশাসন ও নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এসেছিল যার প্রত্যক্ষ ফল হল মধ্যবিত্তশ্রেণি। এ শ্রেণির কার্যক্রম সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি অন্যতম গ্রন্থ হল B.B. Misra রচিত '*The Indian Middle Classes: Their Growth in Modern Times*'[১০] (1960) গ্রন্থটি। চারটি অংশে বিভক্ত এ গ্রন্থটি। প্রথম অংশের দুটি অধ্যায়ে প্রাক ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের ৫ টি অধ্যায়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে গড়ে ওঠা ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তশ্রেণি সমূহের (বাণিজ্যিক, শিল্পভিত্তিক, ভূমিকেন্দ্রিক ও শিক্ষিত) বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় অংশের ৪ টি অধ্যায়ে সিপাহী বিপ্লবোত্তর (১৮৫৭ খ্রি.) ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ নীতি আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অংশটি এ গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে দুটি অধ্যায়ে মধ্যবিত্তশ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৯০৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১৯০৫ সালের পর থেকে এ শ্রেণির ভূমিকা সম্পর্কে ধারাবাহিক ও তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটির সহায়তায় আমরা গবেষণাকর্ম তথ্যবহুল করতে সক্ষম হয়েছি।

Arabinda Poddar রচিত '*Renaissance in Bengal Quests and Confrontations 1800-1860*'[১১] (1960) গ্রন্থটি আমাদের গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক গতিশীলতা শিরোনামে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা বিদ্যমান। গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ডিরোজিও ও তাঁর কর্মকাণ্ডের বর্ণনা, সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আলোচনা এবং অষ্টম অধ্যায়ে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সৃষ্টিশীলতার বর্ণনা বিদ্যমান। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সাথে শহুরে মধ্যবিত্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে, যা প্রশংসার দাবী রাখে। তবে এ গ্রন্থের বিবরণে ১৮৬০ সাল পরবর্তী ঘটনা না থাকায় পরবর্তী রেনেসাঁস ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে জানা যায় না।

বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্পর্কিত তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল David Kopf রচিত '*British Orientalism and the Bengal Renaissance*'[১২] (1969) গ্রন্থটি। এ গ্রন্থের প্রথম অংশে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সাংস্কৃতিক নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে লর্ড ওয়েলেসলির 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' সংক্রান্ত বিবরণ। তৃতীয় অংশে আছে তৎকালীন বাংলার সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের বর্ণনা। চতুর্থ অংশে রেনেসাঁসের ধারণার বিকাশ এবং পঞ্চম অংশে ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র করে লর্ড মেকলের নীতির আলোচনা ও ইংরেজিকে কেন্দ্র করে সমাজের একটি অংশের মধ্যে জাগরণের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে লেখকের সকল দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমরা একমত নই। এ গ্রন্থ থেকে তথ্য উপাত্ত গ্রহণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উপর আলোচনা করতে গেলে অসংখ্য গ্রন্থের নাম সামনে চলে আসে। এর মধ্যে আলোচিত অংশের জন্য Susobhan Sarkar রচিত '*On The Bengal Renaissance*'[১৩] (1979) গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। মোট ১০ টি অধ্যায় ছাড়াও লেখক এ গ্রন্থের শেষে অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজনীয় নোটও প্রদান করেছেন। বঙ্গীয়

Dhaka University Institutional Repository

রেনেসাঁসের উপর আলোচনা দিয়েই গ্রন্থটি শুরু হয়েছে। এরপর ধারাবাহিকভাবে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা, ডেভিড হেয়ারের কর্মকাণ্ডের বিবরণ, ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গলদের আলোচনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে আবেগধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উপর গবেষণার জন্য এ গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলে আমার মনে হয়েছে। তবে এ গ্রন্থে তিনি ইতালি আদর্শ ত্যাগ করে রুশ আদর্শের দিকে বেশি ঝুঁকেছেন তা কাম্য নয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হল লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রি.) কর্তৃক ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা। এ বন্দোবস্তের উপর অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে Sirajul Islam রচিত '*The Permanent Settlement in Bengal' A Study of its Operation (1790-1819)*[১৪] (1979) গ্রন্থটি আলোচ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ একটি আকর গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি লেখকের পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। এ গ্রন্থে মোট ১০ টি অধ্যায় আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের প্রতি বাংলার জমিদারদের দৃষ্টিভঙ্গি, সূর্যাস্ত আইনের কারণে বড় বড় জমিদারির পতন, অসংখ্য ক্ষুদ্র জমিদারির উত্থান, ভূমির সাথে সম্পর্কহীন নতুন এক ধরনের জমিদারদের সৃষ্টি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও ফলাফল ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এক কথায় বলা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার উপর এই গ্রন্থটি একটি অমূল্য দলিল।

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি বিষয়ে ইতিহাসবিদ গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া রচিত '*বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*'[১৫] (১৯৯৫) একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি মূলত তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের সামাজিক অবস্থান, তাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং ধীরে ধীরে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই শ্রেণিটির তৎকালীন সমাজ ভাবনা সম্পর্কেও লেখক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের লিখিত '*ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*' [১৬] (১৯৯৬) গ্রন্থটি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উপর একটি পর্যালোচনামূলক দলিল। পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে লেখক তাঁর মতামত প্রদান করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রকৃতি তুলে ধরেছেন। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাগণ যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কথা বলেননি এবং তাদের মধ্যে যে স্ববিরোধীতা বিদ্যমান ছিল, তাঁর ইংগিত লেখক দিয়েছেন।

১৭০৪ সাল হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য যে গ্রন্থটি অন্যতম সহায়ক সেটি হল Sirajul Islam এর সম্পাদনায় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *History of Bangladesh (1704-1971)*[১৭] (1997) ৩ খণ্ডের এ গ্রন্থটিতে রয়েছে বিশাল ও বিস্তৃত বর্ণনা এবং অনেক বরেণ্য ঐতিহাসিক ও গবেষকদের লেখনি এতে বিদ্যমান। এ গ্রন্থের তিনটি খণ্ডেই আমার গবেষণার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বিদ্যমান রয়েছে। প্রথম খণ্ডে সুশীল চৌধুরীর লিখিত 'পলাশী যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌলা'; সিরাজুল ইসলামের 'ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা ১৭৫৭-১৭৯৩'; হোসেন জিল্লুর রহমানের 'ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো'; রতন লাল চক্রবর্তীর 'প্রতিরোধ আন্দোলন ও কৃষক বিদ্রোহ'; ব্লেয়ার বি ক্লিং এর 'নীল বিদ্রোহ' অধ্যায়গুলো হতে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সুশীল চৌধুরীর 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা নবাবি আমল'; পি জে মার্শালের 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা কোম্পানি আমল'; সুশীল চৌধুরীর 'আঠারো শতকে ইউরোপীয় কোম্পানি ও বাংলার রপ্তানি বাণিজ্য'; সিরাজুল ইসলামের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষি অর্থনীতি'; বিনয় ভূষণ চৌধুরীর 'কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ' অধ্যায়গুলো হতে আমার গবেষণা সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি। তৃতীয় খণ্ডের শিরীন আখতারের 'নবাবি আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি ভিত্তিক সমাজ'; জাহেদা আহমদের 'রাষ্ট্র ও শিক্ষা'; শরীফ উদ্দিন আহমেদের 'নগরায়ন ও নাগরিক শ্রেণী' অধ্যায়গুলো হতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা বিচার বিশ্লেষণ করে গবেষণার কাজে লাগানো হয়েছে। এ গ্রন্থটি সামগ্রিকভাবে জ্ঞানের একটি বিশাল ভাণ্ডার।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয় রেনেসাঁস এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁস সংক্রান্ত আলোচনার জন্য মুসা আনসারী রচিত '*ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*' [১৮] (২০০৮) গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ। লেখক ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব ও বিকাশক্রম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর পাশাপাশি বাংলায় উনিশ শতকে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও তাদের গতি প্রকৃতি সম্পর্কেও তিনি আলোকপাত করেছেন।

'*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আবদুল বাছিরের '*বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি*' [১৯] (২০১২) শীর্ষক গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এ গ্রন্থটি লেখকের পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। এ গ্রন্থে লেখকের স্বচ্ছ ও বিশ্লেষণধর্মী যে চিন্তা ভাবনা ফুটে উঠেছে তা আমাদের গবেষণাকর্মকে বোধগম্য করতে নিঃসন্দেহে সহায়তা করেছে।

পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে তাদের শাসনব্যবস্থা, প্রশাসন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত একটি গ্রন্থ হল সিরাজুল ইসলাম রচিত '*বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*'[২০] (২০১৩)। এ গ্রন্থটি মোট ১৯ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। পলাশীর যুদ্ধ হতে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে ইংরেজ শাসনের বর্ণনাও বিদ্যমান। পলাশীর যুদ্ধোত্তর কোম্পানির নীতি, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থায় পরীক্ষা নিরীক্ষা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, এর বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, ফলাফল, লর্ড কর্নওয়ালিস কোড সহ ইংরেজ প্রশাসনের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে অত্যন্ত বোধগম্যভাবে তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিশাল বর্ণনা আছে।

বঙ্গীয় রেনেসাঁস সংক্রান্ত আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত রচিত '*বঙ্গের কৃতী সন্তান*'[২১] (মাঘ, ১৩৫২ সাল)। এ গ্রন্থে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাদের অন্যতম রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ বিদ্যমান। এ বর্ণনা গবেষণাকর্মে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছে। তবে বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা আছে যা গ্রন্থটির একটি দুর্বল দিক বলে মনে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'*বঙ্গীয় রেনেসাঁস ও কৃষক সম্প্রদায়*' শীর্ষক গবেষণাটির কয়েকটি দিক রয়েছে। একদিকে আছে ইংরেজ শাসনের বিভিন্ন নীতি, দর্শন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড; আবার অন্যদিকে আছে বাংলায় মধ্যবিত্তশ্রেণির আবির্ভাব, তাদের কর্মকাণ্ড, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব ও বিকাশ। আবার এ গবেষণার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কাঠামোতে ও জাগরণে কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা এবং এ রেনেসাঁসে তাদের অবস্থান নির্ণয় করা। এ সামগ্রিক বিষয়গুলো একটি আলোচনায় আনার প্রয়োজনে আলোচ্য গবেষণার যে অধ্যায় ভিত্তিক পরিকল্পনা করা হয়েছে তাঁর প্রথমে রয়েছে একটি ভূমিকা। এখানে আলোচনা করা হয়েছে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বঙ্গের সীমানা, ভৌগলিক পরিচয়, গবেষণার সময়কাল ও এর যৌক্তিকতা, গবেষণাকর্ম হিসেবে এই বিষয়টি নির্বাচন করার যথার্থতার ব্যাখ্যা। ব্রিটিশ আমলের শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ নীতিসমূহ অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভবের আলোচনা। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ধারণা ও বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সাথে মধ্যবিত্তশ্রেণির সম্পর্ক চিত্রায়ন, উৎস পর্যালোচনা, গবেষণার কাঠামো বিন্যাস ইত্যাদি।

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে – 'বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি রাজস্ব নীতি এবং নতুন সমাজবিন্যাস' এই শিরোনামে। এই অধ্যায়টি প্রাক ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা পলাশী যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এরপর ধারাবাহিকভাবে বক্সারের যুদ্ধ, ইংরেজ শক্তির দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা আছে। এরপর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৮৫ খ্রি.) ও লর্ড কর্নওয়ালিসের (১৭৮৬-৯৩ খ্রি.) সময়কার ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একই সাথে কোম্পানি সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং এর ফলে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে নবতর ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে এ সম্পর্কে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হিসেবে আছে – 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য নীতি এবং বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণির উন্মেষপর্ব'। এ অধ্যায়ে বণিক শ্রেণি হিসেবে বাংলার ইংরেজদের

Dhaka University Institutional Repository

আগমন, কুঠি নির্মাণ, তাদের ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। এরপর কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তির পর বাণিজ্য নীতির বর্ণনা সহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সংযোগ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কোম্পানির বাণিজ্যের প্রকৃতির আলোচনায় তাদের বাণিজ্য সংক্রান্ত সার্বিক দিক এখানে আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে ইংরেজদের শিল্প ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এদেশীয় একটি মধ্যসত্বভোগী শ্রেণির আবির্ভাব কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হল – 'ব্রিটিশ শিক্ষানীতি এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির রূপরেখা'। এখানে ঔপনিবেশিক যুগে ইংরেজদের মাধ্যমে কিভাবে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়, আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে কোম্পানি সরকার এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসনকালে কি ধরনের কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ভারতীয় জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ তাঁর বিবরণ প্রদানের সাথে সাথে এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে কিভাবে বাংলায় একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে। একই সঙ্গে এ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি যুগ বদলের তৎপরতায় কীভাবে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন তা আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হল – 'বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব'। এ অধ্যায়ের শুরুতেই বাংলার নতুন একটি সামাজিক অবস্থা 'মধ্যবিত্তশ্রেণি' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর মধ্যবিত্তশ্রেণির পরিচয় প্রদান করে সেখান থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভবের একটি রূপরেখা আলোচিত হয়েছে। চার ধরনের মধ্যবিত্তশ্রেণির পরিচয় প্রদান করে তাদের মানসিকতা ও ব্যক্তিদর্শন নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল আলোচ্য গবেষণার মূল আকর্ষণ। এখানে স্থান পেয়েছে – 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিকাশ ও ভাবধারা'। এ অধ্যায়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিকাশ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কীভাবে উনিশ শতকের বাংলায় কলকাতা নগরীতে একটি শ্রেণির মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং এ আন্দোলনকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুকরণে বঙ্গীয় রেনেসাঁস হিসেবে আখ্যায়িত করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। অধ্যায়ের বর্ণনা শুরু হয়েছে ইউরোপীয় রেনেসাঁস দিয়ে। এরপর বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ রেনেসাঁস সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতামত, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাথে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের তুলনা এ অধ্যায়ে সরলাকারে তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাদের পরিচয়, তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল – 'বঙ্গীয় রেনেসাঁসে কৃষকশ্রেণির প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান বিচার'। এই অধ্যায়টির শুরুতেই ঔপনিবেশিক যুগের নানামুখী সামাজিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে যে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ঘটে তাঁর বর্ণনা আছে। এরপরে আছে বাংলার বৃহত্তর কৃষক শ্রেণির প্রতি কোম্পানি সরকারের শোষণ ও উৎপীড়নের মত ঘটনায় এ শ্রেণিটির নির্লিপ্ততার বর্ণনা। যেখানে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সর্বত্র মুক্তি আনয়ন করা সম্ভব হয়েছিল, সেখানে সেই রেনেসাঁসের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েও বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাগণ কীভাবে নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে কৃষক শ্রেণির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেনি তাই এখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কৃষক শ্রেণির আন্দোলনের প্রতি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অগ্রপথিকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব কি মনোভাব পোষণ করতেন তাঁর আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ের শেষে এ সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন সংযুক্ত করা হয়েছে।

আলোচনার শেষে একটি উপসংহার রচনার মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করা হয়েছে। সমগ্র আলোচনা থেকে একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে এই গবেষণাকর্মের একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে উপসংহারে। আশা করি আমাদের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সমূহ নতুন একটি দিকের আলোকপাত করবে, যা হবে নবতর সিদ্ধান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। Abul Fazl, *"Ain-I-Akbari"*, Translated From the Original Persian By Colonel H.S. Jarrett, Asiatic Society of Bengal, Vol-2, Calcutta, 1891, p.115

২। *"The Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India"*, Translated, Edited & Annotated by Wheeler M. Thackston, Oxford University Press, New York, 1999, p.129

৩। S.C.Hill, (ed.), The Indian Records : Series : *Bengal in 1756-1757*, Published for the Government of India, London, John Murray, Albemarle Street, 1905

৪। D.N. Bannerjea, *India's Nation Builders*, Headly Bros Publishers Ltd, London, 1919

৫। Syed Nurullah and J.P.Naik, *History of Education in India*, Macmillan & Co. Ltd. Bombay, 1943

৬। Amit Sen, *Notes on Bengal Renaissance*, People's Publishing House, Bombay, 1946

৭। A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Book Depot, Bombay, 1948

৮। N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1956

Dhaka University Institutional Repository

৯। বিনয় ঘোষ, *বিদ্রোহী ডিরোজিও*, মুদ্রাকর প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৭

১০। B.B. Misra, *The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times*, Oxford University Press, Delhi, 1960

১১। Arabinda Poddar, *Renaissance in Bengal Quests and Confrontations 1800-1860*, Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1960

১২। David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Firma K.L.Mukhopadhayay, Calcutta, India, 1969

১৩। Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, Papyrus, Calcutta, July 1979

১৪। Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal, A Study of its Operation (1790-1819)*, Bangla Academy, Dacca, May 1979

১৫। গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫

১৬। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুক ওয়ার্ল্ড, কলিকাতা, ১৯৯৬

১৭। Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971)*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997

১৮। মুসা আনসারী, *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯। আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২

২০। সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, চয়নিকা, ঢাকা, জুলাই ২০১৩

২১। শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, *বঙ্গের কৃতী সন্তান*, দি নিউ কমলা প্রেস, কলকাতা, মাঘ ১৩৫২

প্রথম অধ্যায়

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি রাজস্ব নীতি এবং নতুন সমাজবিন্যাস

প্রাক উপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে নবাব সিরাজউদ্দৌলার স্বল্প সময়ের রাজত্বকাল (১০ এপ্রিল ১৭৫৬ থেকে ২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রি.) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধটি আট ঘণ্টার মত স্থায়ী ছিল এবং এতে নবাব কোম্পানির কাছে পরাজিত হন। পলাশীর যুদ্ধ তরুণ নবাবের শুধু পতনই ঘটায়নি, এতে বাংলার স্বাধীন নবাবী আমলের অবসান ঘটে এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পরেই বাংলার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়।[১] পলাশীর ঘটনাই ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। কেবল বাংলায় অধিষ্ঠিত হবার পরেই ইংরেজরা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের ক্ষমতা সম্প্রসারণের সুযোগ পায়। কারণ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য বাংলা একটা মঞ্চের মত কাজ করে, যেখান থেকে ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ শক্তি আধিপত্য বিস্তার করে অবশেষে সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এশিয়ার অন্যান্য অনেক অংশও এর অধীনস্ত হয়। এ যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ছিল রাজনৈতিক, সামরিক নয়। তবে এ পরাজয় শুধু বিশ্বাসঘাতকতায় সংগঠিত হয়নি, পুঁজিপতিদের হাতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী নবাবের পরাজয় ছিল অনিবার্য।[২]

পলাশীর যুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ কালবিভাজন ঘটনা। ইহা ছিল বাংলায় মুঘল সামন্তযুগের অবসান এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিক যুগের সূচনা পর্ব। বস্তুত সতের শতকের শেষ দশকে ইংরেজরা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের যে স্বপ্ন দেখেছিল পলাশীর যুদ্ধ জয়ে সে স্বপ্ন পূরণ হল।[৩] ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশ শক্তির ষড়যন্ত্রের কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলে কোম্পানি বাংলা ও বিহারের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লীর বাদশাহ এ পরিকল্পনার নায়ক রবার্ট ক্লাইভকে সাবুদ জং (রণে পরাক্রম) উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।[৪]

পলাশীর যুদ্ধ পূর্ব গোপন চুক্তি মোতাবেক কোম্পানি মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসায় (২৯ জুন, ১৭৫৭ খ্রি.)। কিন্তু সময় ও পরিবেশ কোনটাই তার অনুকূলে ছিল না। সপ্তাহব্যাপী রাজনৈতিক শূন্যতায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক লুটপাট হয়। নবাবের হারেমের মহিলারা বিপুল পরিমাণ সোনা, রূপা ও নগদ অর্থ নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে যায়। সৈন্যরা কোষাগারের অবশিষ্ট অর্থ-সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়।[৫] অন্যদিকে বাংলার নতুন নবাব মীর জাফরের নিকট থেকে যুদ্ধ জয়ের পুরস্কারস্বরূপ ২৮০,০০০ পাউন্ড আত্মসাৎ করে ক্লাইভ রাতারাতি ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজনে পরিণত হয়।[৬] মীর জাফরের নবাবির বিনিময়ে কোম্পানির কর্মচারীরা পায় চব্বিশ পরগণা জেলার জমিদারী ও নগদ ৩০,০০,০০০ পাউন্ড। আর সে সাথে চলে কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ, ব্যবসায়ের নামে লুণ্ঠন এবং অধিক হারে রাজস্ব সংগ্রহ। ১৭৭৩ সালের একটি অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৭৫৭-১৭৬৬ খ্রি. পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা ও বিহার হতে মোট ৬০ লাখ পাউন্ড উৎকোচ গ্রহণ করেছিল।[৭]

বাংলার সম্পদ পাচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবাবের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ছিল দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ। বাংলার নতুন নবাব মীর জাফর (১৭৫৭-১৭৬০ খ্রি.) বুঝতে পারেন যে, তাঁর পক্ষে ইংরেজ কোম্পানি ও এর কর্মচারীদের দাবি সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা সম্ভব নয়। কোম্পানির কর্মকর্তাগণ তাঁদের দাবি পূরণে নবাবের ব্যর্থতার সমালোচনা করতে থাকেন। অবশেষে ১৭৬০ খ্রি. কোম্পানি নবাবকে তাঁর জামাতা মীর কাশিম (১৭৬০-১৭৬৩ খ্রি.) এর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করে। কোম্পানি নবাব মীর কাশিমের সাথে (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ খ্রি.) একটি চুক্তি সম্পাদন করে। এ চুক্তি অনুযায়ী নবাব বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা কোম্পানিকে হস্তান্তর করেন। বিনিময়ে নবাবের কাছ থেকে সকল পাওনা পরিশোধিত হয়েছে বলে কোম্পানি ঘোষণা দেয়।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

নবাব মীর কাশিম কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বাংলাকে শক্তিশালী করে তুলতে সচেষ্ট হন। এ লক্ষে তিনি একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলেন এবং ভূমি রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন। এর মাধ্যমে অবশ্য কৃষকের উপর বাড়তি ভূমিকর আরোপ করা হয়। একই সাথে তিনি একটি দক্ষ ও অনুগত আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। নবাবের এসব কর্মকাণ্ড ইংরেজদের পছন্দনীয় ছিল না। উপরন্তু এসময় ইংরেজ কোম্পানির কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ১৭১৭ সালে বাদশাহী ফরমান এর অপব্যবহার রোধে নবাবের প্রয়াসকে ইংরেজরা মোটেও পছন্দ করে নি। এসব ইংরেজ কর্মকর্তারা বিদেশে রপ্তানিযোগ্য কিংবা অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য তাদের মালামাল শুল্কমুক্ত করার দাবি জানায়। ইংরেজ বণিকগণ শুল্কমুক্ত ব্যবসায়ের অনুমতিপত্র বা *দস্তক* বন্ধুপ্রতিম ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে অবৈধভাবে বিক্রয় করার ফলে ঐসব ব্যবসায়ী অভ্যন্তরীণ শুল্ক ফাঁকি দিত। ফলে সৎ ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতেন। নবাব কোম্পানির কর্মচারী কর্তৃক দস্তকের অপব্যবহার রোধে সক্রিয় হন। তিনি ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তা ও জমিদারদের কোম্পানির কর্মচারীদের উপহার ও ঘুষ প্রদানের চাপ থেকে রেহাই দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিদেশী ব্যবসায়ীরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে কিছুতেই রাজি ছিল না।

বাস্তব সত্য ছিল এই যে, বাংলায় দুই প্রভুর শাসন সম্ভব ছিল না। মীর কাশিম মনে করতেন যে, তিনি একজন স্বাধীন শাসক, আর ইংরেজরা চাইত তিনি যেন তাদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেন, যেহেতু তারাই তাঁকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। ফলে নবাব মীর কাশিমের কার্যাবলী যেমন – মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর, সেনাবাহিনীকে শক্তিশালীকরণ, নতুন রাজধানীতে কোন ইংরেজ প্রতিনিধিকে বসবাস করতে না দেয়া, উন্নয়নমূলক সংস্কার নীতি, ব্রিটিশ বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন এবং শুল্ক বিলোপ করে প্রতিযোগিতায় দেশী বণিকদের ব্রিটিশদের সমপর্যায়ে আনা প্রভৃতি পদক্ষেপকে কোম্পানি প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধী বলে গণ্য করে। কলকাতা কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মীর কাশিমকে আর অগ্রসর হতে দেয়া যায় না, তাঁর কার্যকলাপ ও স্বাধীনতা কোম্পানির জন্য বিপদজনক।[৯] ফলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় পাটনা থেকে। সেখানে ইংরেজ কর্মকর্তা এলিস এবং নবাব পরস্পরকে উত্তেজিত করে নিজেদের

Dhaka University Institutional Repository

ধৈর্যচ্যুতি ঘটান। ১৭৬৩ সালের গ্রীষ্মে যুদ্ধ শুরু হয়। পরপর চারটি খন্ডযুদ্ধে নবাবের নতুন বাহিনী পরাজিত হয়। মীর কাশিম প্রথমে পাটনা ও পরে অযোধ্যায় পালিয়ে যান। অযোধ্যায় তিনি নবাব সুজাউদ্দৌলার সমর্থন লাভ করেন। এদের সঙ্গে মিলিত হন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রি.)। ১৭৬৪ সালের ২৩ অক্টোবর বিহারের বক্সার নামক স্থানে সংঘটিত এ যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করে। বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম পুনরায় ইংরেজ শিবিরে আশ্রয় নেন। সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখন্ডে পালিয়ে যান এবং অযোধ্যা ইংরেজ বাহিনীর পদানত হয়। মীর কাশিম নিরুদ্দেশ হন। এ যুদ্ধে কোম্পানির সামরিক উৎকর্ষতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। এ যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের পরেই বাংলা ইংরেজ কোম্পানির শাসনের অধীনে আবদ্ধ হয়। এতদিন পর্যন্ত ইংরেজরা ছিল ক্ষমতার ভাগাভাগি ও সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য শাসকের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তাদের ক্ষমতালাভ ছিল নিতান্তই আকস্মিক ও অনিশ্চিত। বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজদের ক্ষমতা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য এবং তারা রাজকীয় স্বীকৃতি লাভের কাছাকাছি এসে পৌঁছে। এ যুদ্ধের পর অযোধ্যার ভাগ্যও কোম্পানির অনুকম্পার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং বাংলায় ব্রিটিশদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। বাংলার নবাব তাঁর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তার জন্য ইংরেজদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

মুঘল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) আমলের চল্লিশতম বছরে সাম্রাজ্যের সুবা বা প্রদেশগুলোর শাসন ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় এবং সুবাদারের নিয়ন্ত্রণ হতে দিওয়ানদের (রাজস্ব কর্মকর্তা) স্বাধীন করে দেয়া হয়। এইভাবে মুঘল আমলে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা সুবাদার ও দিওয়ানের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। দিওয়ানি হল রাজস্ব বিভাগ। দেওয়ানি বা রাজস্ব, জমি-জায়গা সম্পর্কিত মামলার দায়িত্ব দিওয়ান ও তাঁর বিভাগীয় কর্মচারীরা পান। নিজামতী দায়িত্ব সুবাদার পালন করতেন। সুবাদারের পুলিশ ও সেনা থাকলেও হাতে রাজস্ব বা অর্থ ছিল না। দিওয়ানের হাতে রাজস্ব থাকলেও সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না।[১০] মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) পর থেকে বাংলায় এই দুই পদ দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির হাতে থাকার প্রথা রহিত হয়। বাংলায় মুর্শিদ কুলি

Dhaka University Institutional Repository

খান একাধারে দিওয়ান ও সুবাদারের ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে নবাব উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন প্রত্যেক শাসকই এ পন্থা অনুসরণ করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীর কাশিমের পরাজয়ের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্রিটিশ যুগের সূচনা হয়। বাংলার ক্ষমতাচ্যুত নবাব মীর কাশিমের স্থলে কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল দ্বিতীয় মেয়াদে মীর জাফরকে (১০ জুলাই, ১৭৬৩ খ্রি.) সিংহাসনে বসায়। এসময় বিপুল পরিমাণ ক্ষতি স্বীকার করে মীর জাফর কোম্পানির সাথে চুক্তি করেন। তবে তিনি অল্প সময়ের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর নাবালক পুত্র নাজিমুদ্দৌলাকে কোম্পানি নামে মাত্র ক্ষমতায় বসায়। নতুন নবাব কোম্পানিকে ২৩০,৩৫৬ পাউন্ড উপহার প্রদান করেন।[১১] তার সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা ভাতা প্রদানের নিয়ম করা হয়। তিনি মুঘল সুবাদার হিসেবে নন বরং কোম্পানি কর্তৃক মনোনীত নবাব হন। এতে করে দিল্লীর মুঘল সম্রাট কর্তৃক নবাব নিয়োগের ঐতিহ্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

এসময় কোম্পানি নীতি গ্রহণ করল সরাসরি ক্ষমতা দখল না করে একজন নামে মাত্র নবাবকে ক্ষমতায় রেখে প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে তুলে নিয়ে দেশের রাজস্বের ওপর হিস্যা বসানো। এ নীতির অংশ হিসেবেই এসময় লর্ড ক্লাইভ দ্বিতীয় মেয়াদে (১৭৬৫-৬৭ খ্রি.) বাংলায় কোম্পানির গভর্নর হয়ে আসেন। তিনি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছ থেকে ১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত হবার সনদ লাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভের মাধ্যমে ক্লাইভ বাংলায় ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্থাপনের যে পরিবেশ তৈরি করেন, আট বছর পর দ্বিতীয় মেয়াদে এসে তিনি সেই ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ন্যায় সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১২] বস্তুত ১৬৫১ খ্রি সুবাদার শাহ্ সুজা ইংরেজদের নানা সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত যে সনদ দেন এরই শেষ পরিণতি ১৭৬৫ খ্রি. দেওয়ানি সনদ।[১৩] এর পূর্বেই ১৭৬৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কোম্পানির সাথে বাংলার নবাবের মুর্শিদাবাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সম্রাট ও বাংলার নবাবের সঙ্গে চুক্তি হয় যে, দিওয়ান হিসেবে কোম্পানি সুবা বাংলার রাজস্ব সংগ্রহ করবে। চুক্তির শর্তানুসারে কোম্পানি সুবার রাজস্ব থেকে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বাদশাহকে এবং তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা নবাবকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করবে এবং বাকি রাজস্ব কোম্পানি নিজে ভোগ করবে।[১৪] এ ছাড়াও চুক্তির শর্ত মোতাবেক বাংলার নামমাত্র নবাবকে তাঁর সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ভেঙ্গে দিতে হয় এবং কোম্পানি কর্তৃক মনোনীত একজন ডেপুটি সুবাদারের (চট্রগ্রামের প্রাক্তন ফৌজদার সৈয়দ মুহাম্মদ রেজা খান) মাধ্যমে বাংলার শাসনকার্য চালাতে হয়। কোম্পানির অনুমোদন ব্যতীত সেই ডেপুটি সুবাদারকে বরখাস্ত করার ক্ষমতাও নবাবের ছিল না।

এরূপে কোম্পানি বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার (নিজামতের) ওপর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বাংলার ওপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ বৈধতা পায় এবং তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রদেশ বাংলার রাজস্বের এখতিয়ার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। দিওয়ান হিসেবে কোম্পানি সরাসরি রাজস্ব আদায় করত, আর অন্যদিকে নবাবের পক্ষে ডেপুটি সুবাদার মনোনীত করার অধিকার লাভের মাধ্যমে কোম্পানি প্রশাসনিক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়। তারা প্রত্যক্ষভাবে প্রদেশের রাজস্ব ও সেনাবাহিনীর ওপর এবং পরোক্ষভাবে প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে ইংরেজরা কোন দায়দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়াই দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। নবাব ও তার কর্মচারীদের প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকল বটে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের কোন ক্ষমতা থাকল না। এ ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন (ইঙ্গ-মুঘল যৌথ শাসন) নামে পরিচিত। 'দ্বৈত শাসন' ছিল ক্লাইভের সুনিপুণ উদ্ভাবন। কোনরূপ রাজনৈতিক বিতর্কে না গিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের সম্পদ হস্তগত করার এটি ছিল একটি সর্বোত্তম কৌশল মাত্র।[১৫]

১৭৬৫ সালের ব্যবস্থায় দৃশ্যত রেজা খানই হলেন প্রশাসনের প্রথম ব্যক্তি। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে অলিখিতভাবে কোম্পানিরই অদৃশ্য হাতে। কোম্পানি সরাসরি ক্ষমতা প্রয়োগ করলে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক ও ভারতীয় রাজন্যগোষ্ঠী তা মেনে নেবে না এ ধারণা থেকেই লর্ড ক্লাইভ কূটনৈতিক চাল দিয়ে দ্বৈত শাসনের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া, দেশ শাসনের জন্য তখন কোম্পানির প্রয়োজনীয় লোকবল ও অভিজ্ঞতা ছিল না। তবুও ক্লাইভ দিওয়ানি চুক্তি করেন প্রধান দুটি কারণে – প্রথমটি ছিল রাজনৈতিক। যাতে ভবিষ্যতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বা মীর কাশিমের মতো নবাবের যেন আর আবির্ভাব না হতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

তার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। কোম্পানির প্রাচ্য বাণিজ্যের পুঁজি স্বদেশ থেকে না এনে বাংলা থেকেই সংগ্রহ করা। ইতোপূর্বে কোম্পানি এদেশে পণ্য কেনার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়ে আসত। কিন্তু আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ব্রিটিশ সরকার বিদেশে ধাতব রপ্তানির ওপর কড়াকড়ি আরোপ করতে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোম্পানির পুঁজি সংগ্রহ করার জন্য বাংলা ছিল অন্যতম উৎস। সুবা বাংলার দিওয়ানি লাভ ছিল এ নীতিরই একটি অংশ। এখানে উল্লেখ্য যে, দিওয়ানি গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল রাজস্ব আদায়, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ নয়। অতএব ১৭৬৫ সালে দিওয়ানি লাভের পর ক্লাইভ ও পরবর্তীতে হ্যারি ভেরেলস্ট (১৭৬৭-৬৯ খ্রি.) যে প্রশাসন ব্যবস্থা অনুসরণ করেন তা ছিল মূলত মুঘল প্রশাসন অক্ষত রেখে কোম্পানি কর্তৃক উপর থেকে শুধু সংগৃহীত রাজস্ব বুঝে নেয়ার নীতি। প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করে দেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব হস্তগত করা, কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধার প্রসার ঘটানো, এদেশের রাজস্ব দিয়েই কোম্পানির বাণিজ্যিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করা ছিল কোম্পানির লক্ষ্য।

লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা এদেশবাসীর জন্য এক চরম অভিশাপ ছিল। এ ব্যবস্থায় নবাবের দায়িত্ব ছিল, কিন্তু কোন ক্ষমতা ছিল না। অর্থের জন্য তাঁকে কোম্পানির দয়ার উপর নির্ভর করতে হত। যার ফলে প্রয়োজনের সময় ক্ষমতা ও অর্থের অভাবে নবাব কোন ব্যবস্থা নিতে পারতেন না। তিনি ছিলেন এই পরিস্থিতির একজন নীরব দর্শক মাত্র। অপর পক্ষে, কোম্পানির ক্ষমতা ও অর্থের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু কোম্পানির স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীগণ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কোনরূপ দায়িত্বই পালন করত না। ফলে বাংলার শাসনকার্যে এক চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল।[১৬] বাংলার নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ায় সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসময় কোম্পানির লোকেরা খাজনা আদায়ের নামে অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করে। দিওয়ানির নামে বাংলায় কোম্পানি যে শোষণ ও উৎপীড়নের রাজ্য কায়েম করে তাতে ব্রিটিশ সরকার এতদিন কোনো ভ্রুক্ষেপ করে নি। কিন্তু ১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করল কোম্পানির কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার জন্য। দ্বৈত শাসনের অব্যবস্থা, ইংরেজদের অর্থ লিপ্সা, ভূমি রাজস্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস এবং ফসলহানি সবকিছু মিলে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। বাংলার অধিকাংশ এলাকা

Dhaka University Institutional Repository

দুর্ভিক্ষ কবলিত হয় এবং তা ইংরেজ রাজত্বের সূচনা কালের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। কোম্পানির উদাসীনতার কারণে এক কোটি লোকের মৃত্যু হয় এবং গোটা এলাকা অভিশপ্ত জনপদে পরিণত হয়।[১৭] বাংলার দুই তৃতীয়াংশ ফসলি জমি জনবলের অভাবে জঙ্গলময় হয়ে ওঠে। এ দুর্ভিক্ষ বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হিসেবে পরিচিত। বাংলা ১১৭৬ সনে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলা হয়।

এ ধরনের ধ্বংসলীলার কারণে নতুন এই রাজ্যে প্রশাসনের ধরণ সম্পর্কে শাসকদের আগের ধ্যানধারণা পুরোপুরি বদলে যায়। দেশীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে কোম্পানির দিওয়ানি প্রশাসন পরিচালনার ধারণাটি পরিত্যক্ত হয়। কোম্পানির পরিচালক সভার নির্দেশে ২৮ আগস্ট, ১৭৭১ খ্রি. কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল দিওয়ানি প্রশাসনের ক্ষেত্রে নিজেকেই সুবা বাংলার জন্য সর্বোচ্চ সরকার ঘোষণা করে।[১৮] নায়েব দেওয়ান রেজা খানকে পদচ্যুত করে দুর্নীতি ও অনিয়মের দায়ে কারারুদ্ধ করা হয়। কোম্পানির আঞ্চলিক বিষয়াদি প্রশাসনের জন্য ১৭৭২ সনে কলকাতায় রাজস্ব কমিটি নামে এক কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। এ কমিটির প্রেসিডেন্ট হন গভর্নর এবং বাংলার ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেন্ট। আর এভাবেই কলকাতা নীরবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী নগরীতে পরিণত হয়। ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৮৫ খ্রি.) ঘোষণা করেন যে, লর্ড ক্লাইভের দিওয়ানি ও নিজামত দ্বৈত প্রশাসন – ১৭৬৫ এর আগের ব্যবস্থার মতোই সমন্বিত ব্যবস্থায় পরিণত হবে।

ভূমি রাজস্বকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় কোম্পানির শাসন। ফলে ভূমি রাজস্ব শাসন সুচারুরূপে পরিচালনা করাই ছিল কোম্পানির প্রাথমিক যুগের অন্যতম লক্ষ্য। ভূমি রাজস্ব শাসনের দিক ছিল দুইটি। যথা - সাধারণ অফিস সংগঠন বা প্রশাসন এবং ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি। যেহেতু কোম্পানি ছিল একটি বাণিজ্যিক সংস্থা তাই শাসন সংক্রান্ত কোন অভিজ্ঞতা তাদের ছিলনা। ফলে শাসন সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছে পদে পদে। অভিজ্ঞতার আলোকে বারে বারে ঢেলে সাঁজাতে হয়েছে প্রশাসনকে। এ সব পরীক্ষা নিরীক্ষার উর্বরতম ক্ষেত্র ছিল ভূমি রাজস্ব শাসন। ১৭৭০ সালের মহা দুর্ভিক্ষের পরবর্তীতে ১৭৭১ সালের ২৮ আগস্ট *বোর্ড অব*

Dhaka University Institutional Repository

ডাইরেক্টর্স রেজা খান ও সিতাব রায়কে অপসারণ করে কোম্পানিকে সরাসরি দিওয়ানি শাসন পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেয়। সে নির্দেশক্রমে ১৭৭২ সালের ১১ মে মুর্শিদাবাদ থেকে খালসা বা ভূমি রাজস্ব বিভাগ কলকাতায় স্থানান্তরিত করে কোম্পানি নিজ হাতে দিওয়ানি শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে দিওয়ানি কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কে কোন নীতিমালা ছিল না। এসময় *বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স* এর অভিমতের অপেক্ষা না করে ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর কাউন্সিল একটি রাজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। প্রচলিত বার্ষিক রাজস্ব নীতি বর্জন করে হেস্টিংস প্রস্তাব করেন পাঁচ বছর মেয়াদে, ইজারাদারদের সঙ্গে ভূমি বন্দোবস্ত করার জন্য। 'পঞ্চসনা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত হেস্টিংসের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব জমি প্রকাশ্য নিলামে সর্বোচ্চ ডাক প্রদানকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করা। এ বন্দোবস্তের পক্ষে হেস্টিংস ও কাউন্সিলের যুক্তিসমূহের প্রেক্ষিতে ফোর্ট উইলিয়ামের *প্রেসিডেন্ট এন্ড কাউন্সিল* পাঁচ বছর মেয়াদি ইজারাদারি বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (১৪ মে, ১৭৭২ খ্রি.) এবং বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি (কমিটি অব সার্কিট) গঠন করে। গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস ও কাউন্সিলের চার জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় সে কমিটি। বন্দোবস্ত বাস্তবায়নে কমিটির পথ নির্দেশের জন্য *প্রেসিডেন্ট এন্ড কাউন্সিল* একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ[১৯] –

১। বন্দোবস্তের মেয়াদ পাঁচ বছর – ১৯ এপ্রিল, ১৭৭২ থেকে ১০ এপ্রিল, ১৭৭৭ খ্রি. পর্যন্ত।

২। ইজারা জমি গঠিত হবে পুরো পরগণা নিয়ে এবং এর সরকারি জমা হবে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা।

৩। ইজারাদারের সঙ্গে শর্তাদি সম্বলিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে; ইজারাদার ও অনুরূপভাবে শর্তাদি উল্লেখ করে রায়তকে পাট্টা দিবে। পাট্টায় দখলীকৃত জমির পরিমাণ ও খাজনার হার উল্লেখ করা থাকবে।

৪। পাট্টায় অনুল্লেখিত সমস্ত আবওয়াব বা বিবিধ কর অবৈধ হবে।

৫। নজর, সেলামি প্রভৃতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬। জেলা কালেক্টর উক্ত সব নীতিমালা সর্বত্র ঘোষণা করবেন এবং ইজারা গ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদের থেকে নিলাম ডাক আহ্বান করবেন।

৭। কালেক্টর একটি পরগণাওয়ারী হস্তবুদ তৈরি করবেন। সেই হস্তবুদের নিরিখে কমিটি নিলাম পরিচালনা করবে।

পঞ্চসনা বন্দোবস্তের মূল লক্ষ্য ছিল, প্রকৃত উৎপাদনের নিরিখে সরকারি রাজস্ব স্থির করা। কিন্তু এসময় দেশব্যাপী কোম্পানির জরিপ কার্য চালানোর উপায় ছিল না। ফলে জরিপের বিকল্প হিসেবে কোম্পানি নিলামি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা চালায়। এ বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমির উপর রাষ্ট্রীয় স্বত্ত্ব বলবৎ করে ভূমির অধিকার থেকে জমিদার, তালুকদারদের উৎখাত করা কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে নিলামে জমিদাররাও মুক্তভাবে যোগদানের সুযোগ পায়। আবার নিলামে জমিদারের প্রস্তাবটিকে অগ্রাধিকারের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হয়। এ ক্ষেত্রে যুক্তি দিয়ে বলা হয়, "বংশানুক্রমিক শাসক হিসেবে জমিদারেরা তাদের প্রজাদের প্রতি সদয় থাকবে, চাষাবাদে উৎসাহ যোগাবে এবং রাজস্ববোধে তারা হবে ইজারাদারের চেয়ে বেশি নির্ভরশীল ও অব্যর্থ, কেননা জমিদার স্থায়ী আর ইজারাদার অস্থায়ী।"[২০] কিন্তু যে সকল জমিদার গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব দিতে ব্যর্থ হবে তাঁর জমি নিলামে বন্দোবস্ত করার বিধান করা হয়।

মুলত পরগণা ভিত্তিক পঞ্চসনা বন্দোবস্তে যে সকল জমিদারি এক বা একাধিক পরগণা নিয়ে গঠিত ছিল সেগুলো যত সহজে নিলাম করা যায় ক্ষুদ্র জমিদারি ও তালুকগুলোর নিলাম করা তত সহজ ছিল না। এসময় প্রেসিডেন্ট এন্ড কাউন্সিল এ সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু ভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। কমিটি অব সার্কিটকে নির্দেশ দেয়া হয় ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদারদের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য বন্দোবস্ত করার জন্য এবং তারাও ইজারাদারের সম মর্যাদায় সকল নিয়ম কানুনের অধীন হবে। ১৭৭৪ সালের ২৪ মার্চের পত্রে বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স পঞ্চসনা বন্দোবস্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করে। বন্দোবস্ত বাস্তবায়িত হবার পর থেকে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম সরকার ও বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স প্রতীক্ষায় ছিল সুফলের, কিন্তু বন্দোবস্তের পর

Dhaka University Institutional Repository

এক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই সরকার এই বন্দোবস্তের ব্যর্থতার দুঃসংবাদ পেতে থাকে। এই ব্যর্থতার কিছু কারণ ছিল।

প্রথমত, বন্দোবস্তের শর্ত মোতাবেক নিলামে সাধ্যাতিরিক্ত সম্পদের ডাক দিয়ে রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হয় অধিকাংশ জমিদার, তালুকদার ও ইজারাদার। তারা রাজস্ব কমানোর দাবী জানায়। কিন্তু এসময় সরকার তাদের বরখাস্ত করে নতুন বন্দোবস্তের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, প্রতি বছর যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব বাকি পড়ে। বকেয়া রাজস্বের বিরাট অংশ প্রতি বছর মওকুফ করতে হয়।

পঞ্চসনা বন্দোবস্তের সময়ের (১৭৭২-১৭৭৭ খ্রি.) সরকারি জমা-উশুল বাকির পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ[২১] –

পঞ্চসনা বন্দোবস্তের জমা-উশুল-বাকি ও মওকুফ হিসাব				
১৭৭২-৭৩ থেকে ১৭৭৬-৭৭ খ্রি.				
বছর	জমা টাকা	উশুল টাকা	বাকি টাকা	মওকুফ টাকা
১৭৭২-৭৩	২৮,৫৬৫,৬২২	২৭,০৩৫,৬৮১	১,৫২৯,৯৪১	৬৬৩,৫০৯
১৭৭৩-৭৪	২৯,৪০৩,০০৪	২৭,১৮০,২৬০	২,২২২,৭৪৮	৮৩৩,২৩৪
১৭৭৪-৭৫	২৯,২৭৮,৬৪২	২৭,৮৭৯,৪৫৯	১,৩৯৯,১৮৩	৬৪২,৮৩৬
১৭৭৫-৭৬	২৮,৮৯৫,২৯৮	২৭,৩১০,২৭২	১,৫৭৫,৯৮৬	৮৪৫,৬০৪
১৭৭৬-৭৭	২৮,৭৩১,৩৩০	২৬,৪২০,১৪৬	২,৩১১,১৮৪	৫৮৫,৯০৬

সূত্র - Sixth Report from the Select Committee, 1782.

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পঞ্চসনা বন্দোবস্তকালে মোট রাজস্বের শতকরা ৫.৩৬ ভাগ বাকি পড়ে এবং ঐ বাকির শতকরা ৩৯ ভাগ অউশুলযোগ্য বলে মওকুফ করে দিতে হয়। এটা সরকার কোনো ভাবেই মেনে নিতে রাজী ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, পঞ্চসনা বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি নিয়ন্ত্রণে ভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন লোভী, ফটকাবাজদের ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে। এরা বন্দোবস্তের কিস্তি শোধ ও মুনাফার জন্য কৃষকের শেষ সম্বলটি পর্যন্ত আদায় করত। রায়তের সর্বস্ব হরণ করার পর লুণ্ঠন করার আর যখন কিছু বাকি থাকে না তখন এলাকাকে সম্পদশূন্য ও জনশূন্য রেখে কেটে পড়ে। এটাই দেশের মহাদুর্দশা ও দারিদ্র্যের কারণ। জমিতে ইজারাদারের কোন স্থায়ী স্বার্থ ছিল না বলে তারাও কৃষককূলের প্রতি সদয় ছিল না। ইজারাদারদের নির্মম শোষণ, অত্যাচার আর জুলুমের কারণে দেশে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক অবনতি দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রধান স্যামুয়েল মিডলটনের রিপোর্টে জানা যায় যে, "ইজারাদারদের অত্যাচার ও শোষণ সহ্য করতে না পেরে অনেক রায়ত জায়গা জমি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে এবং পেছনে রেখে যাচ্ছে জনবসতিশূন্য বিস্তীর্ণ এলাকা। পরিত্যক্ত ভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে বন্যপশুর আবাসভূমিতে পরিণত হচ্ছে।"[২২]

তৃতীয়ত, মুঘল শাসনতন্ত্রে জমিদারদের দায়িত্ব ছিল তাদের নিজ নিজ এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই ঐতিহ্য ভঙ্গ হয় পঞ্চসনা বন্দোবস্তের মাধ্যমে। জমিদার ও ইজারাদার সকলেই এসময় ছিল সরকারের রাজস্ব ঠিকাদার মাত্র। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব বর্তায় নবাবের উপর। কিন্তু ক্ষমতাশূন্য নবাবের পক্ষে এককভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল অসম্ভব। এ পরিস্থিতিতে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, লুটপাট, মামলা-মোকদ্দমা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, পঞ্চসনা বন্দোবস্তের ব্যর্থতা সম্পর্কে কলকাতা কাউন্সিলের মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না। এসময় প্রাদেশিক কাউন্সিল এবং গভর্নর জেনারেল এন্ড কাউন্সিল এ বন্দোবস্তে ইজারাদারদের বিপরীতে জমিদারদের অপরিহার্যতা অনুভব করে তাদের সাথে বন্দোবস্তের চিন্তা করে। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে কোম্পানির সরকার সিদ্ধান্ত নেয় ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর স্থানিক ভিত্তি হিসেবে জমিদারদের প্রতিষ্ঠা করতে, যেমন করেছিল মুঘল সরকার।[২৩] ফলে ১৭৭৭ সালের এপ্রিল মাসে পঞ্চসনা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হবার আগেই একটি স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তনের আলোচনা শুরু হয়। পঞ্চসনা

Dhaka University Institutional Repository

বন্দোবস্ত পরবর্তী ভূমি ব্যবস্থা কীরূপ হবে তা নিয়ে খোদ গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ২৪ ডিসেম্বর, ১৭৭৬ এর তারিখের পত্রে *বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স* কলকাতা কর্তৃপক্ষকে জমিদারের সঙ্গে বার্ষিক মেয়াদে বন্দোবস্ত করার জন্য নির্দেশ দেয়।[২৪] পরবর্তীকালে ১৭৮৪ সালের *পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্টে* চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধান চালু করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রূপরেখাকে সামনে রেখে কোম্পানিকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসকে (১৭৮৬-৯৩ খ্রি.) গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হল কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য জমিদারদের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তি ব্যবস্থা। বিমূর্তভাবে এর ধারণা প্রথম প্রদান করেন আলেকজান্ডার ডাও ও হেনরি পেট্টলো। তাদের ধারণার মূর্ত রূপ দেন ফিলিপ ফ্রান্সিস, যা ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইনের ৩৯ ধারায় নীতিগত ভাবে স্বীকৃতি পায়। ১৭৮৫ সালে চার্লস স্টুয়ার্ট এ বন্দোবস্তের একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। এর ধারাবাহিকতায় কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার পথে দুটি অলঙ্ঘনীয় বাঁধা ছিল – প্রথমত; নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব, দ্বিতীয়ত; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সরকারি বিশেষজ্ঞ মহলে ঘোরতর মতানৈক্য। বোর্ড অব রেভেনিউর সভাপতি ও কাউন্সিল সদস্য জন শোর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে পরীক্ষামূলক বন্দোবস্ত করার পক্ষে মত দিলে ১৭৯০ সনে দশসালা বন্দোবস্ত করা হয় এই শর্তে যে, বোর্ড অব ডাইরেক্টর্স চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে মত দিলে তৎক্ষণাৎ দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করা হবে। ১৭৯২ সালের শেষে বোর্ড চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে রায় দিলে কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সনের ২২ মার্চ দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করেন। সাধারণ জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে উচ্চতর কর্মকর্তা, ডাইরেক্টর সভা, পার্লামেন্ট, তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক – সবাই দীর্ঘ দুই দশক কাল এ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করেন এবং এ বন্দোবস্তের বিকাশধারার শেষ পর্বে এসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন কর্নওয়ালিস।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৭৯০ সনের ১০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করা হয় বাংলা দশসালা বন্দোবস্ত।[২৬] দশসালা বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার মোট রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৬৮,০০,৯৮৯ টাকা।[২৭]

১৭৯০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি লিখিত মিনিটে কর্নওয়ালিস তাঁর কৃষি বিপ্লব প্রসঙ্গে বলেন যে, দশসালা বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ এতে উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত জমিদারি পরিচালনা করবে, আয় বৃদ্ধির জন্য তারা পতিত জমি আবাদ করবে, রায়তদের আশ্রয় ও উৎসাহ দিবে এবং এর সার্বিক ফল দাঁড়াবে বৈপ্লবিক হারে কৃষি সম্প্রসারণ; এবং কৃষি সম্প্রসারণের ফলে সম্প্রসারিত হবে কৃষি ভিত্তিক ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি হলে আমদানি-রপ্তানি বাড়বে এবং এর সাথে বাড়বে সরকারি আয়। জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, জমির পরিমাণের তুলনায় যেখানে কৃষক এত কম এবং কৃষকের উৎপাদনের উপরই যেখানে জমিদারের অর্থনীতি নির্ভরশীল, সেখানে জমিদার তাঁর আপন স্বার্থেই প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। অতএব জমিদার রায়ত সম্পর্কে সরকারি হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন হবে। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে জমিদার রায়ত সম্পর্কে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে, এ অধিকার সরকার সংরক্ষণ করতে পারে।[২৮] অবশেষে লর্ড কর্নওয়ালিসের কৃষি বিপ্লব মতবাদে প্রভাবিত হয়ে বোর্ড চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে অবস্থান নিয়ে অনতিবিলম্বে এ ব্যবস্থা প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্পিত সুফলে কল্লোলিত হয়ে বোর্ড এই আশা প্রকাশ করে যে, "এ বন্দোবস্ত দেশের অর্থনীতিতে ও প্রশাসনে উন্মোচন করবে এক নয়া দিগন্ত এবং স্থাপন করবে শান্তি ও সমৃদ্ধির সুদৃঢ় ভিত্তি।"[২৯] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, নিলামে জমি বিক্রয় এমন একটি ভূমি বাজার সৃষ্টি করবে যেখানে " অজ্ঞ, অযোগ্য ও দুর্বল মালিকের জমি বাজারে আসবে এবং এই বাজারের মাধ্যমে জমি যোগ্য পুঁজিবাদী মালিকের কাছে হস্তান্তরিত হবে।"[৩০] এসময় বোর্ড দশসালা বন্দোবস্তের শাসনতন্ত্র অনুমোদন করে এবং ১৭৯৩ সনের ২২ মার্চ দশসালা বন্দোবস্তকেই চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়। ১৭৯৩ সনের ২৩ মার্চ লর্ড কর্নওয়ালিস ঘোষণা করেন যে, দশসালা বন্দোবস্তের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর জমিদারদেরকে তাদের নিজ নিজ জমিদারির বেলায় প্রদেয় যে রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

তাতে কোন প্রকার রদবদল করা হবে না; উপরন্তু, তাদের ওয়ারিশ ও আইনগতভাবে অন্যান্য উত্তরাধিকারীদেরকে এই পরিমাণ প্রদেয় রাজস্বের ভিত্তিতে চিরস্থায়ীভাবে তালুকের ভোগ দখল করার অনুমতি দেওয়া হবে। এতে জমির উপর কৃষকের স্বত্ব অস্বীকার করে কৃষকদেরকে চিরদিনের জন্য জমিদারের শোষণের শিকারে পরিণত করা হয়।[৭৩] আর জমি হারা কৃষক অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রধানত ৪ টি উদ্দেশ্য ছিল –

প্রথমত, ১৭৯০ সনের দশসালা বন্দোবস্তের সময় বাংলায় বড় বড় আটটি জমিদার পরিবার ছিল যারা মোট রাজস্বের (এসময় সরকারি রাজস্ব জমার পরিমাণ ছিল ১,৯০,৪০,০০০ সিক্কা টাকা) প্রায় অর্ধেক টাকা দিত। পরিবারগুলোর আয়তন নিম্নরূপ[৩২] –

জমিদারের নাম	১৭৯০ সনের সরকারি রাজস্বের পরিমাণ	রাজস্বের শতকরা হার
১। বর্ধমান রাজ – সিক্কা টাকা	৩২,৬৬,০০০	১৭.১৫
২। রাজশাহী রাজ	২২,৫০,০০০	১১.৮১
৩। দিনাজপুর রাজ	১৪,৮৪,০০০	০৭.৭৯
৪। নদীয়া রাজ	৮,৫৪,০০০	০৪.৪৮
৫। বীরভূম রাজ	৬,৩০,০০০	০৩.৩১
৬। বিষ্ণুপুর রাজ	৪,০০,০০০	০২.১০
৭। ইউসুফপুর জমিদারি (যশোর)	৩,০৩,০০০	০১.৫১
৮। রাজনগর জমিদারি (ঢাকা)	৩,০০,০০০	০১.৫৭
৯। লস্করপুর (রাজশাহী)	১,৮৯,০০০	০.৯৯
১০। ইদ্রিকপুর (রংপুর)	১,৬০,০০০	০.৮৪
১১। রওশনাবাদ (কুমিল্লা)	১,৫৪,০০০	০.৮৪

Dhaka University Institutional Repository

১২। জাহাঙ্গীরপুর (দিনাজপুর)	১,২৩,০০০	০.৬৪
মোট সিক্কা টাকা	১০,১১,০০০	৫৩.১১

সূত্র - Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal : A Study of its Operation (1790-1819)*, Bangla Academy, Dacca, 1979, p.03

এই জমিদারিগুলোর আনুগত্য ও যোগ্যতার উপর কোম্পানির শাসন নির্ভর করত। এই বড় জমিদারিগুলো একত্রিত হলে কোম্পানিকে উৎখাত করতে পারে এই শঙ্কায় এদের ধ্বংস করে ছোট ছোট জমিদার তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। লর্ড কর্নওয়ালিস মূলত এ মতের পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন বাংলায় কৃষি বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন ছোট জমিদার। তাই বন্দোবস্তের মাধ্যমে এ জমিদারদের উপর কঠোর শর্তারোপ করা হয়। যথা সময়ে রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হলে জমিদারি নিলামে দিয়ে অর্থ আদায় করার বিধান করা হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়, দশ বছরের মধ্যে বর্ধমান ছাড়া প্রায় সব বড় জমিদার পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়।

বৃহৎ জমিদারিগুলোর পতনের একটি ক্রমধারা নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হল[৩৩] –

জমিদারের নাম	বাৎসরিক সদর জমা, ১৭৯৩ খ্রি. সিক্কা টাকা	বাৎসরিক সদর জমা, ১৮০৩ খ্রি. সিক্কা টাকা
১। বর্ধমান রাজ	৩২,৬৬,০০০	৩০,০০,০০০
২। রাজশাহী রাজ	২২,৫০,০০০	৮৮,০০০
৩। দিনাজপুর রাজ	১৪,৮৪,০০০	১,৬৬,০০০
৪। নদীয়া রাজ	৮,৫৪,০০০	৩৯,০০০
৫। বীরভূম রাজ	৬,৩০,০০০	১৫,০০০
৬। বিষ্ণুপুর রাজ	৪,০০,০০০	শূন্য
৭। ইউসুফপুর জমিদারি (যশোর)	৩,০৩,০০০	শূন্য

Dhaka University Institutional Repository

৮। রাজনগর জমিদারি (ঢাকা)	৩,০০,০০০	শূন্য

সূত্র - সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, পৃ.১৫৯।

এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার শ্রেষ্ঠ ভূস্বামীদের পতন একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ছিল। এসকল জমিদারি থেকে সৃষ্টি হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র জমিদারি। এ সময় প্রতিষ্ঠিত এসকল ছোট ছোট জমিদাররাই ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রেখেছিল।

দ্বিতীয়ত, কোম্পানি ছিল একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা। পূর্বে অনেক জমিদার নিদিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হয়। ফলে বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় আইন করা হয় যে, ভবিষ্যতে কখনো রাজস্ব বৃদ্ধি করা হবে না, তবে কোন অবস্থাতেই জমিদার, তালুকদারগণ রাজস্ব বাকি রাখতে পারবে না। রাজস্ব বাকি পড়লে সে জমি নিলামে বিক্রি করে বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হবে। তবে এ পদ্ধতিতে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের কৌশল ব্যর্থ হয়। বন্দোবস্তের প্রথম দশ বছরের মধ্যেই অসংখ্য জমিদারি নিলামে ওঠে। ফলে সরকারের ভূমির রাজস্বের পরিমাণ কমে যায়। ধীরে ধীরে কোম্পানির রাজস্ব ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে পরবর্তীতে ঘাটতি বাজেট পূরণ করার জন্য কোম্পানি বাড়তি করারোপ করে।

তৃতীয়ত, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করে ব্রিটিশ সুলভ সুশৃঙ্খল শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়েছিল। লর্ড কর্নওয়ালিস ভেবেছিলেন, জমিদার সহজেই তাঁর রায়তের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহ করতে পারবে এবং জেলা কালেক্টর তা জমিদারের কাছ থেকে আদায় করবে। কালেক্টরদের ক্ষমতা দেয়া হয় জমিদারদের কাজ পর্যবেক্ষণের যাতে জমিদার পাট্টায় অনুল্লিখিত খাত থেকে রাজস্ব আদায় না করে। কালেক্টরের ক্ষমতা জনগনের স্বার্থ রক্ষা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা প্রণয়নে ব্যয় করার চিন্তা করা হয়। তবে বাস্তবে এ বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সরকার যা আশা করেছিল ফলাফল ছিল এর বিপরীত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত, সমকালীন ব্রিটেনে যেমন ভূস্বামী শ্রেণির নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব হয়েছিল তেমনি বাংলায়ও জমিদারদের মাধ্যমে অনুরূপ কৃষি বিপ্লবের চিন্তা ছিল কোম্পানির। জমিদার কর্তৃক ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগের ফলে ব্রিটেনে কৃষি বিপ্লব সম্ভব হয়। অনুরূপ ব্যবস্থা অর্থাৎ জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রদান করে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষির উন্নতিকল্পে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তাগণ ভেবেছিলেন। কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর এ ব্যবস্থা কার্যকরী করার মত পরিবেশ তৈরি করা যায়নি। তাই কোম্পানির উদ্দেশ্যটি প্রশংসনীয় হলেও তা সফল হয়নি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রি.) রাজস্ব ও ভূমি ভোগদখল ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালে তা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।[৩৪] রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জমিদারদের সাথে আঁতাত গড়ার কাজে আশু সাফল্য আসেনি। এর কারণ, বন্দোবস্তের মূল শর্তাদি জমিদারদেরকে তুষ্ট করতে পারেনি। তবে পরে তাদেরকে অপরিসীম ক্ষমতা দেওয়ার পর এবং দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতির আলোকে সরকারের রাজস্ব দাবি অনেক লঘু হয়ে আসায় ভূ-স্বামী শ্রেণি সূর্যাস্ত আইনের কবল থেকে রক্ষা পায়। এর ফলে সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। এর প্রমাণ সিপাহী বিপ্লব, স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকালে সরকারকে জমিদার শ্রেণির অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান।[৩৫]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নেপথ্যে শাসকগণ ব্রিটেনের আদলে যে পুঁজিবাদী পরিবর্তন এবং শিল্প বিপ্লবের আশা করেছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি। নতুন বা পুরানো কোন জমিদারই ব্রিটেনের জমিদারদের মত উন্নয়নমুখী জমিদার হয়ে ওঠেনি। পুঁজি সংগঠনমূলক উপকরণের সাহায্যে জমির উন্নতিবিধান না করে তারা বরং মহাজনি বিনিয়োগ, খাদ্যশস্যের ব্যবসায়, নতুন তালুক ক্রয়, বন্ড, উপকর, শহরের বিষয় সম্পত্তি, রায়তদের খাজনা বৃদ্ধি ও তাদের ওপর আবওয়াব বা অবৈধ উপ-কর আরোপ ইত্যাদিতে নিয়োজিত হন। এর কারণ ছিল পুঁজিবাদী বিনিয়োগের চেয়ে সামন্তবাদী শোষণ ছিল অধিকতর লাভজনক। জমিতে বিনিয়োগ কম লাভজনক ও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল বলে জমিদারদের তাদের পুঁজি জমিতে বিনিয়োগ করার কোন অর্থনৈতিক যুক্তি ছিল না। পক্ষান্তরে, ইংল্যান্ডে সে সময় কৃষিকে উৎসাহিত করার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

একটা শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে উঠেছিল। আর সেই সাথে ঐ দেশের সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ও ভূমি মালিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বাংলার ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে, জমিদারগণ সে ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। কৃষি খাতে উন্নতি বা প্রবৃদ্ধির জন্য শিল্পায়নের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। কিন্তু কোম্পানি শাসনে বাংলার কৃষি অর্থনীতির সে ধরণের কোন সুযোগ ছিল না। ফলে এখানকার পরিস্থিতি পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে অপচয়কারী ভোগবাদী সামন্ত মানসিকতা গড়ে উঠারই অনুকূল ছিল। বাংলার জমিদার শ্রেণি সে মানসিকতার বাস্তব প্রমাণও দিয়েছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জমিদার কর্তৃক আরেকটি মধ্যস্বত্ব শ্রেণি তৈরি করা।[৩৬] মধ্যস্বত্ব প্রকৃতপক্ষে ছিল জমিদারদের সৃষ্ট আরেকটি সম্পত্তি। অন্যকথায় সম্পত্তির ভিতর সম্পত্তি। জমিদার কর্তৃক এহেন স্বত্ব সৃষ্টি ছিল আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি তাদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার একটি দিক। মধ্যস্বত্ব ছিল জমিদারি স্বত্বের মতোই হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারযোগ্য। তবে মধ্যস্বত্বের দায়-অধিকারের বৈশিষ্ট্য সকল অঞ্চলে সমান ছিল না। স্বত্বের উৎপত্তি ও সম্পর্কের দিক বিচার করলে মধ্যস্বত্বকে মোটামুটি দুইটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় – পত্তনিস্বত্ব ও পতিত-আবাদ স্বত্ব।[৩৭] স্থায়ী অধিকার লাভের ফলে এই নতুন মধ্যস্বত্বাধিকারীরাও আবার উপবন্দোবস্ত দিতে থাকে। আর এভাবে ভূ-স্বত্বে পর্যায়ক্রমিক স্তর তৈরি হতে থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা কয়েক স্তরে পৌঁছায়। এভাবে ভূমি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সোপানক্রমিক মধ্যস্থ শ্রেণির আবির্ভাবের সুগভীর আর্থ সামাজিক তাৎপর্য ছিল। মধ্যস্বত্ব মানেই প্রজার ওপর খাজনার অতিরিক্ত চাপ। তবে মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এ যাবৎকালের বনজঙ্গলময় এলাকায় আবাদি জমির সম্প্রসারণের প্রয়াসে এ ধরনের বন্দোবস্তধারীদের ইতিবাচক ভূমিকা।

কর্নওয়ালিস প্রশাসনের প্রত্যাশা ছিল তাদের এই নতুন ভূমি ব্যবস্থাটিকে জমিদাররা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে নজিরবিহীন সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় স্বাগত জানাবে। তার কারণ এই যে, এই ব্যবস্থার আওতায় ভূ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকানা সৃষ্টির এই সুযোগটি ইতোপূর্বে আর কখনও ছিল না। এদেশে ব্যক্তিগত ভূমিস্বত্ব কোনোদিন বিধিবন্ধনে আবদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করার প্রয়োজন হয়নি, দেশীয় প্রথানুসারে স্বত্ব স্বীকৃত হয়েছে মাত্র।[৩৮] এসময় এই নবসৃষ্ট ভূ-সম্পত্তি বিনামূল্যে জমিদারদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় জমিদারগণ চিরকালের মতো নির্ধারিত হারে সরকারি রাজস্ব পরিশোধের ব্যতিক্রমধর্মী সুবিধা লাভ করে। বস্তুত এ সিদ্ধান্তটি সরকারের দিক থেকে রাজস্বের নিরিখে নিশ্চিতভাবেই একটি ত্যাগ স্বীকার। আর তাই স্পষ্টতই সরকার গভীর আগ্রহে আশা করছিলেন যে, এক সুবিধাভোগী পক্ষ হিসেবে জমিদারগণ এই বন্দোবস্ত ব্যবস্থা বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনা সহকারে গ্রহণ করবে ও ব্রিটিশ সরকারের সুশাসনের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। কিন্তু এসময় সরকার যা ভাবেনি তাই ঘটেছে। জমিদাররা বরং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় অসন্তোষ ও ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করছে। এমনকি বহু হতাশ জমিদার এই ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে, অনেকে এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিরোধও গড়ে তোলে। জমিদার শ্রেণির অসন্তোষের যুক্তিযুক্ত কারণও ছিল নিম্নরুপ –

প্রথমত, পূর্ববর্তী দশ বছরের প্রকৃত খাজনা আদায়ের এক স্থূল গড়পরতার ওপর ভিত্তি করে জমিদারদের ওপর রাজস্ব নিরূপণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন তালুকের উপর কর প্রয়োজনের চেয়ে কম আবার বেশীও হতে পারে। যাদের উপর আরোপিত কর অত্যাধিক হয় তাদের পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী। কারণ সরকারি খাজনা মওকুফের কোন সুযোগ ছিল না। উপরন্তু সূর্যাস্ত আইনের প্রয়োগ ছিল। এ প্রসঙ্গে জমির মালিকগণ ভূমি বন্দোবস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে তাদের বক্তব্যের সপক্ষে সনাতন ঐতিহ্যিক প্রথার বিষয় তুলে ধরেন, যার আওতায় প্রাকৃতিক কারণে ইতোপূর্বে ফসলহানি ঘটলে তাদেরকে সরকারি রাজস্ব মওকুফ করা হতো। জমিদারদের স্থানীয় প্রভাবে অনেক জেলার কালেক্টরও বোর্ড অব রেভেনিউকে জমিদারের দাবী মেনে নিতে উপদেশ দেয়। উদাহরণস্বরূপ বর্ধমান জেলার কালেক্টর বোর্ড অব রেভেনিউকে জানান যে, বর্তমান আইন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে জমিদার খাজনা সংগ্রহ করতে সত্যিই অপারগ। তাদের দাবী মোটেই অযৌক্তিক নয়। জমিদার সমাজে অসন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি রাজস্ব অনাদায়ের ফলে প্রতি মাসে তাদের জমি

নিলামে বিক্রি হচ্ছে। যে কারণে তারা নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করতে পারছে না সে কারণ সত্বর দূর করা দরকার।[৩৯]

দ্বিতীয়ত, জমিদারদের আরও একটি অভিযোগ ছিল তালুক নীতির প্রশ্নে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধিবিধান অনুযায়ী, যেসব তালুক এ যাবৎ জমিদারদের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদান করে আসছে সেসব তালুকের প্রত্যেকটিকে একেকটি স্বতন্ত্র জমিদারি হিসেবে গণ্য করতে হবে। সকল বড় আকারের জমিদারির নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের বহু তালুক ছিল। এসব তালুককে কোনরকম ক্ষতিপূরণ না দিয়েই সংশ্লিষ্ট জমিদারি থেকে সেগুলিকে আলাদা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। তালুকগুলি এভাবে আলাদা করে ফেলার কারণে বহু জমিদারি, যেগুলি ব্যবস্থাপনা বা অন্য কারণে তালুকের সৃষ্টি করেছিল, কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদেরকে তাদের প্রজাদের পাট্টা প্রদানের নিয়ম করা হয় যাকে বলা হয় পাট্টা রেগুলেশন। এটিও জমিদারদের জন্য আরেকটি অসুবিধাজনক আইন ছিল। কারণ এ আইনটি এই মর্মে জমিদারদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যে, তারা নির্ধারিত অঙ্কের খাজনার অতিরিক্ত আবওয়াব বা এ ধরনের কোন কর আরোপ করতে পারবে না। জমিদারদের বিবেচনা ও দাবি অনুযায়ী, এ শর্তটি ছিল জমিদারি ব্যবস্থাপনা ও মালিকানায় সরাসরি হস্তক্ষেপ।

জমিদারদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ, সূর্যাস্ত আইন প্রয়োগের আওতায় বিপুল হারে জমি মালিকানার হস্তান্তর, সরকারি রাজস্বের ক্রমহ্রাস প্রবণতা, স্তূপাকারে জমে উঠা দেওয়ানি মামলা নিস্পত্তিতে বিচার বিভাগীয় ব্যর্থতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি আর সেই সাথে আনুষঙ্গিক অন্যান্য সকল বিষয় সরকারের জন্য বেশ অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। এমন আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে যে, এই প্রবণতাকে ঠেকাতে না পারলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে বাধ্য। ফলে জমিদারের কিছু দাবী সরকার মেনে নিয়ে ১৭৯৫ সনে '৩৫ নং সংশোধনী রেগুলেশন' নামে একটি নতুন আইন জারি করে জমিদারকে সীমিত স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রদান করে। কিন্তু এ আইনে জমিদার সমাজ খুশি হয়নি। ১৭৯৬ থেকে জমিদার সমাজ প্রজার উপর সামন্ত ক্ষমতা লাভের জন্য প্রচণ্ড প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পরবর্তী

সময়ে লর্ড ওয়েলেসলির শাসনামলে (১৭৯৭ - ১৮০৫ খ্রি.) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী এ পট পরিবর্তনকে অত্যন্ত উদ্বেগের চোখে দেখা হয়। ওয়েলেসলি সরকার ছিল সাম্রাজ্যবাদী। এই সময়ে প্রতি মাসে শত শত জমিদারি নিলামে বিক্রয় করা হয়। ১৭৯৩ সনের পূর্বেকার মতো রাজস্ব আদায় অনিয়মিত ও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে, প্রশাসনিক ব্যয় বেড়ে যায়, রাজস্ব আয় কমে আসে, দেশের অভ্যন্তরভাগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ফলে লর্ড ওয়েলেসলি বন্দোবস্ত সম্পর্কিত মূল বিধিগুলির কিছু সংশোধন করে জমিদার শ্রেণির সঙ্গে একটা আপসে উপনীত হবার সিদ্ধান্ত নেন।

এরই প্রেক্ষাপটে প্রণীত হয় ১৭৯৯ সনের ৭ নং রেগুলেশন যা সাধারণত *হাফতম* বা সপ্তম আইন নামে পরিচিতি লাভ করে।[৪০] এ আইনের ফলে রায়তদের ওপর জমিদারদের লাগামহীন ক্ষমতা দেওয়া হয়। জমিদারগণ বকেয়া আদায়ের নামে প্রজাদের ফসল, গবাদি ও সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয় করে বকেয়া আদায়ের অধিকার লাভ করে। স্বত্বাধিকারী হিসেবে তারা খেলাপি রায়তদের তাদের নিজ নিজ কাছারিতে তলব করার ও বকেয়া পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে আটকে রাখার, কোন খেলাপি রায়ত তার পরিবার ও সহায় সম্পত্তি নিয়ে অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গেলে ঐ রায়তের গ্রামের সকলের ওপর পাইকারি জরিমানা আরোপের ক্ষমতা লাভ করে। পরগনা প্রথা অগ্রাহ্য করে জমিদাররা যথেচ্ছভাবে খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতা লাভ করে। সংক্ষেপে, রায়তগণ এতকাল যাবৎ ঐতিহ্যগতভাবে যেসব প্রথাগত অধিকার ভোগ করে আসছিল *হাফতম* সেসব অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করে। এ আইনকে পরবর্তীকালে (১৮১১ খ্রি.) ব্রিটিশ শাসনের প্রথম কালাকানুন বলে আখ্যায়িত করা হয়। জনমনে এ আইন এমন বিভীষিকা তৈরি করে যে, সকল বাঙালির কাছে তা ভয়ংকর '*হাফতম*' (সপ্তম) নামে পরিচিতি লাভ করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল আইনের পরবর্তী সংশোধন হয় ১৮১২ সনের ৫নং রেগুলেশনের অধীনে। আইনটি *পানজাম* বা পঞ্চম নামে পরিচিত।[৪১] এই রেগুলেশনের আওতায় জমিদারগণ যে কোন মেয়াদের জন্য তাদের জমি ইজারা দেওয়ার অধিকার লাভ করে। ইজারার মেয়াদ ১৭৯৩ সনের আইনে সর্বাধিক দশ বছরের মধ্যে সীমিত ছিল। পরবর্তীকালে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে বদলে দেয় ১৮১৯ সনের ৮নং রেগুলেশন যা সাধারণভাবে পত্তনি আইন নামে পরিচিত। এই আইন বলে জমিদার ও রায়তের মধ্যবর্তী একটি বহু স্তর বিশিষ্ট মধ্যস্বত্ব শ্রেণি সৃষ্টি করার অধিকার লাভ করে। বাস্তবিকপক্ষে, এ ছিল জমিদারি ক্ষমতার চরম শিখর এবং একই সঙ্গে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা। এই আইনের আওতায় জমিদারগণ তাদের খেলাপি পত্তনিদারদের জমি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করার অধিকার লাভ করে, ঠিক যেভাবে সূর্যাস্ত আইনের আওতায় খেলাপি জমিদারের জমি নিলাম হয়ে যেত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই জমিদারের শক্তি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দেয়। এর পরে একটা সময়ের জন্য এ ব্যবস্থায় স্থিতি বিরাজ করে। এমনকি, জমিদার শ্রেণির একটা তুলনামূলক সমৃদ্ধিও দেখা দেয়। পরবর্তীতে কয়েক দফা আইনে (১৭৯৫-এর ৩৫ নং প্রবিধান, ১৭৯৯-এর ৭ নং প্রবিধান, ১৮১২ সনের ৫ নং প্রবিধান এবং ১৮১৯-এর ৮ নং প্রবিধান) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জমিদারগণ তাদের খাজনা বৃদ্ধি ও দ্রুত আদায়ের অধিকার লাভ করেন। ফলে দেখা যায় যে, রাজস্ব বকেয়া থাকার কারণে জমিদারি তালুকের প্রকাশ্য বিক্রয়ের ঘটনা ১৮২০ খ্রি. এর পর হতে বিরল ঘটনা হয়ে ওঠে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে জমিদার শ্রেণির সমৃদ্ধি হলেও পাশাপাশি কৃষকের জীবনে অনুরূপ সমৃদ্ধি আসে নি। যার পরিণতিতে পরবর্তীকালে বাংলার প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে ১৮৫০-এর দশকের শেষভাগ থেকে কয়েক দফা কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। এ বিদ্রোহ ছিল জমিদার ও রায়তদের মধ্যে ছিন্ন সম্পর্কের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ। সাঁওতাল পরগণায় বিদ্রোহের মাধ্যমে এ সংকটের শুরু, এরপর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জেলার নীল চাষিরা বিদ্রোহ করে। এই সময় বাংলার কোন কোন এলাকায় কৃষকেরা জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ও জমিদারদের উদ্বৃত্ত শোষণ বন্ধের লক্ষ্যে একত্রে জোট বাঁধে। ফলে ব্যাপকভাবে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার অবক্ষয় শুরু হয়। ক্রমাগত সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার ১৮৫৯ সনে খাজনা আইন এবং ১৮৮৫ সনে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার সাধনের চেষ্টা করে।[৪২] খাজনা আইন জমিদার ও কৃষক

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে কোন উন্নতি ঘটাতে না পারলেও বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনটি নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল কাঠামোতে পরিবর্তন আনে এবং দেশের পল্লী অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

১৯৩৫ সালে বাংলায় 'কৃষক প্রজা পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এ দলের নেতা এ কে ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে বাংলায় সরকার গঠন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটানোর পদক্ষেপ নেন। এসময় ভূমি রাজস্ব কমিশন (ফ্লাউড কমিশন) গঠিত হয়। ১৯৪০ সনে ফ্লাউড কমিশন তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে জমিদারি ব্যবস্থা বহাল রাখা সম্ভব নয় এবং তারা সকল মধ্যস্বত্বের অস্তিত্ব বিলোপ করার সুপারিশ করে।[৪৩]

১৯৪৬-৪৭ সালে উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সরকার প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দুটি বিল আইনসভায় উত্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলুপ্তি ও বর্গাদারদের অবস্থানগত মর্যাদার উন্নতি বিধান করা। কিন্তু দেশ বিভাগের রাজনীতির কারণে বিল দুটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত করা যায় নি। ১৯৪৭ খ্রি. পরবর্তীতে বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) চূড়ান্তভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার অবসান ঘটে। এসময় থেকে কৃষক জমির মালিক বা স্বত্বাধিকারী হিসেবে অভিহিত হয় এবং প্রজা হিসেবে সরকারকেই তারা সরাসরি খাজনা প্রদান করতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। Karam Ali, "*Muzaffarnamah*", Translated into English : Jadunath Sarkar in *Bengal Nawabs*, Asiatic Society, Calcutta, 1985, p.78

২। তাজুল ইসলাম হাশমী, *ঔপনিবেশিক বাঙলা*, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ.৩

৩। আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)*, বাংলা একাডেমী, ২০১২, পৃ.৩৯

৪। সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, চয়নিকা, ঢাকা, জুলাই ২০১৩, পৃ.২৯

৫। L. Scrafton, *A History of Bengal : Before and After Plassey (1739-1758)*, Oxford, London, 1763, Indian Editions, Calcutta, 1775, p.87

৬। Colonel G.B. Malleson, *Lord Clive and the Establishment of the English in India*, Oxford, At the Clarendon Press, 1900, p.108

৭। *Fourth Parliamentary Report 1773*, quoted in W.K. Firminger, *Historical Introduction to the Bengal portion of the Fifth Report*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1962, (Reprint) p.175

৮। Ramsay Muir, *The Making of British India 1756-1858*, Manchester: At the University Press, London, August, 1915, p.67

Dhaka University Institutional Repository

৯। Letter of Major Carnac, 26 February 1763, quoted in John Malcolm, *The Life of Lord Clive*, Vol. II, John Murray, Albemarle Street, London 1830, p.282-283

১০। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ.৪৬৬-৪৬৭

১১। Romesh Dutt, *The Economic History of India Under Early British Rule*, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. London, August 1906, p.33

১২। Romesh Dutt, *op.cit.*,p.05

১৩। M.Abdur Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal (1757-1947)*, The University of Dhaka, 1978, p.377

১৪। S.C. Sarkar & K.K. Datta, *Modern Indian History*, Vol-II, The Indian Press (Pubs.) Private, Ltd. Allahabad, 1959, p.89

১৫। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৩

১৬। কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৪৮৮

১৭। সুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস* (অষ্টাদশ শতাব্দী), কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোঃ কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ.৫৭

Dhaka University Institutional Repository

১৮। B.B. Misra, *The Central Administration of the East India Company 1773-1834*, Oxford University Press, India Branch, 1959, p.114

১৯। B.B. Misra, *op.cit.*, p.177

২০। John H. Harington, *An Elementary Analysis of the Laws and Regulations*, Vol-II, Printed at the Honorable Company's Press, Calcutta, 1814 and 1815, p.16

২১। Sixth Report from the Select Committee, 1782. P.35 (Quoted in), B.B. Misra, *op.cit.*,p.180

২২। Samwell Middleton to Waren Hastings, 5 February, 1775. (উদ্ধৃত), সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯০

২৩। B.B. Misra, *op.cit.*, p.122

২৪। Despatehes to Bengal. 24 December, 1776. Para 41. (উদ্ধৃত), সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০২

২৫। R.Guha, *A Rule of Property for Bengal*, Orient Longman Limited, New Delhi, 1959, p.11

২৬। Anil Chandra Banerjee, *op.cit.*, Vol-I, p.291-292

২৭। N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal (1757-1905)*, University of Calcutta, 1996, p.80

Dhaka University Institutional Repository

২৮। Cornwallis's Minute. 3 February, 1790, (quoted in), R.Guha, *op.cit.*, p.172

২৯। John H. Harington, *op.cit.*, p.191

৩০। Thomas Law, *A Sketch of Some Late Arrangements and a View of the Rising Resources in Bengal*, (London, 1792), p.179 (quoted in), Sirajul Islam "Permanent Settlement and Peasant Economy", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971)*, Vol-II (Economic History), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p.271

৩১। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্ল্ড, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ.১৩

৩২। Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal : A Study of its Operation (1790-1819)*, Bangla Academy, Dacca, 1979, p.03

৩৩। সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৯

৩৪। Shirin Akhtar, "Land Control and Landed Society During the Nawabi Regime", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971)*, Vol-III (Social and Culturul History), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p.73

৩৫। A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Book Depot, Bombay, 1948, p.36

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, পুনঃমুদ্রণ ২০১২, পৃ.৩৮৯

৩৭। Sirajul Islam "Permanent Settlement and Peasant Economy", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971)*, Vol-II (Economic History), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p.277

৩৮। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০২, পৃ.৫

৩৯। Bengal Revenue Consultations. 27 February. 1795. No. 29. (উদ্ধৃত), সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৫

৪০। Francis Floud, *Report of the Land Revenue Commission*, Vol-I, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1940, p.21

৪১। Francis Floud, *op.cit.*, Vol-I, p.22

৪২। বদরুদ্দীন উমর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ.২৬

৪৩। B.K. Roychowdhury, *Permanent Settlement and After*, The Book Company, Ltd. Calcutta, 1942, p.64

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য নীতি এবং বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির উন্মেষপর্ব

মধ্যযুগে বাংলার সম্পদের কাহিনী প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এখানকার শিল্প ও উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য এশিয়ার বণিকদের পাশাপাশি দূর সমুদ্র পারের বিদেশী বণিকদেরও আকৃষ্ট করেছিল। মূলতঃ প্রাচীন ভারতবর্ষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এ ধারাবাহিকতাই দেখা যায়, মধ্যযুগের ভারতবর্ষে মুঘল শাসনামলে (১৫২৬-১৮৫৮ খ্রি.) বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানি ভারতে বিশেষ করে সুবা বাংলায় ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য কুঠি স্থাপন করতে শুরু করে। মধ্যযুগের ইউরোপ মনে করত যে, ভারতবর্ষ এক সোনার খনি, "এল ডোরাডো", সেখানে সোনা, রূপা অঢেলভাবে পাওয়া যায়। ফলে এই দেশে আসার জন্য ইউরোপীয় বণিকরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে স্পেন ও পর্তুগালের বণিকদের মধ্যে ভারতের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায়। মূলতঃ মসলা বাণিজ্যকে সামনে রেখে আরব বণিকদের আওতার বাইরে থেকে ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা ইউরোপের এ দেশদ্বয়েই প্রথম শুরু হয়। ১৪৯৮ সালে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার (১৪৬৯-১৫২৪ খ্রি.) মাধ্যমে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার ভারত ও ইউরোপের ইতিহাসে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। পর্তুগীজদের প্রদর্শিত পথ ধরে পরবর্তীতে ক্রমে ওলন্দাজ, ফরাসি, দিনেমার ও ইংরেজ বণিকরা ভারতে আসতে শুরু করে। এর ফলে প্রাচ্য দেশের বাণিজ্যে আরব বণিকদের একচেটিয়া অধিকার লোপ পায়। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপীয়রা এদেশের সঙ্গে স্থায়ী বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিক থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর বাংলা বাণিজ্যে লাভের অঙ্ক ক্রমশ বাড়তে থাকে। কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরে যথাক্রমে ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমারদের প্রধান বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। দুর্গ বানিয়ে এ স্থানগুলোকে সুরক্ষিত করা হয় এবং প্রথম থেকেই এই উপনিবেশগুলো ঘিরে এদেশীয়

Dhaka University Institutional Repository

বণিক, মহাজন, দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, সরকার ও বেনিয়ানদের ভিড় বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় কোম্পানির সুশৃঙ্খল বাণিজ্যিক তৎপরতার ফলে বাংলায় পণ্য উৎপাদনের গতি সঞ্চারিত হয় এবং সেই সাথে বাংলায় স্থানীয় একটা মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়।[১] সুতরাং নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, আধুনিক বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন করেই।

সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে পর্তুগীজ এবং দ্বিতীয়ার্ধে ও অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ওলন্দাজ ও ইংরেজরা বাংলার বাণিজ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। বলা যেতে পারে আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলার বাণিজ্যে ওলন্দাজ কোম্পানির প্রাধান্য ছিল বেশি। এছাড়াও বাংলার বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ ছিল ফরাসীদের বিশেষ করে ১৭৩০ এর দশকে ডুপ্লের নেতৃত্বে (১৭৩১-৪১ খ্রি.) ফরাসী বাণিজ্য বাংলায় উন্নতির শীর্ষে পৌছায়। ডুপ্লের পরবর্তী সময়ে ফরাসী বাণিজ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানি আঠারো শতকের তৃতীয় দশক হতে বাণিজ্যে এগিয়ে যায় এবং ক্রমশ ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে তাদের জন্য এ পথ সহজ ছিল না। এ জন্য তাদের দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়েছে।

ব্রিটিশ বণিকতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাইরের পৃথিবীতে ধন সম্পদ আহরণের জন্য ব্রিটিশ বণিকদের অভিযান শুরু হয়। বণিকদের কোম্পানি গঠনও এই সময় থেকে আরম্ভ হতে থাকে। ঔপনিবেশিক অভিযান এবং ইংরেজ বণিকদের সেই উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন এই নীতির স্বাভাবিক পরিণতি। পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি বণিকদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়েছে, আরেকদিকে ভারতের কৃষি, কুটিরশিল্প অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য সমস্ত ধ্বংস করে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। ১৬০০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ (১৫৫৮-১৬০৩ খ্রি.) ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করার জন্য ব্রিটেনের পক্ষে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার দিয়ে ২১৭ জন বণিককে একটি প্রাইভেট জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গঠন করার চার্টার প্রদান করেন। কোম্পানির নাম *The Governor and Company of*

Dhaka University Institutional Repository

Merchants of London Trading into the East Indies. যৌথ পুঁজি ছিল ৬৮,০০০ পাউন্ড। এর মেয়াদ ছিল ১৫ বছর কিন্তু নবায়নযোগ্য।[২] প্রায় একই সময়ে গঠিত হয় ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ড্যানিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মূলধন ও বাণিজ্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয় এর পশ্চিম উপকূল বন্দর সুরাটে (১৬১৩ খ্রি.)। ভারতে ইউরোপীয় পণ্যের চাহিদা ছিল না বলে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো এদেশের পণ্য ক্রয় করার জন্য স্বদেশ থেকে পণ্য না এনে স্বর্ণ ও রৌপ্য নিয়ে আসত। এ ধাতব সম্পদ লাভের পথ সুগম রাখার লক্ষ্যে মোঘল বাদশাহগণ অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির মত ব্রিটিশ কোম্পানিকেও এদেশে বাণিজ্য করার অধিকার দেয়। এর বিশ বছর পর ১৬৩৩ সালে সুবা বাংলার সাথে কোম্পানির বাণিজ্যিক যোগাযোগ শুরু হয়। তবে, তা চলতে থাকে অনিশ্চিত দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। এ সময় এমনকি কোম্পানির বাংলা বাণিজ্য লাভজনক নয় বিধায় কয়েক বার এ অঞ্চলে বাণিজ্য যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়ারও প্রস্তাব করা হয়।[৩] পরবর্তীতে বাংলায় বাণিজ্য কার্যক্রম চালানোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ১৬৫১ সালে হুগলীতে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করা হয়। এরপর থেকেই বাংলায় ইংরেজদের বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এসময় কোম্পানি বাংলা থেকে প্রধানত সুতিবস্ত্র, রেশমসুতা, রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম এবং সোড়া (লবণ মাটি) ইংল্যান্ডে নিয়ে যেত। ক্রয়কৃত দ্রব্য কোম্পানির বিনিয়োগ নামে পরিচিত। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উৎপাদিত এবং আড়ং এ (বিক্রয় কেন্দ্র) আনা পণ্যদ্রব্য বাংলা ভাষা না জানা ও কলিকাতায় বসবাসরত কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। তাই পণ্য ক্রয়ের জন্য কোম্পানিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হয়। এ নীতিকে বিনিয়োগ নীতি বলা হয়। বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিশেষ সুবিধা লাভ করেছিল। ১৬৫১ সালে কোম্পানি বার্ষিক তিন হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। বাংলার তৎকালীন সুবাদার শাহ্ সুজা ব্রিটিশ কোম্পানিকে এ সুবিধা প্রদান করেন।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বাণিজ্যে বিনিয়োগ দিন দিন বাড়তে থাকায় *কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স* পুঁজির নিরাপত্তার খাতিরে বোম্বে ও মাদ্রাজের অনুকরণে বাংলায় একটি সুরক্ষিত সার্বভৌম বসতি স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করে। ১৬৮২ সালে বাংলার বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উইলিয়াম হেজেজকে প্রথম গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তার পদবি হয় Governor Chief of the English East India Company in the Bay of Bengal.[৫] পরবর্তী সময়ে বাংলায় কোম্পানির গভর্নর জব চার্নকের রাজনৈতিক অভিলাষের ফলশ্রুতিতে কোম্পানি ও মুঘলদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং সরকার ব্রিটিশ কোম্পানিকে বিতাড়িত করে। ব্রিটিশ বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একদিকে সরকার যেমন বিদেশী মুদ্রা হতে বঞ্চিত হচ্ছিল তেমনি ব্রিটিশ কর্তৃক নৌপথ অবরোধ করে রাখায় মুঘল সরকারের বাণিজ্যও ব্যাহত হচ্ছিল। অবশেষে ১৬৯০ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) এ বিবাদ বন্ধ করে ইংরেজদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। নৌ শক্তিতে দুর্বল আওরঙ্গজেবের সরকার অর্থনৈতিক কারণেই কোম্পানিকে ক্ষমা করে দেন।[৬] এ সময় বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খান কোম্পানিকে নিয়ম মেনে ব্যবসায় করার অঙ্গীকারে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার নির্দেশ জারি করেন এবং কোম্পানিকে সুতানটিতে কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। তখন ইংরেজ কর্তৃক হুগলী থেকে মূল কুঠি সুতানটিতে স্থানান্তর করা হয়। ১৬৯৬ সালে কোম্পানি সুতানটি বসতিতে নির্মাণ করে তৎকালীন ব্রিটিশ রাজ তৃতীয় উইলিয়ামের (১৬৮৯-১৭০২ খ্রি.) নামে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। এ দুর্গকে কেন্দ্র করেই পরে দেশের অভ্যন্তরে ইউরোপীয় সামরিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৯৭ সালে বাংলার সুবাদার আজিম-উস-শান কোম্পানি কর্তৃক ১৬,০০০ টাকা নজরানা প্রাপ্ত হয়ে তাদের আরজি মোতাবেক ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পার্শ্ববর্তী তিনটি মৌজা সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার জমিদারি সনদ প্রদান করেন।[৭] এর বিনিময়ে সরকারকে কোম্পানি বার্ষিক ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা ৪ পয়সা প্রদান করবে। এসময় জমিদারির মধ্যে কোম্পানি তাঁর নতুন বাণিজ্যিক সম্ভাবনা আবিষ্কার করে। নতুন নতুন বাজার স্থাপন করে এবং সুষ্ঠু ব্যবসা বাণিজ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কোম্পানি অভূতপূর্ব ভাবে আকর্ষণ করে স্থানীয় দেশী ও বিদেশী বণিকদের। কলকাতা জমিদারি ক্রয় ছিল কোম্পানির অস্তিত্বের গ্যারান্টি। সাধারণ ভারতীয়দের চোখে, কোম্পানি কেবল একটি

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কোম্পানি ছিল মার্কানটাইল ইংল্যান্ডের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধি।[৮] অচিরেই কলকাতা দেশের একটি অন্যতম বড় ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানি-রপ্তানি কেন্দ্রে পরিনত হয়। ১৭৫৭ সালের মধ্যে কলকাতা একটি বড় বাণিজ্যিক শহর হিসেবে গড়ে ওঠে, আর ফোর্ট উইলিয়াম সারা বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্যিক রাজ্যের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়।

বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অষ্টাদশ শতকে যে ব্যবসায় পরিচালনা করত তা ছিল কোম্পানির সরকারি ব্যবসা। এই ব্যবসা একচেটিয়াভাবে ইংল্যান্ডের পক্ষ হতে ভারতে করার জন্যই কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের সনদ পায়। তবে এর বাইরে কোম্পানির কর্মচারীরাও ব্যক্তিগত ব্যবসায় বাণিজ্যও করত। লাইসেন্সধারী ইংরেজ বণিক ও লাইসেন্সহীন ইংরেজ বণিকরাও ব্যবসা করত। এই ব্যবসাকে বলা হত বেসরকারী ব্যবসা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে তার কর্মচারীদের পর্যাপ্ত বেতন প্রদান করত না বলে কোম্পানির কর্মচারীরা ভারতে ব্যক্তিগত ব্যবসায় বাণিজ্য করে নিজেদের আয় কিছুটা বাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। আর এতে কোম্পানির খুব বেশি আপত্তি ছিল না। এ প্রসঙ্গে পি জে মার্শাল বলেন, কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের নিয়োগ পত্রের সঙ্গেই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার পেত।[৯] এটি চাকরীর চুক্তিপত্রেই উল্লেখ থাকত। কোম্পানির কর্মচারীরা ছাড়াও এ দেশে আগত ধর্মযাজক, ডাক্তার, সেনা কর্মকর্তারাও ব্যক্তিগত বাণিজ্য করত। আর এ ব্যক্তিগত আয়ের জন্য তারা এ দেশীয় গোমস্তা, বেনিয়ান সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীর সাহায্য গ্রহণ করত। বিনিময়ে তারাও লভ্যাংশ পেত। এ ধরণের কাজ করে এ সময়টাতে বহু হিন্দু গোমস্তা, বেনিয়ান প্রচুর অর্থ আয় করে। ১৭০৭ সালে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় তবে সুবা বাংলা ছিল এর ব্যতিক্রম। নবাব মুর্শিদ কুলী খানের আমলে (১৭০৪-২৭ খ্রি.) এ অঞ্চল ছিল রাজনৈতিকভাবে শান্ত, নিরাপদ ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী। এ সময়কালে বাংলা বাণিজ্যে অগ্রগামী ওলন্দাজ ও ফরাসীদের পেছনে ফেলে ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রপ্তানি বাণিজ্যে ক্রমাগত পুঁজি বাড়িয়ে চলে। নবাব মুর্শিদ কুলী খানের আমলেই (১৭১৫ সালে) কোম্পানি সুবা সরকারকে পাশ কাটিয়ে দিল্লির দুর্বল মুঘল সম্রাট ফররুখ শিয়ারের (১৭১৩-১৯ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

নিকট শারমেন এর নেতৃত্বে এক ডেলিগেশন প্রেরণ করে। ডেলিগেশন সম্রাটকে ত্রিশ হাজার পাউন্ড পেশকাশ বা পুরষ্কার প্রদান করে বাংলা বাণিজ্যে কোম্পানির জন্য বাড়তি সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য আরজি পেশ করে। সম্রাট শারমেনের এ আরজি মঞ্জুর করে ১৭১৭ সালে কোম্পানিকে অপূর্ব সুবিধা প্রদান করে একটি ফরমান দান করেন।[১০]

১৭১৭ সালের এ ফরমানের মাধ্যমে ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পেলে কোম্পানির কর্মচারীরাও সেই অধিকার তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য ভোগ করার চেষ্টা করত। তবে, এ ব্যবস্থায় বাংলার নবাবরা বাঁধা প্রদান করেন। তথাপি বলা যায় যে, এ ফরমান ইংরেজদের ভারতে রাজনৈতিক বাণিজ্যিক প্রাধান্যের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এর বদৌলতে বাণিজ্য হতে অন্য সব প্রতিযোগীদের ইংরেজরা বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। কোম্পানির প্রবৃদ্ধির জন্য এ ফরমান ছিল একটি আইনগত ভিত্তি। আলিবর্দি খানের সময় দস্তকের অপব্যবহার বৃদ্ধি পায় এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলার (১৭৫৬-৫৭ খ্রি.) সাথে এ ব্যাপারে কোম্পানির সরাসরি বিরোধ দেখা দেয়।

প্রাক পলাশী যুগে বাংলার নবাবদের দৃঢ়তায় কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার সাহস পেত না। কিন্তু পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। ১৬৯০-১৭৫৬ খ্রি. সময়কালে কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে অধিকতর বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা আদায় করা এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের নিরাপত্তা বিধান করা। বাণিজ্যের প্রয়োজনে কোম্পানি প্রথমে যে বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করেছিল তাঁকে দাদনি ব্যবস্থা বলে। কোম্পানি কলকাতায় বসবাসরত ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি করত। এসব ব্যবসায়ীদের দাদনি ব্যবসায়ী বলা হত। দাদনি ব্যবসায়ীদের অনেকে কোম্পানির টাকা দিয়ে বড় ব্যবসার সুযোগ গ্রহণ করত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৩৬-৪০ সালে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫০ জন ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া যায়। তাদের কয়েকজন হচ্ছে, সুখময় শীল, কিশোর শেঠ, রামভদ্র চৌধুরী, রাধাকৃষ্ণ খান, পরমানন্দ বসাক, দুর্গারাম দত্ত, শুকদেব মিত্র, কৌতুকরাম ঘোষ ইত্যাদি।[১১] ১৭৩৮-৩৯ সালে কাশিম বাজারে ২৫ জন দাদনি বণিকের নাম পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

যায়। তাদের মধ্যে বেজরাম বোস, গোবর্ধন নিমদাশ, ইত্যাদিরা উক্ত ব্যবসায় বছরে ৭৯,৭৫০ টাকা দাদন গ্রহণ করে। ১৭৩৯ সালে ঢাকায় ১২ জন দাদনি বণিকের নামের একটি তালিকায় দেখা যায় তাদেরকে ২২,৫২৬ টাকা দাদন দেয়া হয়। এই তালিকায় হাফিজুল্লাহ পাইকার ও মাহমুদ পাইকার নামে দু'জন মুসলিমের নাম পাওয়া যায়।[১২]

কোম্পানি এদের সাথে চুক্তি করত। চুক্তিতে নিদিষ্ট মূল্য ও নিদিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহের শর্ত থাকত। কোম্পানি দ্রব্য ক্রয়ের জন্য তাদের দাদন অথবা অগ্রিম অর্থ প্রদান করত। এসব ব্যবসায়ীরা আবার অভ্যন্তরীণ বাজারের ব্যবসায়ীদের দাদন দিত। তৃতীয় পর্যায়ে তারা উৎপাদকদের দাদন দিত। ১৭৪৮ সালে দাদনি ব্যবস্থায় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। ১৭৫১-৫২ সালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ১৭৫৩ সালে এ ব্যবস্থার স্থলে এজেন্সি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ ব্যবস্থা চালু করার পেছনে যেসব কারণ দেখানো হয় তা হল – ক) ব্যবসায়ীদের আর্থিক অবস্থার অবনতি, খ) চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে অসুবিধা ও গ) ১৭৫২ সালে চুক্তি স্বাক্ষরকালে তাঁতীদের দুর্ব্যবহার।[১৩] এজেন্সি ব্যবস্থায় প্রত্যেক আড়ং দেখাশোনা করার জন্য একজন বেতনভোগী ইংরেজ রেসিডেন্ট থাকত। তার অধীনে থাকত বেতনভোগী গোমস্তা। গোমস্তার অধীনে থাকত কিছু কর্মচারী, যেমন মোহরি, সেরেস্তাদার, যাচনদার, মুকিম, তাগিদদার, বরকন্দাজ, পিয়ন ইত্যাদি। এ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ছিল। যদিও এসময় তাঁতীদের দাদন দেয়ার প্রচলন ছিল এবং কোম্পানির সাথে তাদের চুক্তিও হত। অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের পর এ ব্যবস্থা তাঁতীদের জন্য আরো ক্ষতিকর হয়েছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক স্বার্থে কর্মচারীরা কোম্পানির পরিচালক মণ্ডলীর (কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স) নির্দেশ উপেক্ষা করে রাজ্য স্থাপনের পথে এগিয়ে যায়। এর ধারাবাহিকতায় পলাশীর যুদ্ধের এক সপ্তাহ পর লর্ড ক্লাইভ তার মিত্র মীর জাফর আলী খানকে বাংলার নবাবের গদিতে বসান (২৯ জুন, ১৭৫৭ খ্রি.)। পলাশী যুদ্ধোত্তর বাংলায় ইংরেজদের অবস্থান ছিল শাসক ও ব্যবসায়ী হিসেবে। যেহেতু শাসক বর্গ ছিল একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অংশ সেহেতু ধারণা করা সঙ্গত যে, বাণিজ্যের স্বার্থেই শাসন

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালিত হত। তবে আর্থিক কারণে বাণিজ্য পরিচালিত হলেও শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থই এসময় প্রধান ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে কোম্পানির কর্মচারীরা সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসায় যেমন – লবণ, সুপারি, তামাক, চাল, তেল, ঘি, আফিম ইত্যাদিতে নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন করে। এ ঘটনাটিকে যথার্থভাবে 'Plassey Plunder' – আখ্যা দেয়া হয়েছে।[১৪] পলাশীর যুদ্ধের পর শাসক ও বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ফরাসি, ওলন্দাজ ও ড্যানিশ কোম্পানি ইংরেজ কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতায় না পেরে তারা কোম্পানির কাছে দুটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রথমত, প্রস্তাব করা হয় যে, এক সঙ্গে পণ্য ক্রয় করে চার কোম্পানির মধ্যে ভাগ করে নেয়া হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে, তাঁতীদের আঞ্চলিকভাবে ভাগ করে নেয়া হবে। অবশ্য শক্তিশালী ইংরেজ কোম্পানি উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।[১৫]

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করায় কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে থাকে। ফলে দেখা যায় যে, যেখানে প্রাক পলাশী যুগে কোম্পানির কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না এবং যখন কোম্পানি বিভিন্ন বণিক গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা করত, তখন কোম্পানি বিপুল পরিমান মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর সুযোগ সুবিধা অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি ক্রমাগত লোকসানের ফলে প্রায় দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়। এর মূল কারণই ছিল কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি ও অব্যবসায়ী খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। কোম্পানির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এর কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত বাণিজ্যে মেতে ওঠে এবং ঐ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর মত অব্যবসায়ী খাতে খরচ বাড়িয়ে চলে। কোম্পানির কর্মচারীরা ছাড়া অপর লাইসেন্সধারী বা বিনা লাইসেন্সের বণিকদের নাম ছিল স্বাধীন ব্যবসায়ী। এ সময় তারাও লাগামহীনভাবে বিনা শুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লিপ্ত হয়। এ সকল স্বাধীন ব্যবসায়ীদের কোম্পানিই লাইসেন্স দিয়ে বাণিজ্যের অনুমতি দিত। কাগজে কলমে এরা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বাস্তবে তারা ছিল স্বাধীন। আবার লাইসেন্স ছাড়া স্বাধীন ব্যবসায়ীরাও যে কোন উপায়ে সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে সামিল হয়। কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স এসকল কর্মকাণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে সমালোচনা করলেও কলকাতা কর্তৃপক্ষের দৃঢ় অবস্থানের কারণে এ বিষয়টির অনুমোদন করা ছাড়া পরিচালক সভার আর কোন বিকল্প ছিল না।

প্রাচ্য দেশে ইউরোপীয় কোম্পানি সমূহ বাণিজ্য পরিচালনা করেছে সামুদ্রিক উপকূলে অবস্থিত বিভিন্ন বাণিজ্য বসতি থেকে। সমুদ্র ছিল এদের সাধারণ মাধ্যম। স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে এরা কখনো মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেলায়। ইংরেজরাই সর্বপ্রথম বাণিজ্য বসতির সীমানা অতিক্রম করে এদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভ করে। দিওয়ানি লাভের পরেও কোম্পানির এদেশে রাজ্য স্থাপন না করার কারণ হিসেবে বলা যায় যে, একটি প্রাইভেট বাণিজ্যিক কোম্পানির পক্ষে বিদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ছিল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের পরিপন্থী। এছাড়া সেসময় ভারতে বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানির সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও ছিল। অতএব, দিওয়ানি গ্রহণের পর কোম্পানি ইঙ্গ – মুঘল যৌথ শাসন প্রবর্তন করে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনে হস্তক্ষেপ না করে দেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব হস্তগত করা, কোম্পানির কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও সুযোগ সুবিধার প্রসার ঘটানো এবং এ দেশের রাজস্ব দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করা। দিওয়ানি গ্রহণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল এদেশের রাজস্ব থেকে কোম্পানির ভারত ও চীন বাণিজ্যের পুঁজি সংগ্রহ করা এবং এদেশে পণ্য ক্রয়ের জন্য ইউরোপ থেকে ধাতব সম্পদের (স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি) আমদানি বন্ধ করা। তবে দিওয়ানি লাভের পর কোম্পানি তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিয়ে সক্রিয়ভাবে ভাবতে শুরু করে। এ সময় লর্ড ক্লাইভ তার দ্বিতীয় মেয়াদে (১৭৬৫-৬৭ খ্রি.) *সোসাইটি অব ট্রেড* গঠন করে এই সংস্থার হাতে লবণ, তামাক, সুপারির একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার দেন। এই ব্যবসার উপস্বত্ব ৬০ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ভাগ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া অন্য কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করেন। বিলাতের পরিচালক সভা লর্ড ক্লাইভের বন্দোবস্তকে নাকচ করায় সোসাইটি অব ট্রেড বা বাণিজ্য সমিতি লুপ্ত হয়। এদিকে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের গোমস্তা, বেনিয়ানদের বেনামে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাতে থাকে। ফলে ক্লাইভ বেআইনি বেসরকারি ব্যবসা বন্ধ করতে ব্যর্থ হন। তার পরবর্তী লর্ড

Dhaka University Institutional Repository

ভেরেলস্টের (১৭৬৭-৬৯ খ্রি.) হিসাব অনুসারে ১৭৬৬, ১৭৬৭ ও ১৭৬৮ সালে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে ৬৩,১১,২৫০ পাউন্ড এবং আমদানি হয়েছে ৬,২৪,৩৭৫ পাউন্ড দামের জিনিস। তার ফলে, লর্ড ভেরেলস্টের কথায় প্রত্যেকটি ইউরোপীয় কোম্পানি এদেশের টাকায় তাদের বাৎসরিক ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়েছে, কিন্তু তাতে এদেশের সম্পদ একেবারেই বাড়েনি।[১৬]

ইঙ্গ-মোঘল যৌথ শাসনের নায়েব নাজিম ও নায়েব দিওয়ান রেজা খানের সাথেও কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই প্রথম দ্বন্দ্বের শুরু হয়। তিনিও কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের অবৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এহেন ব্যবসার ক্ষতিকর ও নির্যাতনমূলক দিক সমূহ তিনি কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটির কাছে অভিযোগ আকারে তুলে ধরেন এবং এর সমাধান হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানরত সকল ইউরোপীয়দের প্রত্যাহারের জন্য কমিটিকে উপদেশ দেন। এ সময় তিনি হুঁশিয়ার করে দেন যে, এ সমস্যা সমাধান না হলে বন্দোবস্ত মোতাবেক রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে না। এদিকে ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধির মুখে রাজস্ব আদায়ে সংকট দেখা দিলে তা কোম্পানির জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে এ ধারণা থেকে সিলেক্ট কমিটি মফঃস্বলে ইউরোপীয়দের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে কতিপয় নিবর্তন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সময় স্বার্থে আঘাত লাগায় অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত ইউরোপীয়রা রেজা খানের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে। তার প্রশাসনকে উৎখাতের চেষ্টা চালায় এবং পরবর্তীতে ১৭৬৯-৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করে তাকে বরখাস্ত করা হয়। এ সময় দিওয়ানি শাসন পরিচালনার সরাসরি দায়িত্ব নেয় কোম্পানি।

১৭৭২ সালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৪-৮৫ খ্রি.) গভর্নর জেনারেলের পদে বসার পর ব্যবসা বাণিজ্যের অব্যবস্থা দূর করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কনীতির সংস্কার করেন। ১৭৭৩ সালে তিনি দস্তক প্রথা রহিত করেন এবং কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য শুল্ক দিতে বাধ্য করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, কোম্পানির কর্মচারীদের শুল্ক দিতে বাধ্য করতে না পারলে বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা থেকে যাবে

Dhaka University Institutional Repository

এবং কোম্পানির রাজস্ব আয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন জমিদারদের অধীনস্ত চৌকি বন্ধ করে দেন। তিনি কলকাতা, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনায় ৫ টি কেন্দ্রীয় শুল্ক ভবন স্থাপন করেন। কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার ৩ টি পণ্য, অর্থাৎ তামাক, লবণ ও সুপারি ছাড়া অন্য সকল পণ্যের জন্য ২.৫% হারে শুল্ক আরোপ করেন। এই শুল্ক ইউরোপীয় ও দেশীয় সকল ব্যবসায়ীর উপর প্রযোজ্য হয়।[১৭] এর ফলে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এসময় কোম্পানির কর্মচারীরা ২.৫% হারে যে শুল্ক তাদের বাণিজ্য বাবদ আদায় দিত পরে সরকারি দপ্তর থেকে তা ফেরত দেয়া হত। এর মাধ্যমেই মূলত কোম্পানির কর্মচারী কর্তৃক দেশীয় বণিকদের কাছে দস্তক বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের এ ব্যবস্থার ফলে ২.৫% শুল্ক আদায় দিয়ে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হলেও *রেগুলেটিং এ্যাক্ট* (১৭৭৩ খ্রি.) দ্বারা কোম্পানির কর্মচারীদের নিজ নামে ও বেনামীতে বাণিজ্য বে আইনি ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে ১৭৮৮ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রি.) এক রেগুলেশন দ্বারা রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার রদ করেন। এসময় বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীদের কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের অধিকার দেয়া হয়। এই শর্তের মধ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল যে, কোম্পানির স্বার্থ নষ্ট করে, কোম্পানির নাম ভাঙ্গিয়ে কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য করা চলবে না। লর্ড কর্নওয়ালিসের আগে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় বন্ধের জন্য এত দৃঢ় চেষ্টা করা হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেয়। কোম্পানির কর্মচারী ছাড়াও এসময় স্বাধীন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদেরও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন তিনি। এসময় তাঁতিদের উপর জবরদস্তি ও জমি কেনা নিষিদ্ধ করা হয়। এ অবস্থায় কোম্পানির কিছু কর্মচারী তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। কোম্পানি তার নিজ ব্যবসার জন্য যে মাল ক্রয় করত, সেই মাল সরবরাহের চুক্তি তাঁরা নিত। বোর্ড অব ট্রেডকে তাঁরা চুক্তিবদ্ধ মাল সরবরাহ করত। এজন্য তাঁরা দেশীয় উৎপাদক ও বণিকের কাছে কম দামে মাল কিনে কোম্পানিকে বেশী দামে সরবরাহ করে মুনাফা করত। তাছাড়া ফরাসী বা ডাচদের মাধ্যমে ইউরোপে মাল চালান দিত। এ সময় বিলাতের পরিচালক সভা উপলব্ধি

করেন যে, কোম্পানির মাল ক্রয়ের কাজে অবহেলা এবং বেশী দামে কোম্পানিকে মাল ক্রয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এ জন্য পরিচালক সভা ব্যবস্থা নিতে লর্ড কর্নওয়ালিসকে নির্দেশ দেয়। তাঁর দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত বাণিজ্য লুপ্ত হয়ে যায়। তিনি বাণিজ্য সমিতিকে কোম্পানির কর্মচারীদের কাছ থেকে মাল ক্রয় না করে সরাসরি দেশীয় বণিক ও দালালদের কাছ থেকে মাল ক্রয়ের নির্দেশ দেন।

১৮১৩ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড-বাংলা বাণিজ্যে এই কোম্পানির ছিল একচেটিয়া অধিকার। এরপর থেকেই এই অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। কারণ সমসাময়িক কালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) ইউরোপীয় মহাদেশ থেকে ইংরেজ বণিকদের প্রায় বিতাড়িত করেন। ফলে ভারতবর্ষের দিকেই ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের দৃষ্টি পড়ে। তাই ১৮১৩ সালে ভারতবর্ষে এবং আর বিশ বছরের মধ্যে চীনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লোপ পায়। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একেবারে তুলে দেয়া হয় এবং রাজ্য শাসন ও উপনিবেশ শোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন সম্রাট, অর্থাৎ নতুন যারা রাজা হলেন ইংল্যান্ডে তারা – ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণি।[১৮]

সতের শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশ চিনি, শস্য এবং কাপড়ের প্রধান রপ্তানিকারক হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতকে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানির (ইংরেজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ) সিংহভাগ ছিল। তিনটি কোম্পানিরই বাণিজ্যিক উপনিবেশ ও দুর্গ ছিল। ইংরেজদের কলকাতা ও ফোর্ট উইলিয়াম, ফরাসিদের চন্দননগর ও ফোর্ট আঁরলিও আর ওলন্দাজদের চুঁচুড়া ও ফোর্ট গুস্তাভাস ইউরোপীয় বণিকদের বাংলা বাণিজ্যের প্রধান ঘাটি। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, কাশিমবাজার, মালদা, রাজমহল, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম ও হুগলীতে এ তিন কোম্পানির ব্যবসাকেন্দ্র বা ফ্যাক্টরি ছিল। এদেশের রাষ্ট্রশক্তির সাথেও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইউরোপীয়দের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি কোম্পানির একটি করে নিজস্ব বণিকগোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক মূলধনের কোন অভাব হত না। প্রয়োজনে এদেশীয় বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে তারা প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ ধার করতে পারত। এসময় বাংলায় ইউরোপীয় রাজাদের উপযোগী

অঢেল সুতিবস্ত্র, মসলিন, রেশম এবং বিহারের সোরা পাওয়া যেত। এই পণ্যগুলো গুণগত মানে উন্নত ছিল অথচ দামে ছিল সস্তা। বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর ভাল লাভ হত।

প্রাক পলাশী যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়াত ২৪ লক্ষ টাকা।[১৯] ১৭০৮ থেকে ১৭৫৬ সালের মধ্যে কোম্পানি বাংলাদেশে ৫,১২,৪৮,১৮৪ টাকা দামের সোনারূপা এবং ১,৮২,৭০,৭৪৪ টাকা মূল্যের বাণিজ্য পণ্য এনেছিল। শতকের প্রথম বছরে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮,৯৬,৯৬৮ টাকা। শতকের মধ্যভাগে ১৭৫৫ সনে রপ্তানি বাণিজ্য বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩২,৯২,০৪০ টাকায়। প্রাক পলাশী যুগে ১৭৪২ সনে কোম্পানি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করেছিল। ঐ বছর কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪৪,৮৩,১৬০ টাকা। এ সময় কোম্পানির শেয়ার মালিকরা ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ হারে লভ্যাংশ পেয়েছিল। এ যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মোট এশীয় বাণিজ্যের ৬০ শতাংশ বাংলার সঙ্গে হত। পলাশী উত্তর যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার পর কোম্পানি কয়েকটি রপ্তানি পণ্য – সুতিবস্ত্র, আফিম, রেশম, সোড়া – এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী কোম্পানি বাংলা থেকে রেশম কিনত। এসময় বাণিজ্য পুঁজির অভাব ছিল না, ফলে বিনিয়োগ অনেকখানি বেড়ে যায়। ১৭৬৭ সনে কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০ লক্ষ টাকা। ঠিক দশ বছর পর কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হয় এক কোটি টাকা। পরবর্তী সময়ে ১৭৯১ ও ১৭৯৩ সনে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ালো যথাক্রমে ১,০৬,০০,১০৯ ও ১,০৯,৫৯,১৩০ টাকা।[২০]

কোম্পানি দিওয়ানি প্রাপ্তির পর ১৭৬৫ সাল হতে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের সুতায় তৈরি বস্ত্র সামগ্রীর রপ্তানি বিশ্বজোড়া উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার কুটির শিল্পের সুনাম ছিল বিশ্বব্যাপী। বাংলার অর্থনীতির উপর বস্ত্র শিল্পের প্রভাব ছিল অসামান্য। বস্ত্র শিল্পই আঠারো শতকে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে প্রধান

স্থানাধিকারি। এ যুগে বাংলার অর্থনীতিতে বস্ত্র শিল্পের প্রভাব অসামান্য। বাংলা যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করত তাতে তার জনগণের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রচুর উদ্বৃত্ত হত। উদ্বৃত্ত বস্ত্রের সমস্তটাই বিদেশে রপ্তানি করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশে বাংলার বস্ত্রের চাহিদা এ দেশে বস্ত্র শিল্পের অসাধারণ উন্নতির ইঙ্গিত।[২১] জেমস টেইলরের মতে, বাজার প্রসারতার কারণে এ শিল্পে বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল।[২২] অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হেনরি পেট্টুলো মন্তব্য করেছিলেন যে, " বস্ত্রশিল্পে বিশ্বের অন্য কোন দেশ বাংলার সমকক্ষ হতে পারবে না "।[২৩]

প্রাক পলাশী যুগে বাংলার তাঁতিরা ছিল দরিদ্র, পরিশ্রমী, দক্ষ এবং তুলনামূলক স্বাধীন। সেসময় তাদের উপর নিপীড়ন হত না এমনটা বলা না গেলেও এটা নিশ্চিত যে একচেটিয়া কোন ব্যাপার ছিল না।[২৪] কিন্তু কোম্পানি সরকার পলাশী পরবর্তী যুগে শীঘ্রই ভূমিনীতির মত তাদের ব্যবসায় রীতি পদ্ধতিতেও যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করেন। এর কারণ ছিল ১৮১৩ সনের মধ্যেই ইংল্যান্ডের শিল্পীয় মূলধন ব্যবসায়ী মূলধনকে বিতাড়িত করে ইংল্যান্ডের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বিস্তার করে। এই সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্প দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠে এবং এর অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ বস্ত্র শিল্পের মালিক শ্রেণিই দ্রুত গতিতে গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধার রূপে দেখা দেয়। ব্রিটেনের সামাজিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রেও দ্রুত আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অধিকৃত ভারতবর্ষ দ্রুত 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির' শোষণের পরিবর্তে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পপতিগণের শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এর ফলে ব্রিটেনের বাজারে আর ভারতীয় তাঁতবস্ত্রের চাহিদা থাকল না। ফলে ১৮৫৮ সালের দিকে ব্রিটেনের বাজার এবং পরবর্তীতে ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকার বাজার সমূহে বাংলার বস্ত্র সামগ্রীর বাজার বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় থেকেই ব্রিটেনের সুতা ও কাপড় ভারতের বাজার এককভাবে দখল করতে শুরু করে। কারণ ইংল্যান্ডের নতুন যন্ত্র তখন ভারতের তাঁত অপেক্ষা বহুগুণ অধিক পরিমাণ ও স্বল্পমূল্যে বস্ত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে ইংল্যান্ডের শক্তিশালী নতুন যন্ত্রের কাছে ভারতের তাঁত ও চরকার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল। ইংল্যান্ডের নিজস্ব যন্ত্রে প্রস্তুত বস্ত্র তখন কেবল গ্রেট ব্রিটেনের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণে

ও স্বল্পমূল্যে বিদেশে রপ্তানি করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডের নতুন বস্ত্র শিল্পের জন্য তখন প্রয়োজন হল বিদেশের বিশাল বাজার। ফলে এসময় ইংল্যান্ডের মূলধন শ্রেণি "অবাধ বাণিজ্য নীতির" দাবী করতে থাকে।

এই অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রকৃত অর্থ হল যখন অন্য কোন দেশে ইংল্যান্ডের মত শক্তিশালী শিল্প দেখা দেয়নি তখন বিশ্বের বাজারে স্বাধীন ও সমতামূলক প্রতিযোগিতার অধিকার দাবী। স্বাধীন ইউরোপের প্রায় সকল দেশ ব্রিটিশ পণ্যের বিরুদ্ধে উচ্চ হারে রক্ষা শুল্ক বসিয়ে ইংল্যান্ডের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দাবী প্রতিরোধ করে। কিন্তু ব্রিটিশ অধিকৃত বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে ব্রিটিশ পণ্যের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। ইংল্যান্ডের কারখানায় উন্নত যন্ত্রে উৎপন্ন বস্ত্রের অবাধ স্রোতে বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজের তাঁত ও চরকা ধ্বংস হয়ে গেল। অধিকৃত ভারতের উপর ব্রিটিশ শিল্পের এই নতুন আক্রমণ ও এর ধ্বংসকারী ভূমিকা কার্ল মার্ক্সের নিম্নোক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে[২৫] —"বাণিজ্যের সকল চরিত্রই বদলে গেল। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল রপ্তানিকারী দেশ, আর এখন আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তন এত দ্রুত দেখা দিয়েছে যে, এমনকি ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দেই টাকার বিনিময় মূল্য দুই শিলিং ছয় পেন্স হতে হ্রাস পেয়ে দুই শিলিং এ পরিণত হয়েছে। যে ভারতবর্ষ স্মরণাতীতকাল হতে 'সমগ্র বিশ্বের বস্ত্রের কারখানা' বলে খ্যাতি লাভ করেছিল সে ভারতবর্ষ এখন ইংল্যান্ডে উৎপন্ন সুতা ও তুলাজাত দ্রব্যের দ্বারা প্লাবিত হল। এর অনিবার্য পরিণতি হল বিখ্যাত ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের ধ্বংস। ইংল্যান্ডের প্রত্যেকটি বাণিজ্য সংকটের পর পূর্ব ভারতের বাণিজ্য ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণির নিকট ক্রমশ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। কার্যত পূর্ব ভারতই হল তাদের পণ্য বিক্রয়ের সর্বপ্রধান বাজার। ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণি গ্রেট ব্রিটেনের সমাজে যতই অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করতে থাকে, পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলও (অর্থাৎ বিহার ও বঙ্গদেশ) এই বস্ত্রশিল্পের মালিকশ্রেণির নিকট ততই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে ব্রিটিশ বস্ত্র পণ্যের আমদানি ১৮১৪ সালে শতকরা ৬ থেকে ১৮১৮ সালে ২০, ১৮২৮ সালে ৫০ এবং ১৮৩৮ সালে ৬৩ ভাগে উন্নীত হয়।[২৬] তবে কাপড়

রপ্তানি হ্রাস পেয়ে রপ্তানির তালিকায় পরিবর্তন ঘটলেও বাংলাদেশের শস্য, চিনি, নীল ও রেশম জাত কাঁচামাল, তুলা ও আফিম রপ্তানি যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নিচের সারণি থেকে প্রতীয়মান হয়। কলকাতা থেকে রপ্তানি পাঁচ বছরের গড় হিসাব[২৭]

১৮০৮-০৯	থেকে	১৮১২-১৩	টাকা ৩ কোটি ২০ লক্ষ
১৮১৩-১৪	,,	১৮১৭-১৮	টাকা ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ
১৮১৮-১৯	,,	১৮২২-২৩	টাকা ৫ কোটি ১০ লক্ষ
১৮২৩-২৪	,,	১৮২৭-২৮	টাকা ৫ কোটি ০৬ লক্ষ
১৮২৮-২৯	,,	১৮৩২-৩৩	টাকা ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ
১৮৩৩-৩৪	,,	১৮৩৭-৩৮	টাকা ৫ কোটি ২৪ লক্ষ
১৮৩৮-৩৯	,,	১৮৪২-৪৩	টাকা ৭ কোটি ১৫ লক্ষ
১৮৪৩-৪৪	,,	১৮৪৭-৪৮	টাকা ৮ কোটি ৪৯ লক্ষ
১৮৪৮-৪৯	,,	১৮৫২-৫৩	টাকা ১০ কোটি ৪০ লক্ষ
১৮৫৩-৫৪	,,	১৮৫৬-৫৭	টাকা ১০ কোটি ৬৬ লক্ষ

সূত্র - *Parliamentary Papers*, 1852-53, XXVIII, 331; 1857-58.

আঠারো শতকের বেশির ভাগ সময়ে বাংলায় পণ্য আমদানির পরিমাণ রপ্তানির চেয়ে কম ছিল।

উদাহরন স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ১৭৮০-৯০ এর দশকে ইউরোপের সাথে ভারতের যে বাণিজ্য হয়েছিল সেখানে মোট আমদানির পরিমান ছিল ২,৩৯৩,৬১০ পাউন্ড এবং মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭,৩৩১,৫৬৯ পাউন্ড।[২৮] ১৭৯৩ হতে ১৮১২ সালের মধ্যে এই পরিমাণ ছিল মাত্র এক তৃতীয়াংশ। ১৮১৩ এর পরবর্তী সময়ে এই পরিমাণ বেশ বাড়লেও ১৮৪০ এর দশকের আগে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের উপর যায়নি। ১৮১৭ হতে ১৮১৯ সালের মধ্যবর্তী

সময়ে প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধির পর ১৮৪০ এর দশকের আগে আর কোন লক্ষণীয় পরিমাণ আমদানি বৃদ্ধি পায়নি।

বাংলায় কৃষি পণ্য হিসেবে ধানই ছিল প্রধান এছাড়াও খাদ্য শস্যের মধ্যে গোল আলুর সংযোজন ছিল। কোম্পানি আমলে বিদেশের চাহিদায় সাড়া দিয়ে বেশ কিছু বাণিজ্যিক ফসলের সম্প্রসারণ ঘটে। যেমন – ইক্ষু, কাঁচা রেশম, নীল। বিশ্বে চিনির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ব্রিটিশ কারখানাগুলোর চাহিদা অনুসারে কোম্পানি বাংলাদেশে প্রচলিত রেশম চাষে পরিবর্তন আনে এবং ১৮৩২ সাল পর্যন্ত এদেশে রেশম চাষের প্রভূত প্রসার ঘটায়। ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি অভিনব কৃষি হল নীল চাষ। নীল সরবরাহের জন্য কোম্পানি ১৭৭৯ সালে কলকাতায় বসবাসকারী প্রিনসেফ নামক এক ব্যবসায়ীর সাথে চুক্তি করে। সে সময় থেকে ইউরোপীয়রা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং নীলকুঠি স্থাপন করে। দুই দশকের মধ্যে বাংলার সর্বত্র নীলকুঠি নির্মিত হয়। ১৭৯০ এর দশক থেকে বাণিজ্যিক হারে নীল চাষ ও নীল প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু হয় এবং তা ১৮৪০ এর দশকে সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌছে। নীল উৎপাদন সর্বোচ্চ মাত্রায় উঠে ১৮৪৭ সালে।[২৯] এদেশে উৎপাদিত নীল ছিল ব্রিটিশ টেক্সটাইল শিল্পের জন্য একটি মৌলিক কাঁচামাল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পূর্ববঙ্গে পাঁটচাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮০৪ সাল থেকেই কলকাতা বন্দর দিয়ে এর রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।[৩০] উনিশ শতকের বাংলার কৃষিকে কোন কোন দিক থেকে ধনতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করা যায়। এর কারণ হল বাজারের জন্য কৃষকদের শস্য উৎপাদন প্রক্রিয়া শস্য ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত ঋণের উপরেই মূলত নির্ভরশীল ছিল। এছাড়া ধনী প্রতিবেশীরাও তাদের ঋণ সরবরাহ করত। উদাহরণস্বরূপ – আখ উৎপাদন নির্ভর করত চিনি ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত ঋণের উপর। মালবেরী চাষের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আগাম প্রদান করত। নীল কারখানার মালিকরা নীল উৎপাদনের জন্য চাষিদের আগাম প্রদান করত।

ব্রিটিশদের বাংলার বাণিজ্যে ও শিল্প উৎপাদনে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তাঁতি ও বিভিন্ন শিল্পের কারিগরদের উপর যে অত্যাচার ও শোষণ শুরু হয় তার বিপরীত স্রোতে

দাড়িয়ে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার তাঁতিদের স্বার্থরক্ষা মূলক অনেকগুলো ব্যবস্থা নেন বটে কিন্তু ব্রিটিশ স্বার্থকে পরাস্ত করতে পারেননি। কোম্পানির কর্মচারীরা উঁচু মানের কাপড়ের নিচু দাম ধার্য করে তাঁতিদের ফাঁকি দিতে থাকে। কোম্পানি 'অগ্রিম ব্যবস্থার' আওতায় বস্ত্র বিক্রয়ে তাঁতিদেরকে বাজার দর থেকে ১৫-৪০ শতাংশ কম দাম নিতে বাধ্য করত।[৩১] 'অগ্রিম' বা 'দাদনী' গ্রহণে কেউ অস্বীকার করলে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার নেমে আসত।[৩২] ইংরেজ কর্মচারী কন্টরেল ১৭৭৪ খ্রি. এ ধরণের প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ঢাকার তাঁতিদের নিকট থেকে ৬৯,৮৩০ টাকা আয় করেন।[৩৩] ১৭৭৫ খ্রি. সোনারগাঁয়ের তাঁতিরা এরূপ অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া ইংরেজরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে, বাংলার বস্ত্রশিল্পে প্রতিযোগিতামূলক বাজারও সৃষ্টি করতে দেয়নি। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল অষ্টাদশ শতকের শেষে বিভিন্ন স্থানে তাঁতিদের সংখ্যা হ্রাস এবং বস্ত্র শিল্পের ধ্বংস সাধন। ১৭৭৪ খ্রি. ঢাকার তাঁতিবাড়ীতে ছিল ৯০০ ঘর তাঁতি। কিন্তু ১৭৮৮ খ্রি. এদের সংখ্যা কমে দাঁড়ালো ৫০০ ঘরে।[৩৪] সুতরাং যে হস্তচালিত তাঁত ও তকলি বাংলায় নিয়মিতভাবে অসংখ্য সুতা কাটুনি ও তাঁতি সৃষ্টি করত বণিক সরকার তা ভেঙ্গে ফেললো নিজেদের স্বার্থে, স্বদেশের প্রয়োজনে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই বাংলার বস্ত্রশিল্প এবং কৃষক তাঁতিদের নিজস্ব স্বাধীন উপজীবিকাটি ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যবসায়ী মূলধনের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে পড়ে। প্রায় একই ধরনের ঘটনার মত লবণ উৎপাদনকারীদের জীবনও সংকুচিত হতে শুরু করে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধের আগে থেকেই ইউরোপীয় বণিকরা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মাধ্যমে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যে সকল পণ্যের (লবণ, আফিম, তামাক, সুপারি) ব্যবসা করত তার মধ্যে অন্যতম ছিল লবণ। শুরু থেকেই এদেশের রাজশক্তির সাথে লবণের ব্যবসায় নিয়ে ইউরোপীয়দের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। কারণ এ ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। পরবর্তীকালে ১৮৫০ এর দশকে বস্ত্রশিল্পের মতই ব্রিটেন থেকে আমদানিকৃত লবণ বাংলাদেশের অর্ধেক বাজার দখল করে ফেলেছিল।

১৮৫৮ পরবর্তী সময়ে বাংলা তথা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায় এবং ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত এই বাণিজ্যিক উন্নতির ধারা অব্যাহত ছিল। নিম্নের একটি ছকে ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের (১৮৪২-১৯৪৮) চিত্র দেয়া হল[৩৫]–

বছর	মোট বাণিজ্য (কোটি টাকায়)	বছর	মোট বাণিজ্য (কোটি টাকায়)
১৮৪২	২৪.৮১	১৯১২	৪৮৫.৩১
১৮৫২	৩৮.৪২	১৯২১	৫৮১.৬২
১৮৬২	৯২.১১	১৯২৮	৬৪৬.১৯
১৮৭২	৯২.৯৭	১৯২৯	৬০১.৬৭
১৮৮২	১৫০.০৭	১৯৩৭	৩৬২.৯৯
১৮৯১	১৯৫.৬১	১৯৪০	৩৫৫.৬৬
১৯০১	২৪৫.৭০	১৯৪৮	৪২৫.০০

সূত্র - Moral & Material Progress Report, 1882-3.

এ বাণিজ্যের একটি বৈশিষ্ট্য হল আমদানি কম, রপ্তানি বেশি। মনে হয় সারা দেশে রেলপথ স্থাপন, সুয়েজ খাল উদ্বোধনের পর ইউরোপের সাথে জলপথে দূরত্ব হ্রাস, অভ্যন্তরীণ শুল্কের বিলুপ্তি এবং আমদানি-রপ্তানি শুল্ক হ্রাস এ বাণিজ্যের উন্নতির কারণ। এসময় চাল ছাড়া আর সকল রপ্তানি পণ্যের উপর শুল্ক তুলে দেয়া হয়। অন্যদিকে আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, মদ, লবণ, আফিম ইত্যাদি কিছু পণ্য শুল্কমুক্ত হয়নি। পূর্ব ভারতে কলকাতা ছিল ব্রিটিশ পুঁজির সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ ক্ষেত্র। সারা এশিয়ায় লগ্নিকৃত ব্রিটিশ পুঁজির ৬০ শতাংশ ছিল বাংলাদেশে আর কলকাতা ছিল পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র। সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেনের রপ্তানি পণ্য কলকাতার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হত। তবে বিশ্বব্যাপী মন্দার দরুন (১৯৩০-৩১ খ্রি.) বৈদেশিক বাণিজ্যে অবনতি দেখা দিলে এসময় ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। কারণ এসময় বিদেশী পুঁজিপতিরা ভারত থেকে তাদের মূলধন সরিয়ে নিতে শুরু করে। ফলে এসময় এদেশীয়

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজি বাংলার শিল্পে লগ্নি শুরু হয়। এসময় বাংলার পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বস্ত্রশিল্পে ভারতীয় পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটে। অবশ্য এসব পুঁজির বেশিরভাগই ছিল মাড়োয়ারি পুঁজিপতিদের।

বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতির দেশ থেকে আগত বণিক সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে বাংলার অর্থনীতিতে পরিবর্তন সূচিত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।[৩৬] ১৭৬৫ হতে ১৮৫৮ পর্যন্ত বাংলায় শাসন পরিচালিত হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে। এরপর শাসন চলে যায় ব্রিটিশ রাজের নামে।

বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানির বাণিজ্যের উপযোগী বিশাল ও উন্নত বাজার ছিল। বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এ বাজার গড়ে উঠেছিল। এসময় জল ও স্থলপথে অর্থাৎ নৌকা, বলদ ও ঘোড়ার গাড়িতে করে পণ্য আনা নেয়া করা হত। বড় বড় আড়তদার, গোলাদার, দালাল, পাইকার থেকে শুরু করে ছোট ছোট ফড়িয়া, বেপারি, দোকানদার ও ব্যবসায়ী বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। এসময় বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের বাজার ছিল দুই ধরনের, যথা – স্থানীয় ও আমদানি-রপ্তানি। বিদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের যেমন – সূতীবস্ত্র, রেশম, রেশমবস্ত্র, সোরা, আফিম, নীল ইত্যাদি কেনা বেচার জন্য আলাদা বাজার ছিল। অভ্যন্তরীণ ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য চাল, ডাল, তেল, ঘি, লবণ, পান, সুপারি, তামাক, চুন, লঙ্কা ইত্যাদির আলাদা বাজার ছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো বাংলার রপ্তানি পণ্য কিনত, আমদানি পণ্য বিক্রি করত। কোম্পানির কর্মচারীরা আমদানি-রপ্তানি পণ্য ছাড়াও অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোগ্যপণ্য বেচা কেনায় অংশ নিত। এজন্য তাদের দালাল, পাইকার, গোমস্তা, সরকার, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ানদের দরকার হত। এই কর্মযজ্ঞের সাথে শুধু বাঙালি হিন্দুরাই জড়িত হয়। এসময় স্বাধীন অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছিল তাদের নিম্ন থেকে মধ্য এবং মধ্য থেকে উচ্চ শ্রেণিতে উন্নতির পথে আর কোন বাঁধা ছিল না।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিককার কোম্পানির কাগজপত্রে বাণিজ্য সহায়ক এদেশীয়দের যে নামের তালিকা পাওয়া যায় তাতে বাঙালি হিন্দুদের প্রাধান্যই এটা প্রমাণ করে। ১৭৩৬-৪৬ সালের মধ্যে কলকাতায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পণ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল ৫২ জন হিন্দু বণিক। ১৭৩৯ সালে কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির ২৫ জন বণিকের সকলেই হিন্দু। শুধু ঢাকার ক্ষেত্রে দেখা যায় ১২ জন দাদনি বণিকের মধ্যে ১০ জন হিন্দু। কোম্পানির সব গোমস্তা বা কর্মচারী ছিল হিন্দু। ১৭৫৮ সালে কলকাতায় কোম্পানির এদেশীয় কমিশনারদের দু-তিনজন বাদে আর সকলেই ছিলেন হিন্দু।[৩৭] ফলে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যে বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্ত বাংলায় গড়ে উঠে তাদের বেশির ভাগ ছিল বাঙালি হিন্দু। ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে পশ্চিমী শ্বেতকায়দের সঙ্গে এদেশীয় মুসলমানদের সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। রাজশক্তির অহমিকা মুসলমানদের গ্রাস করেছিল। অপরদিকে মুসলমানদের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও লেনদেন বিরোধ তাদের সামগ্রিক বাণিজ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে ভেবে ইউরোপীয়রাও মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

বাংলাদেশে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এদেশে বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্তের বিকাশ দ্রুত হতে থাকে। অবশ্য কোম্পানির প্রশাসনিক নীতিও এক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়ক হয়। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী কলকাতায় সারা ভারতের রাজধানী স্থাপিত হয়। কলকাতা হয়ে ওঠে পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। নবোদ্ভূত ক্ষমতার কেন্দ্রভূমি কলকাতায় হিন্দুরা আঠার শতকের প্রথম দিক থেকেই বিপুল সংখ্যায় এসে বসতি শুরু করে এবং এ প্রক্রিয়া ব্রিটিশদের ক্ষমতা দখলের সাথে সাথে আরও জোরদার হয়।[৩৮] এসময় কলকাতায় অনেকগুলো এজেন্সি হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৭ সালের মধ্যেই কলকাতায় প্রায় ১৯ টি এজেন্সি হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ককারেল, ট্রেল এন্ড কোং, ফেয়ারলি, গিলমোর এন্ড কোং, ল্যাম্বার্ট, রস এন্ড কোং, বার্বার, পামার এন্ড কোং, কলভিন্স এন্ড বাজেট, ডাউনি এন্ড মেইটল্যান্ড, ভিয়ালার্স এন্ড কোং, গ্রিলার্ড এন্ড কোং ইত্যাদি।[৩৯] এই এজেন্সি হাউসগুলো ছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যের হৃদপিণ্ড। এরা ব্যাঙ্কিং, কমিশনে ব্যবসা, জাহাজ পরিবহন ও বাণিজ্য বীমার কাজ করত। এদের সহযোগী হলেন বাঙালি বণিকেরা।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার বাণিজ্যে এই ইউরোপীয়দের ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটায় এদেশীয় বণিকদের স্বার্থ ও সমৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তথাপি এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই ইউরোপীয় বাণিজ্যকে আশ্রয় করেই এদেশে এক নতুন বাণিজ্যভিত্তিক মধ্যবিত্তের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কোম্পানির সরকারি বাণিজ্য ও কর্মচারীদের বেসরকারি বাণিজ্য যত বেশি প্রসারিত হল ততই এদেশের বাণিজ্য সহযোগীগোষ্ঠী লাভবান হল। এর কারণ ছিল, বিদেশী ইউরোপীয়রা এদেশের বাজার, রীতিনীতি, ভাষা, লেনদেন, নিয়মকানুন কিছুই জানত বা বুঝত না। এছাড়া অনেক সময় এদের মূলধনের অভাব হত। আবার অনেকে নিঃসম্বল অবস্থায় এদেশে বাণিজ্য করতে আসত। ফলে এদেশীয়দের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তাদের পক্ষে এদেশে আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। এদেশীয় দালাল, পাইকার, গোমস্তা, সরকার, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ানরা ইউরোপীয়দের টাকা ধার দিত। রপ্তানি পণ্য কিনে দিত। এছাড়া আমদানি পণ্য বিক্রি করা, হিসাব রাখা, গৃহস্থালির কাজও তাদের দিয়ে করানো হত। এক কথায় এদেশীয় দালাল, পাইকার, গোমস্তা, সরকার, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ানরা ছিল ইউরোপীয়দের 'ফ্রেন্ড, ফিলজফার এ্যান্ড গাইড'।[৪০] কোম্পানির সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেলের হিসাব অনুযায়ী, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় শুধু দোভাষীর সংখ্যাই ছিল এক হাজার। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের অভ্যন্তরে ইউরোপীয়দের অবাধ প্রবেশ ও বসবাস পছন্দ করত না। অইংরেজ কোন ইউরোপীয়, স্বাধীন বণিক ও পর্তুগীজদের দেশের অভ্যন্তরে বসবাসের অনুমতি দেয়া হত না। এদের বাঙালি ছাড়া আর কোন ভারতীয়দের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগের অনুমতিও দেয়া হত না। কোম্পানির এই নীতি বাঙালি মধ্যবিত্তের সামনে এক বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। পরবর্তীতে ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইনে এই নীতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া হয়। কোম্পানির কর্মচারীদের প্রেসিডেন্সি শহরের ১০ মাইলের বাইরে যেতে দেয়া হত না।

কোম্পানি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা নিজ হাতে নেয়ার পর বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের অশান্তি ও অরাজকতা অনেকখানি দূর করতে সক্ষম হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেই সময়কার একজন কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টসের (১৭৩৯-১৮০৮ খ্রি.) সাক্ষ্য থেকে

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্বাণিজ্যে কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'কোম্পানির শাসনের প্রথমদিকে (১৭৬৫-১৭৭২ খ্রি.) বাংলার অন্তর্বাণিজ্যে দেখা দেয় নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচার। কোম্পানির কর্মচারী, তাদের বেনিয়ান ও গোমস্তারা একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাঁতিদের উৎপাদিত বস্ত্রের গুণগত মান, মূল্য ইত্যাদি ধার্য করে দেয়। ইউরোপীয় বণিক ও তাদের এজেন্টরা তাঁতিদের বস্ত্রের সরবরাহ সম্পর্কিত বন্ডে জোর করে স্বাক্ষর আদায় করে নেয়। যদি তাঁতিরা অগ্রিম নিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বস্ত্রাঞ্চলে বন্ড বেঁধে দিয়ে বেত্রাঘাতে তাড়ান হয়। কোম্পানির কর্মচারীদের এজেন্টরা বস্ত্রের বাজার মূল্য অপেক্ষা তাঁতিদের অন্তত ১৫-৪০ শতাংশ কম দেয়।'[৪১] লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস এবং কর্নওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারীদের এই জবরদস্তি অবৈধ বাণিজ্য বহুলাংশে দমন করতে সক্ষম হন। তাদের চেষ্টার ফলে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে শান্তি, স্বাধীনতা, স্থিতিশীলতা ও প্রতিযোগিতা ফিরে আসে। এসময় কলকাতা সন্দেহাতীতভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। আঠার শতকের শেষ দিকে কলকাতায় বসবাসরত ব্যবসায়ীর সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। কলকাতার ব্যবসায়ীরা নিজেরা ব্যবসা করত আবার অনেকে ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করত। এসময় কোম্পানির কর্মচারীদের সঞ্চিত সম্পদে এজেন্সি হাউসগুলো ফুলে ফেঁপে ওঠে। ফলে এদেশীয় বিত্তবানেরাও লাভের আশায় এজেন্সি হাউসগুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করে। এরা বাণিজ্য, ইনস্যুরেন্স, ব্যাঙ্কিং, পরিবহন ছাড়াও কয়েকটি শিল্প ক্ষেত্রে যেমন – নীল, জাহাজ মেরামত ও রেশম আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ করে নতুন ধরনের শিল্প গড়ে তোলে।

বাংলায় বুর্জোয়া শ্রেণির ক্রমবিকাশের ইতিহাস এদেশে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ইতিহাসের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ কার্ল মার্ক্সের ভাষায় 'প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়কালে' বাংলাদেশেও বুর্জোয়া শ্রেণি, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির বিকাশ হয়। শ্রমশিল্পের প্রসারের সাথে সাথে ধীরে ধীরে বণিক, মুৎসুদ্দি, দালাল, জমিব্যবসায়ী থেকে শিল্পোদ্যোগী পুঁজিপতি পর্যন্ত ঔপনিবেশিক বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ হয়েছে। অবশ্য ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণির

একাধিপত্যের জন্য এবং ঔপনিবেশিক শোষণ নীতির কারণে বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণির স্বাভাবিক বিকাশ হয়নি, এমনকি সংখ্যানুপাতে তাদের অর্থনৈতিক সুবিধাও বাড়েনি। তবে উনবিংশ শতাব্দী হতেই বাংলার বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এসময় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অধীন উপনিবেশে শ্রমশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বণিক, মুৎসুদ্দি, দালাল, জমিব্যবসায়ী থেকে শিল্পউদ্যোগী পুঁজিপতি পর্যন্ত ঔপনিবাবুর্জোয়া শ্রেণির বুর্জোয়াশ্রেণির বিকাশ হতে থাকে। বাংলাদেশে তথা সারা ভারতবর্ষে ঠিক এই ধারাতেই পুঁজিপতি শ্রেণি বা বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ হয়েছে। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের আওতায় বাংলার বণিক, মুৎসুদ্দি, দালাল ও শিল্পোদ্যোগী পুঁজিপতিরা ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণিতে পরিণত হয়।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই ইংরেজ কোম্পানি বাংলার কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। এর ফলে ইংল্যান্ডের সাথে এদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কারণ শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বাজারে বাংলার শিল্প পণ্যের (সূতী ও রেশম বস্ত্র) চাহিদা কমে যায়। ফলে কোম্পানি ইংল্যান্ডের শিল্পপণ্য এদেশে বিক্রির জন্য এদেশ থেকে কাঁচামাল – রেশম, চিনি, পাট, নীল, আফিম, তামাক, তৈলবীজ, কার্পাস প্রভৃতি রপ্তানিতে উৎসাহ দেয়। এর ফলে কোম্পানির বিনিময় সমস্যা মিটল, শিল্পপণ্যের চাহিদা তৈরি হল। কোম্পানির এই নতুন বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলার গ্রামে গ্রামে অসংখ্য নীল ও রেশমের কারখানা গড়ে ওঠে। এসব কারখানা পরিচালনার জন্য ইউরোপীয়দের প্রয়োজন হয় এদেশীয় গোমস্তা, সরকার, কনট্রাক্টর, দালাল ও পাইকারদের। এসময় হিন্দুরাই তাদের সহযোগী হিসেবে অগ্রসর হয়ে অগ্রগণ্য গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছিল। এরফলে পরবর্তীতে দেখা যায় বাংলার নব্য মধ্যবিত্তের অধিকাংশই হিন্দু। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালি বণিক ও মহাজনদের মধ্যে নবকৃষ্ণ দেব (শোভাবাজার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা), কৃষ্ণকান্ত নন্দী (কাশিমবাজার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা), মদনমোহন দত্ত (হাটখোলা দত্ত পরিবার) ও রামদুলাল দে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে এদের বংশধররা জমিদারি ক্রয় করে ব্যবসায় বাণিজ্য হতে দূরে সরে আসে। আশুতোষ দে, মতিলাল শীল, মানিকরাম বসু, কাশীশ্বর মিত্র, বনমালী সরকার,

Dhaka University Institutional Repository

গোকুলচন্দ্র মিত্র, শোভারাম বসাক, কমল নয়নচাঁদ মল্লিক ও তার পুত্ররা গৌরচরণ ও নিমাইচরণ, প্রীতিরাম দাস ও তার পুত্র রাজচন্দ্র দাস (রাণী রাসমণির স্বামী) সকলেই ব্যবসায়, দালালি ও পণ্য সরবরাহের ব্যবসা করে বিত্তশালী হন।[৪২] এখানে উল্লেখ্য যে, কোম্পানি, বেসরকারি ব্যবসায়ী এবং পরবর্তীকালের এজেন্সি হাউসের সবাই ভারতীয়দের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করত, যার ফলে এক ধরনের অংশীদারিত্বের উদ্ভব হয়। ইউরোপীয় প্রাইভেট সেক্টর বা বেসরকারি খাত যখন এজেন্সি হাউসে এবং ব্যাংক ব্যবসায় ব্যবহৃত হয়, তখন মুৎসুদ্দি (ইউরোপীয়দের ব্যবসার ব্যবস্থাপক ভারতীয়) এবং অন্যান্য এজেন্ট এবং দালালেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে। কিছু কিছু ভারতীয় আবার সাহস করে এসব ব্যবসায়ে আনুষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব স্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬ খ্রি.) কথা উল্লেখ করা যায়। ১৮৩০ এর দশকে তিনি ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এ পরিবারের নীল, কয়লা এবং চায়ের ব্যবসা ছিল এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের অংশীদারিত্ব ছিল।[৪৩] এসময় কলকাতায় স্থাপিত ইউনিয়ন ব্যাংকের ২০২ শেয়ার হোল্ডারের মধ্যে ৭০ জন ছিল বাঙালি হিন্দু। সওদাগরি অফিসে চাকরি, ব্যাঙ্কের করণিকের পদ, গুদামঘরের পরিচালনায় সর্বত্রই হিন্দুদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

১৮৩৩ সালে সরকার সেভিংস ব্যাঙ্ক স্থাপন করে, যেখানে ৩৪ টি অ্যাসিস্ট্যান্ট এর সবগুলো পদ ছিল বাঙালি হিন্দুদের দখলে। ১৮৩৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের পেটি জুরি তালিকায় প্রাপ্ত ৯৯ জনের মধ্যে ৯৬ জনই ছিলেন বাঙালি হিন্দু। এদের মধ্যে ৫১ জন বেনিয়ান ও সরকার, ২৮ জন রাইটার, ১০ জন জমিদার, ৪ জন করণিক, ৩ জন ব্যাংকার। এরাই ছিলেন উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার বাণিজ্য ও শিল্প জগতের নেতা। নতুন বাণিজ্যিক সংস্থা 'চেম্বার্স অব কমার্স' এর মাধ্যমে এরা নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় অগ্রসর হন।

১৮৩৬ সালে স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ানের সুপারিশ অনুযায়ী অন্তর্বাণিজ্যে শুল্ক তুলে দিয়ে এদেশে বাণিজ্যের উন্নতির পথ আরো প্রশস্ত করা হয়। এসময় বাংলা বিশ্ব বাজারের সাথে যুক্ত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি, রাস্তাঘাটের উন্নতি, আইনের শাসন, সম্পত্তি ভোগের নিরাপদ ও নিশ্চিত অধিকার বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারকে বাড়তি উৎসাহ যোগায়। এ

Dhaka University Institutional Repository

যুগে কলকাতার নব্যধনীরা এজেন্সি হাউসগুলোতে নিজেদের টাকা সুদে খাটায় এবং অনেক উদ্যোগী বাঙালি ইউরোপীয়দের সঙ্গে একযোগে যৌথ বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহ দেখান। এসময়কার বাংলায় ইন্দো-ব্রিটিশ যৌথ উদ্যোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল – 'কার, টেগোর এ্যান্ড কোং', 'কার, তারেক এ্যান্ড কোং' এবং 'কেলসাল, ঘোষ এ্যান্ড কোং'।[৪৪] দ্বারকানাথ ঠাকুর ও তার কোম্পানি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, নীলের কারবার, জাহাজ মেরামতি, বাষ্পচালিত জাহাজে পরিবহন, সংবাদপত্র ও কয়লা খনি পরিচালনা করেন। বি. বি. ক্লিঙের মতে, দ্বারকানাথ ম্যানেজিং এজেন্সি সিস্টেমও চালু করেন।[৪৫] কমিশন এজেন্ট হিসেবে ব্যবসা বাণিজ্য ও পরিবহনের কাজ পরিচালনা ছিল এ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। কার, তারেক এ্যান্ড কোং ও কেলসাল, ঘোষ এ্যান্ড কোং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, নীলের কারবার ও ব্যাংকিং কাজকর্মে নিযুক্ত ছিল।

উনিশ শতকের তিরিশের দশকে কলকাতার এজেন্সি হাউসগুলোর পতন ঘটলে দেখা গেল ইউরোপীয় অংশীদাররা নিজেদের শেয়ার বা লভ্যাংশ তুলে নিয়ে সাগর পাড়ি দেয় এবং পরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এদেশের সদ্যোজাত বাণিজ্যিক ও শিল্পগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত বণিকরা। বহু বাঙালি বণিক পরিবার এসময় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে ইউরোপীয় ও বাঙালি বণিকদের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের মনোভাব গড়ে ওঠে। ১৮৪৭ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর থেকে বাংলায় ইন্দো-ব্রিটিশ যৌথ উদ্যোগ পর্ব শেষ হয়। কারণ এ সময় থেকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবোত্তর পুঁজিবাদ ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ফলে এদেশীয়দের সহযোগিতা ইউরোপীয়দের আর প্রয়োজন হয়নি। একারণে দেখা যায় পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীলকমল সেন বা এম. এম. বসাক প্রমুখ ইন্দো-ব্রিটিশ যৌথ উদ্যোগের অংশীদারেরা এ ধরনের ব্যবসা থেকে সরে আসেন। উনিশ শতকের শেষে একমাত্র স্যার আর. এন. মুখার্জী কোম্পানির অংশীদার হিসেবে টিকে ছিলেন।

বিশ শতকের প্রথম দশকে ভারতের অন্যান্য প্রেসিডেন্সি অপেক্ষা বাংলায় রপ্তানি উদ্বৃত্ত ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে বাংলার কৃষিজ পণ্য প্রচুর পরিমাণে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য দেশে পাঠানোর ফলে এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদেশিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এই বিশাল পরিমাণ রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ ও গুদামজাত করা এবং আমদানি পণ্য বিক্রি করার জন্য বহু সংখ্যক বেনিয়ান, গোমস্তা, সরকার, পাইকার, দালাল, বেপারি ও আড়তদারের প্রয়োজন হত। সুতরাং বলা যায় যে, এই বিশাল বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য কলকাতা ও বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার এদেশে প্রযুক্তিবিদ, কারিগর তৈরির দিকে মনোযোগ না দেয়ায় স্বল্পসংখ্যক বাঙালিরা করণিক, জুনিয়র সুপারভাইজার ও ফোরম্যান হিসেবে শিল্পে নিয়োগ পেত। ফলে এ বিষয়ে বাঙালিদের মধ্যে প্রবল হতাশা তৈরি হয়। এসময় বাংলা সরকার এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশা দূর করার জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। বাংলার জমিদার, দেশপ্রেমিক ও মিশনারীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'টেকনিক্যাল স্কুল' স্থাপন করে এদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে শিল্প কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলনের নীতি গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে সরকার এসব প্রতিষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও অনুদান প্রদান করে।

অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে (১৯০৫-১৯১১ খ্রি.) এদেশীয় বুদ্ধিজীবী ও দেশবরেণ্য নেতারা শিল্প স্থাপন ও প্রসারে এগিয়ে আসেন। এসময় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বাংলায় নতুন নতুন কিছু শিল্প গড়েও উঠেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় শিল্প পরিবেশ ও মানসিকতা তৈরি করে দেশের বেকারত্ব দূর করা ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণের পথ রোধ করা। তবে বাঙালির এই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানগুলো বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। এর কারণ হল প্রথমত, পুঁজির অভাব ছিল। বাঙালি পুঁজিপতিরা যথেষ্ট মূলধন লগ্নি করেনি। দ্বিতীয়ত, শিল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। শিল্প কারখানার বিলম্বিত ও দুর্বল বিকাশের জন্যই বাংলায় শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্তের বিকাশ ব্যাহত ও বিলম্বিত হয়। বাংলায় আধুনিক শিল্প আশানুরূপভাবে গড়ে না ওঠার পেছনে ব্রিটিশ সরকারের নীতিও অনেকাংশে দায়ী ছিল। তারা শিল্প স্থাপনে বাঙালিদের কখনোই উৎসাহ দেয়নি। বরং ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ছিল এ দেশীয় শিল্পোদ্যোগের বিরোধী। আবার কৃষি ও শিল্পের সাথে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ বাঙালি মধ্যবিত্ত এসময় বাণিজ্যিক এজেন্ট বা দালাল হিসেবেই থেকে যায়। তাদের মধ্য থেকে কেউ শিল্পের মালিক, কারখানার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক বা তত্ত্বাবধায়ক হতে পারেনি।

এসময় শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখার সুযোগ ছিল সেই জমিদার ও মহাজনশ্রেণি এসময় শিল্প কারখানা সৃষ্টিতে এগিয়ে আসেনি। ফলে এই বাঙালি মধ্যবিত্ত, যারা 'নয়া বাঙলার রূপকার', তারা শিল্প, বাণিজ্যের প্রতি বিরূপ ছিলেন এ কথা বলা যায়। পাশাপাশি এটাও বলা যায় যে, এ মধ্যবিত্ত পছন্দ করত বাঁধা বেতনের চাকরি ও স্বাধীন পেশা – ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি। বাংলার বণিক ও ব্যাংকিং গোষ্ঠীগুলো শিল্পের চেয়ে বাণিজ্য ও ব্যাংকিং বেশি পছন্দ করত। কারণ শিল্পের তুলনায় ব্যবসা বাণিজ্যে দ্রুত লাভ ও উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। এসময় বাংলায় জমিতে বিনিয়োগ করা ছিল বেশি লাভজনক ও নিরাপদ। অবশ্য সকলের পক্ষে জমিদারি কেনা সম্ভব হয়নি, তবে অনেকেই মধ্যস্বত্ব কিনেছিলেন। উনিশ শতকের বাণিজ্যিক ফাটকাবাজি, এজেন্সি হাউসগুলোর পতন এবং ইন্দো-ব্রিটিশ যৌথ প্রয়াসের ব্যর্থতা এমন শিল্প বিমুখতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।[৪৬] ১৯৩২-৩৩ সালের বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশনের বার্ষিক রিপোর্টে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে বেকারত্বের সমস্যা সম্পর্কে তুলে ধরা হয়। এসময় সরকার 'আনএমপ্লয়মেন্ট রিলিফ স্কীম' চালু করে শিক্ষিত বেকার মধ্যবিত্তদের স্বনির্ভর করে তোলার পদক্ষেপ নেয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের স্বনির্ভর করে তোলাই ছিল এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে সামগ্রিকভাবে শিল্প ক্ষেত্রে বাঙালির অনগ্রসরতা থেকে যায়।

বিশ শতকের গোঁড়ার দিকে বাংলার বাণিজ্য ও শিল্পজগৎ থেকে এদেশীয়রা ক্রমাগত পিছু হটে যেতে থাকেন। এদেশের চিরায়ত বাণিজ্য ও ব্যাংকিং সম্প্রদায়গুলো (সাহা, লালা, বসাক, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি) বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে পারেনি। এর কারণ এসময় বাংলার অন্তর্বাণিজ্যে অবাঙ্গালি বণিক গোষ্ঠী যেমন মাড়োয়ারি, গুজরাটি, আর্মেনিয়ান, চিনা, বর্মী, বোহরা, খোজা সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে চলেছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতকের শুরুতে কিছু বাঙালি প্রতিষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

যেমন লাহা এন্ড কোং, শিবকৃষ্ণ এন্ড কোং, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। তখন অনেক বাঙালি বণিক ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সি পরিচালিত কোম্পানিগুলোর মুৎসুদ্দি বা এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। তবে অল্পদিনের মধ্যেই মাড়োয়ারি বণিকরা বাঙালিদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের স্থান পাকাপোক্ত করে নেয়।

শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙালির এই অনগ্রসরতা বাংলার বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিকদের প্রচণ্ড হৃদয় বেদনার কারণ হয়েছিল। তবে একথা বলা যায় যে, বাংলার বণিকদের একাংশের এদেশে অন্তর্বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর সঙ্গে বাণিজ্যগোষ্ঠীর লোকেরা যুক্ত ছিলেন। এদের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়েছিল একথা সত্য তবে বাংলার বাণিজ্য ও ব্যাংকিং থেকে তারা একেবারে যে অপসারিত হননি একথাও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তথ্য নির্দেশ

১। মুসা আনসারী, *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.১৩৭

২। সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো (১৭৫৭-১৮৫৭)*, চয়নিকা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.৯

৩। Susil Chaudhuri, *Trade and Commercial Organization in Bengal (1650-1720)*, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta, September 1975, p.25

৪। এম. ওয়াজেদ আলী, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০০, পৃ.১১

৫। সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০

৬। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৪

৭। W.K.Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of "The Fifth Report"*, Indian Studies Series, 1962, p.78-81

৮। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৪

৯। P.J. Marshall, *East Indian Fortunes: The British in Bengal in the Eighteenth Century*, Oxford, Clarendon Press, 1976, p.18

১০। Sukumar Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal*, Luzac & Company, Ltd. London, 1954, p.28

Dhaka University Institutional Repository

১১। Sukumar Bhattacharya, *op.cit.*, p.188

১২। Sukumar Bhattacharya, *op.cit.*, p.188

১৩। এম. ওয়াজেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২

১৪। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)*, কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৫৮, পৃ.৮৪

১৫। এম. ওয়াজেদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩

১৬। Harry Verelst, *A View of the Rise, Progress, and Present State of the English Government in Bengal*, London, 1772. (উদ্ধৃত), বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৪০২ (বঙ্গাব্দ), পৃ.২১-২২

১৭। Percival Spear, *The Oxford History of Modern India (1740-1975)*, Oxford University Press, Delhi, 1978, p.59

১৮। বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪

১৯। K. N. Chaudhuri, *The Economic Development of India Under the East India Company 1814-1858*, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, p.509-510

২০। N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. I, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1956, p.17

২১। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৮-৬৯

Dhaka University Institutional Repository

২২। James Taylor, *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca*, Military Orphan Press, Calcutta, 1840, p.364

২৩। Nurul H. Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2001, p.31 (উদ্ধৃত), আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)*, বাংলা একাডেমী, ২০১২, পৃ.৬০

২৪। N.K. Sinha, *op.cit.*, p.169

২৫। Karl Marx, The East India Company (article, New York Tribune, 1853). (উদ্ধৃত), সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুক ওয়ার্ল্ড, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ.১৩২-১৩৩

২৬। D.A. Farnie, *The English Cotton Industry and the World Market*, 1815-96 (Oxford 1979), 98, 116-17 (quoted in), P.J. Marshall, "General Economic Conditions Under the East India Company", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971)*, Vol-II (Economic History), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p.73

২৭। India Office Records, *Bengal Commercial Reports*, 174, 24; *Parliamentary Papers*, 1852-53, XXVIII, 331; 1857-58, XLII, 144-45. (quoted in), P.J. Marshall, "General Economic Conditions Under the East India Company", *op.cit.*, p.72

২৮। K.N. Chaudhuri, "Foreign Trade and Balance of Payments (1757-1947)", *The Cambridge Economic History of India*, V-2,

Dhaka University Institutional Repository

Dharma Kumar (ed.), Firma K.L. Mukhopadhyay, Kolkata, 1960, p.817

২৯। P.J. Marshall, "General Economic Conditions Under the East India Company", *op.cit.*, p.75

৩০। Hem C. Kerr, *Report on the Cultivation of, and Trade in, Jute in Bengal and on Indian Fibres*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1874, p.71

৩১। William Bolts, *Consideration on India Affairs*, London, 1772, p.193

৩২। William Bolts, *op.cit*., p.194

৩৩। N.K. Sinha, *op.cit*., p.160

৩৪। N.K. Sinha, *op.cit*., p.156

৩৫। Moral & Material Progress Report, 1882-3, p.215 & Statistical Abstract, quoted in B. B. Misra, *The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times*, Oxford University Press, New Delhi, 1960, p.216-217

৩৬। P.J. Marshall, "General Economic Conditions Under the East India Company", *op.cit.*, p.70

৩৭। A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856*, Bangla Academy, Dhaka, June 1977, p.70-71

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। Sharif Uddin Ahmed, "Urbanisation and Urban Classes", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971)*, Vol-III (Social and Cultural History), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p.179

৩৯। বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৫৪

৪০। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ.২৩

৪১। William Bolts, *op.cit.*, p.193

৪২। রাধারমণ মিত্র, *কলকাতা দর্পণ*, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ.২৮০, ৩০৯-৩১০। (উদ্ধৃত), সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪

৪৩। B.B. Kling, *Partner in Empire*. quoted in P.J. Marshall, "General Economic Conditions Under the East India Company", *op.cit.*, p.80

৪৪। বারিদবরণ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, জীবন ও সাধনা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ.১৭ (উদ্ধৃত), সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫

৪৫। B.B. Kling, *Partner in Empire*, Kolkata, 1981, p. 204

৪৬। Amiya Kumar Bagchi, *Reflections on Patterns of Regional Growth in India During the Period of British Rule*, Kolkata, 1976. (উদ্ধৃত), সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রিটিশ শিক্ষানীতি এবং বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির রূপরেখা

একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের কার্যক্রম শুরু করলেও ক্রমান্বয়ে তা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। কোম্পানি এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করে যা ভারতের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। প্রথমদিকে কোম্পানি তার শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কার করলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় ৫০ বছর পর কতগুলো বাস্তব প্রয়োজনে কোম্পানি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করে।

আঠারো শতকের রাজনৈতিক পালাবদলের প্রক্রিয়ায় সার্বিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল গোটা বাংলায়। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতবদলের অভিঘাতে ভেঙ্গে পড়েছিল এদেশে বিদ্যমান পুরনো ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো। জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, ফলে জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতার চর্চা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল উপযুক্ত আনুকূল্যের অভাব। স্মরণাতীত কাল থেকেই এদেশের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা সমাজের উচ্চবিত্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সহৃদয় পৃষ্টপোষকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। কোম্পানি যখন বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন এ অঞ্চলে এক প্রকারের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তবে এসময় ভারতীয় সমাজ যেহেতু অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিম্নস্তরে ছিল, তাই অর্জিত ও সঞ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিমাণ ছিল কম। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় আবদ্ধ ছিল নিজ নিজ সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার গতানুগতিক গণ্ডিতে। এসময় গড়ে প্রতিটি গ্রামেই একটি করে পাঠশালা ছিল। সেখানে গুরু মহাশয় ছাত্রকে মাতৃভাষায় অক্ষর পরিচয় ও বাক্য পঠন, বাক্য রচনা, প্রাথমিক গণিত ও কিছু শাস্ত্রের কাহিনী শিক্ষা দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম ছাত্ররা মক্তবে ফার্সি ও কোরআন পাঠ শিক্ষা করত। এখানে প্রাথমিকভাবে সাধারণ মানের শিক্ষা দেয়া হত। দেশীয় ভাষাকে অবজ্ঞা করা হত এবং বাস্তব অর্থে কোন প্রায়োগিক শিক্ষা তারা পেত না।[১] অন্যদিকে, প্রাক ব্রিটিশ ভারতে একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ধর্মীয় মতবাদ প্রচার, পুরোহিত হিসেবে তদারকি ও শিক্ষক হিসেবে কাজ করার একচেটিয়া অধিকার ছিল। তাদেরই একমাত্র উচ্চতর ধর্মীয় ও বিষয় অধ্যয়নের সুযোগ ছিল। অন্য জাতের লোকেদের জন্য সর্বপ্রকার উচ্চতর শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণেরা সেই উদ্দেশ্যে নির্মিত বিশেষ বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র যেমন টোল, বিদ্যালয় এবং চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনা করত। শিক্ষার মাধ্যম ছিল হিন্দুদের পবিত্র ভাষা সংস্কৃত, যে ভাষাতেই কেবল সব ধর্মীয় এবং উচ্চতর বৈষয়িক জ্ঞান প্রকাশ করা হত।[২] এছাড়াও সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি পড়ান হত। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় নাটোরের রাণী ভবানী (১৭১৬-৯৫ খ্রি.) এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-৮২ খ্রি.) সংস্কৃত শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৩] প্রাক ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের জন্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন গোষ্ঠীর একচেটিয়া প্রভাব ছিল না। সকল মুসলমান মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতে পারত। উচ্চশিক্ষার ভাষা ছিল আরবি। অথচ এটি ভারতবর্ষে ছিল একটি বিদেশী ভাষা। অবশ্য এসময় কিছু স্কুল ছিল যেখানে মাতৃভাষা, ইসলামিক কৃষ্টি ও অন্যান্য বিষয় শেখানো হত। তবে রাজকার্যে যেহেতু ফার্সি ভাষার প্রাধান্য ছিল তাই মুসলমান ছাত্রদের পাশাপাশি হিন্দু ছাত্ররাও মাদ্রাসায় ফার্সি ভাষা শিক্ষা করত। এখানে উল্লেখ্য যে, মক্তব-মাদ্রাসা ও টোল-চতুষ্পাঠী সমূহে শিক্ষা ছিল প্রাচীন ও ধর্মশাস্ত্র ভিত্তিক, যেখানে কূপমন্ডুকতা ও মুখস্তবিদ্যার অপ্রতিহত প্রাধান্যের দরুন শিল্প, সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক জ্ঞানচর্চার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে পারে নি। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারত না এবং ধর্মীয় শিক্ষা অনুশীলনের মাধ্যমে মূলত নিজ নিজ ধর্ম এবং ধর্মানুমোদিত সামাজিক কাঠামোর প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য গড়ে উঠত। এমতাবস্থায় ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা একটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এটি নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সরকারের একটি প্রগতিশীল কাজ ছিল।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়েছে তিনটি মুখ্য সংস্থার জন্য। এগুলো হল বিদেশী খ্রিস্টান মিশনারিগণ, ব্রিটিশ সরকার এবং প্রগতিশীল ভারতীয়রা। পলাশী পূর্ব সময় থেকেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ভারতগামী প্রতিটি জাহাজে কিছু সংখ্যক মিশনারিকে ভারতে নিয়ে আসত। বস্তুত খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতেই আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়।[৫] ১৬৫৯ খ্রি. কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস আগ্রহ প্রকাশ করে যে, প্রাচ্য অঞ্চলে কোম্পানির যেমন বাণিজ্যিক সুবিধা আছে তেমনি ধর্ম প্রচারের সুযোগও আছে। ১৬৯৮ সালে স্থানীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করে কোম্পানি খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময়কালে ইংল্যান্ডে বেশ কিছু মিশনারি প্রতিষ্ঠান ছিল যারা প্রাচ্যে আসতে আগ্রহী ছিল। খ্রিস্টান মিশনারিরা ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করেছিল। তারা প্রধানতঃ ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্ম বিস্তারের জন্য ধর্মান্তরিত করার আগ্রহে উৎসাহিত হয়েছিল। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করার অভিযান সভ্য করার একটা প্রয়াস। তারা হিন্দুদের বহুঈশ্বরবাদ এবং জাতি বৈষম্যকে আঘাত করত কেননা খৃষ্টধর্ম মূলত এক ঈশ্বর ও সামাজিক সমতার পক্ষে। ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পথিকৃত এই মিশনারিদের প্রবর্তিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক বৈষয়িক শিক্ষা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টধর্মের ধর্মীয় নির্দেশও দিত। মূলত বৈষয়িক এসকল স্কুলগুলো ভারতীয়দের একত্রিত করার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত এবং তারপর তাদের খৃষ্টধর্মে শিক্ষা দিত। ঘটনা অবশ্য এই যে এইসব স্কুলে পড়া ছাত্রদের অধিকাংশই আধুনিক শিক্ষা আত্মস্থ করলেও তাদের একটা সামান্য অংশই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয়। তথাপি এই মিশনারি সংগঠনগুলো ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।[৬] ১৭১৯ সালে 'The Society for Promoting Christian Knowledge' নামের একটি সমিতি কলকাতায় আসে এবং ১৭৩১ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে আহার ও পরিধেয় বস্ত্র বিনামূল্যে দেয়া হত। বাংলায় এটিই পাশ্চাত্য ধরণের প্রথম স্কুল।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানি শাসনের প্রথমদিকে ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষা দান করা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক নীতির অংশ ছিল না।[৮] পরবর্তীতে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়েছিল প্রধানত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের প্রেরণায়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বিশেষ করে লর্ড ডালহৌসির আমলে ভারতে যে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়েছিল তা কোন ক্রমেই আকস্মিক ঘটনা ছিল না। ভারতবর্ষ শাসনের প্রয়োজনে একটি বিশাল, ব্যাপক, সুবিন্যস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে ব্রিটিশরা। রাজনৈতিক শাসনের এই বিশাল যন্ত্র চালানোর জন্য বহুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ব্রিটেন থেকে এতো বিপুল পরিমাণে শিক্ষিত ব্যক্তির যোগান দেয়া সম্ভব ছিল না। ফলে ব্রিটিশ শাসনের উপযোগী কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনে তাদের শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এসময় ব্রিটিশ সরকার রাষ্ট্র কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোর দায়িত্ব দিয়েছিল ব্রিটিশদের হাতে এবং অধস্তন পদগুলো পূরণ করা হত শিক্ষিত ভারতীয়দের দিয়ে। এছাড়াও কোম্পানি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দক্ষ কর্মচারী তৈরি করে উৎপাদনে বিপ্লব আনতে চেয়েছিল। একই সময়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্প্রসারিত বাণিজ্যের কারণে এবং ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিল তার জন্যও ব্রিটেনের ইংরেজি জানা কেরানী, ম্যানেজার ও এজেন্টের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উদ্দেশটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনই ব্রিটিশ সরকারকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন করতে বাধ্য করেছিল। একমাত্র আধুনিক শিক্ষা যা আধুনিক জাতির প্রয়োজন মেটাতে পারত তা তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজগুলোতে দেয়া হত। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হতেই সরকারি ও বাণিজ্যিক দপ্তরগুলোতে কেরানী, আইনজ্ঞ, ডাক্তার, কারিগর, চিকিৎসক সহ বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিদের সরবরাহ করা হত।

এছাড়াও কিছু উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করার পিছনে। সমগ্র বিশ্বে ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক ও রাজনৈতিক একতার পথ উন্মুক্ত করা। তাদের ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ সংস্কৃতিই হল বিশ্বের সব থেকে উৎকৃষ্ট ও সব দিক থেকে উদার। সেসময় ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ সেসিল জন রোডস (১৮৫৩-১৯০২ খ্রি.) এর ধারণায় ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও তার পরিধির বাইরে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই শাসন বিস্তার করা – যেমন ভারতবর্ষ, আফ্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

মহাদেশ, আরব ভূমি, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপী। তার মতে, এ সমগ্র অঞ্চলে সার্বভৌম পার্লামেন্টে ঔপনিবেশিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার সূচনা করে সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন সভ্যদের একত্রিত করে এমন এক মহান শক্তির ভিত্তি স্থাপন করা যেখানে যুদ্ধ থাকবে না এবং মানবতার সর্বোৎকৃষ্ট স্বার্থরক্ষা হবে।[৯] এটি ছিল সারা বিশ্বকে ইংরেজিয়ানায় গড়ে তোলার কর্মসূচী এবং এইভাবে ব্রিটেনের নির্দেশে ও নেতৃত্বে, প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক ও সামাজিক একতা অর্জনের প্রয়াস। বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়ে দুনিয়াকে সভ্য ও ঐক্যবদ্ধ করার অবতারের ভূমিকায় ব্রিটেনের এমন একটা প্রায় উন্মত্ত বিশ্বাস আর তার সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা মিশে, ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ত্বরান্বিত করেছিল।

ভারতবর্ষে ভারতীয়রাই ছিল আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের তৃতীয় প্রতিভূ। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) ছিলেন ভারতে প্রগতিশীল আধুনিক শিক্ষার পথিকৃৎ। তাকে আধুনিক ভারতের জনক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা না করলে ভারতবাসীর সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর হবে না। তিনি ইংরেজি শিক্ষাকে আধুনিক পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তা সম্পদের চাবিকাঠি বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া শুধু কুসংস্কার ও স্বৈরাচারই বাড়িয়ে তুলবে। তার মতে, ইংরেজি শিক্ষা আয়ত্ত করলে ভারতবাসীও বিশ্বের অন্যান্য জাতির মত আত্মবিশ্বাসী ও শক্তিশালী হতে পারবে। তিনি ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেলের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন যাতে তিনি সরকারকে 'গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শরীরবিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে আরও উদার ও বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করার' অনুরোধ করেন।[১০]

রামমোহন রায়ের দেখানো পথে পরবর্তীকালে অসংখ্য সংগঠন যেমন – ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, আলীগড় আন্দোলন এবং দেশমুখ, আগরকর, মাগনভাই, করমচাঁদ, কার্ভে, তিলক, গোখলে, মালব্য, গান্ধী প্রমুখ ব্যক্তিরা দেশজুড়ে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে স্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই শিক্ষা ব্যবস্থার ধর্ম নিরপেক্ষ প্রকৃতির সমালোচনাও করতেন এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু ধর্মীয় অনুশাসনও যুক্ত করেছিলেন। পণ্ডিত মালব্য কর্তৃক সংগঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং সৈয়দ আহমেদ খানের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এ আন্দোলনের দুটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

এদেশে কোম্পানি সরকার প্রথমদিকে শিক্ষা বিস্তারে তেমন কোন উদ্যোগ নেয়নি। তবে কোম্পানির প্রশাসকদের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। তাদের ঝোঁক ছিল সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষানীতি ছিল প্রথমদিকে প্রাচ্য বিদ্যায় অর্থাৎ মুগল আমলের জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করা। ১৭৮১ সালে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এর উদ্যোগে দেশের প্রথম সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছিল।[১১] তিনি নিজ পকেট হতে ৬০০০ পাউন্ড ব্যয় করে এ মাদ্রাসা নির্মাণ করেন এবং পরবর্তীতে কোম্পানি মাদ্রাসার সংস্থাপন ব্যয় তাঁকে পুনরভরণ করে।[১২] মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও এর পেছনে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী মুসলমানদের মধ্যে থেকে একদল ব্রিটিশ সমর্থক তৈরির চেষ্টা করা হয়। ১৭৯১ সালের দিকে কলকাতা মাদ্রাসার কারিকুলামে প্রাকৃতিক দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। বস্তুত কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সীমিতভাবে হলেও জনগণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন আরবি ও ফার্সি শিক্ষার জন্য এবং ১৭৯১ সালে বেনারসের অধিবাসী জোনাথন ডানকান সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটি কলেজ নির্মাণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে ইংরেজ বিচারকদের মুসলিম ও হিন্দু আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট দ্বারা সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের মাধ্যমে ইংরেজ আইন প্রচলন করা হয়।[১৩] স্যার

Dhaka University Institutional Repository

উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ খ্রি. প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণার জন্য কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলী কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, এই কলেজটি প্রাচ্য দেশের অক্সফোর্ডে পরিণত হবে।[১৪] একারণে এর পাঠ্যক্রম ছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। অপরিবর্তিত অবস্থায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অস্তিত্ব ১৮৫৪ সন পর্যন্ত বজায় থাকে।[১৫] এর পরে কলেজটি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছায় বন্ধ হয়ে যায়।

ইতোপূর্বে ইংল্যান্ডেই হেইলবেরী কলেজে ভারতে নিযুক্ত সিভিলিয়ানদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। তবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কৃতবিদ্য অধ্যাপকদের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। বিখ্যাত পাদ্রী উইলিয়াম কেরী ছিলেন এই কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। তিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। তাঁর উদ্যোগে কিছু বিদ্যোৎসাহী বাংলা ভাষায় কয়েকটি উল্লেখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন – উইলিয়াম কেরীর মুন্সী রামরাম বসু'র 'প্রতাপাদিত্য চরিত', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ইতিহাস গ্রন্থ 'রাজাবলী' উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের শুরুর দিকে কলকাতার শিক্ষিত ও অবস্থাসম্পন্ন হিন্দুরা নিজেদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব বোধ করেন। এসময় তাদের সহযোগিতায় ও স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের উদ্যোগে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অনুকরণে ১৮১৭ সালে স্থাপিত হয় হিন্দু কলেজ (পরবর্তীতে এর নাম হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ)। হিন্দু কলেজে খ্রিস্টান, মুসলমান ও বেশ্যানন্দন কে ভর্তি করার জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দুরা পরবর্তীকালে ১৮৫৩ সালে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন করে। হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রই এই নতুন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। অনেক তর্ক বিতর্কের পর সরকারি সিদ্ধান্তে হিন্দু কলেজের জুনিয়র বিভাগ হিন্দু স্কুল এবং সিনিয়র বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়।[১৬]

একথা অনস্বীকার্য যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজ এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছিল। একই বছরে ৪ জুলাই 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। উনিশ শতকের শুরুতে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রধান কারিগর ডেভিড হেয়ার বাৎসরিক ১০০ রুপি প্রদানের মাধ্যমে এর সাথে যুক্ত ছিলেন। এই সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি এবং স্থানীয় ভাষায় বই রচনা করা এবং বিক্রি করা।[১৭] প্রতিষ্ঠা লাভের পর পরই সরকার এটিকে মাসিক পাঁচশত টাকা মঞ্জুরি দান করে যা পরবর্তী ষাট বছর অব্যাহত ছিল। সোসাইটির পরিচালকমণ্ডলীতে ইংরেজ ও বাঙালি হিন্দু ছাড়াও কয়েকজন মুসলমান যেমন দরবেশ আলী, মৌলবি কাজেম আলী, মৌলবি বিলায়েত আলী এবং মৌলবি নুরুন্নবী প্রমুখ সদস্য ছিলেন।[১৮] শিক্ষা ক্ষেত্রে এসকল প্রয়াসের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি – ক) শিক্ষা বিস্তার ও খ) ইংরেজি শিক্ষাকে এদেশবাসীর নিকট জনপ্রিয় করে তোলা।

কোম্পানি ভারতে তাঁর প্রজাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকলেও বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ নানা কারণে দেখা দেয়। এই আগ্রহের পিছনে মূলত অর্থকরী উদ্দেশ্য থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ জ্ঞান পিপাসাও ছিল কারণ। এসময় এক শ্রেণির লোক ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখায় কারণ ছিল চাকুরি ও ব্যবসায়ে সুবিধা প্রাপ্তি, কারণ ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কেরানী, দোভাষী, নকল নবিশের কাজ করার জন্য ইংরেজি জানা লোকের কদর ছিল। তাছাড়া এধরনের লোক ইংল্যান্ড থেকে আনতে গেলে কোম্পানিকে অনেক বেশী পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হত যা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ফলে ইংরেজি জানা দেশীয় লোকদের কম বেতনে চাকুরি দিতে বেশির ভাগ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইচ্ছুক ছিল। একারণেই সাধারণ লোকজন ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি বেশ কিছু মননশীল, জ্ঞান-পিপাসু লোক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। যে জ্ঞান বিজ্ঞানের জোরে ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষকে পদানত করে শাসন করছে, সে জ্ঞান চর্চা থেকে ভারতবাসী দূরে থাকলে তারা চিরকাল পিছিয়ে থাকবে বলে বহু মননশীল ভারতীয় মনে করতেন। কোম্পানি সরকারের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়াই বেসরকারি প্রচেষ্টায় ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। আর. সি. মজুমদারের মতে, খ্রিষ্টীয় মিশনারিরা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেরা প্রথমে বাংলা শিখেন এবং বাঙ্গালীদিগকে ইংরেজি শিখাবার জন্য সচেষ্ট হন।[১৯]

ইংরেজি শিক্ষার উপযোগিতা বুঝে মানবতাবাদী ব্যক্তিরাও এর বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেন। এসময় তাদের পাশাপাশি খ্রিস্টীয় মিশনারিরা ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে কাজ করতে থাকলে

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। কোম্পানির কর্মচারীরাও বুঝতে পারে যে, বেসরকারি উদ্যোগে যেভাবে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে তাতে এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। এ সময় সরকারের একটা অংশ কম বেতনে ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়দের চাকুরিতে নিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক লাভের সুযোগ দেখে এ শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে সুপারিশ করে। ফলে সরকার ইংরেজি শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হয়। ভারতীয়দের কি ধরণের শিক্ষা দেয়া হবে তা নিয়ে এ সময় ব্রিটিশদের মধ্যে দুই ধরণের চিন্তা কাজ করে। প্রথম ধারাটি পরিচিত ছিল 'ইংরেজপন্থী' বা পাশ্চাত্যবাদী বা এ্যাংলিসিষ্ট (Anglicist) নামে। এ মতের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন লর্ড টি. বি. মেকলে যিনি 'পশ্চিমা সংস্কৃতির দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির বদল' চেয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও প্রাচ্য শিক্ষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে যে সকল রাজনৈতিক সুবিধার সৃষ্টি হবে সেগুলোর প্রতিও তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, ইংরেজি শিক্ষার ফলে ভারতে এক শ্রেণির লোক সৃষ্টি হবে যারা রক্ত ও রঙে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, চিন্তাধারা, নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ হয়ে উঠবে।[২০] এই ধারাটি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে সমর্থন দেয়। এই মতবাদ মিশনারি, কোম্পানির নবীন অফিসার এবং রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) মতো প্রগতিশীল ভারতীয়দের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধারাটি ছিল 'প্রাচ্যপন্থী' বা ওরিয়েন্টালিষ্ট (Orientalist)। এরা ভারতীয়দের মধ্যে পশ্চিমা জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারের কর্মসূচী মেনেও অবশ্য সংস্কৃত ও আরবি সাহিত্যে উৎসাহিত করার পক্ষে ছিলেন। কারণ তাদের মতে, প্রাচ্য ভাষা যথেষ্ট উন্নত। এই ভাষা ও দর্শন শিক্ষা করে মননশীলতা লাভ করা সম্ভব। প্রাচ্যপন্থীরা আরও মনে করত একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলেই পাশ্চাত্য শিক্ষা জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পারে। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে এদেশীয়দের শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার ব্যাপারে ১৮১৩ সালের সনদ আইন একটা ব্যতিক্রম ঘটনা। এই সনদ আইনের মাধ্যমে কোম্পানি প্রথম শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে। মিশনারিরা পাশ্চাত্য স্কুলের অনুকরণে স্কুল স্থাপনের অনুমতি পায়।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার জন্য বছরে যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দের কথা বলা হয়েছিল এ ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়, লর্ড আমহার্ষ্টকে এক পত্র দ্বারা অনুরোধ করেন যে, উক্ত টাকা যেন ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। ১৮২৩ সালে কলকাতায় একটি 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' গঠিত হয়। এ কমিটি বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা এবং প্রেসিডেন্সিতে যে সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেগুলোর তদারকির ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়।[২২] এ কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে প্রাচ্য শিক্ষার পক্ষে মতামত প্রদান করে। ফলে দেখা যায়, এসময় কলকাতায় সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হয় সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪ সাল)। অবশ্য রাজা রামমোহন রায় ও তার অনুগামীরা সরকারি এ উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কারণ তারা মনে করতেন একমাত্র ইউরোপীয় বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতের উন্নতি ও আধুনিকীকরণ সম্ভব।

প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি সরকারি পোষণনীতি এবং তাঁর জনপ্রিয়তার জন্য ব্রিটিশ-আমলা-প্রাচ্যবিদদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কলকাতার দেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। রামকমল সেনের (১৭৮৩-১৮৪৪ খ্রি.) বিবরণ হতে জানা যায় যে, ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার দিন হতেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার হিড়িক পড়ে। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজি বিদ্যার অর্থ ছিল Yes, No, Very Good ইত্যাদি সাধারণভাবে চালু শব্দ রপ্ত করা, নোট বইতে এরূপ বিভিন্ন শব্দ লিখে রাখা। যিনি যত ইংরেজি শব্দ ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সক্ষম তিনি ততই বিজ্ঞ পণ্ডিত বলে বিবেচিত হতেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে এরূপ বহু পণ্ডিতের কথা জানা যায়। রামরাম মিশ্র, রামনারায়ণ মিশ্র, কৃষ্ণ মোহন বসু, ভবানী দত্ত ও শিবু দত্ত তাঁদের অন্যতম।[২৩]

১৮৩০ এর দশকের শুরু থেকে পাশ্চাত্য বিদ্যার সমর্থকদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ই লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের (১৮২৮-৩৫ খ্রি.) আইন সচিব লর্ড মেকলে এক স্মারকলিপি রচনা করেন যা বিখ্যাত মেকলের মিনিট নামে পরিচিত। এতে তিনি ইংরেজির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং সরকারের কাছে তা পেশ করেন।[২৪] এটি ভারতে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে পরিচিত। তাঁর মতে, এক শেলফ

Dhaka University Institutional Repository

ভর্তি ইংরেজি সাহিত্যের পুস্তকে যে জ্ঞান সঞ্চিত থাকে সমগ্র সংস্কৃত ও আরবী সাহিত্য ভাণ্ডার মন্থন করলেও তা পাওয়া যাবে না।[২৫] তাঁর এ বক্তব্য অতিশয়োক্তি হলেও গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি মেকলের সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন হিসেবে ঘোষণা করেন।[২৬] অবশ্য ১৮২৯ খ্রি. হতেই তিনি ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে মত দেন এবং তিনি নিজেও ইংরেজি শিক্ষাকে সরকারের শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এসময় জেনারেল কমিটির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের উত্তপ্ত বিতর্কই বিষয়টির প্রকৃতিতে একটি পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়। অধিকতর সংস্কার মনোভাবাপন্ন তরুণ সদস্যগণ প্রাচ্যশিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতার নীতি সম্পর্কে আপত্তি জানান এবং ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অবশেষে ১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে এ বিতর্ক সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ একটি রেগুলেশনের মাধ্যমে লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের বিবরণীকেই গ্রহণ করেন। এদেশে ইংরেজির মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রসারকে ভারত সরকারের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করা হয়। সরকারের প্রকাশিত প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'ব্রিটিশ সরকারের প্রধান লক্ষ্যই হওয়া উচিত ভারতবর্ষের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার এবং শিক্ষার খাতে গৃহীত সমস্ত অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্য ও বিজ্ঞান শেখানোর জন্য ব্যয়িত হবে।'[২৭] এদেশে এখনও অনেকের ধারণা যে, মেকলেই এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তক। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়।[২৮]

ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের পেছনে অন্যান্য আরও কয়েকটি কারণ বেশ সহায়ক ছিল। উদাহরণস্বরূপ, The Freedom of Press Act, ১৮৩৫ ইংরেজি ভাষায় বইয়ের মুদ্রণ, প্রকাশনা ও প্রাপ্যতাকে উৎসাহিত করে পরোক্ষভাবে শিক্ষা প্রসারের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। ১৮৩৬ সালে সরকার কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে। এই কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৮ সালে মেডিকেল কলেজ সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৯] ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের আরও দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়। এর একটি হচ্ছে ১৮৩৭ সালে সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

অফিস আদালত সমূহে ফার্সির বদলে ইংরেজি ভাষা চালু এবং সকল সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজি জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে ১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর সিদ্ধান্ত ঘোষণা ভারতে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদাকে জোরদার করে তোলে। লর্ড হার্ডিঞ্জের ঘোষণায় বলা হয় যে,

> "…Preference shall be given in the selection of candidates for public employment to those who have been educated in the institutions thus established and especially to those who have distinguished themselves theirin by more than ordinary degree of merit and attainment…" [৩০]

লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৮ খ্রি.) ইংরেজি শিক্ষা ব্যাপক হারে প্রসার লাভ করে। এ সময় যারা ইংরেজি শিক্ষিত ছিল তারাই প্রশাসনে একচেটিয়া সুযোগ পায়। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা স্বর্ণপ্রসবিনী হয়ে উঠল এ শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য। যাবতীয় পার্থিব সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠিতে পরিণত হল এ শিক্ষা।[৩১] এ কারণে উনবিংশ শতকে একটা কথা প্রচলিত ছিল – 'English is Money'. অবশ্য এই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার ফলে শিক্ষিত লোকের সঙ্গে দেশবাসীর তফাৎ বেড়ে গিয়েছিল। জাতীয় অগ্রগতির প্রশ্নে ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত জীবনযাত্রা ও সমস্যা সমূহের সঙ্গে এই শিক্ষাব্যবস্থার কোন যোগ ছিল না।

বাংলায় ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের পরিবর্তে ১৮৪২ সালে কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হয়।[৩২] এই কাউন্সিলের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি জেলায় একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করা। এসময় কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনকে বিলোপ করে তাঁর সকল দায়িত্ব কাউন্সিলের হাতে ন্যাস্ত করা হয়। এর ফলে বাংলার বাইরেও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৮৫২ সালে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যানে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের অগ্রগতি নির্দেশ করে[৩৩] -

Dhaka University Institutional Repository

প্রদেশ	শিক্ষার মাধ্যম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	সরকারি সাহায্যের পরিমাণ	শিক্ষকের সংখ্যা	শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	বৃত্তি	
						সংখ্যা	বাৎসরিক ব্যয়
বাংলা	ইংরেজি ও মিশ্র ভাষা	৩১	৩,৮৭,১১০ টাকা	২৮৩	৫৪৬৫	২৯১	৪৯,৫২৪ টাকা
	স্থানীয় ভাষা	১০৪		১০৪	৪৬৮৫		
মাদ্রাজ	ইংরেজি ও মিশ্র ভাষা	১	১৩,৫৫৮ টাকা	১৩	১৮০	-	-
	স্থানীয় ভাষা	-		-	-		
বোম্বে	ইংরেজি ও মিশ্র ভাষা	১৪	১,৫০,৪০৮ টাকা	৬২	২০৬৬	৮৪	৫৮৮০ টাকা
	স্থানীয় ভাষা	২৩৩		২৩৩	১১,৩৯৪		

সূত্র - Syed Mahmood, *A History of English Education in India (1781-1893)*, Aligarh, 1895, p-79.

১৮৫৪ সালে সরকারি শিক্ষানীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই ৪৯ নম্বর প্রস্তাব হিসেবে ভারত সরকারের নিকট প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যথার্থ শিক্ষা নীতি প্রণয়ন এবং শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেন যা 'Education Despatch' বা শিক্ষা পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এতে প্রথমবারের মত এদেশে সর্বনিম্ন হতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একটা সুবিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। এ শিক্ষা পরিকল্পনায় বলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল যে, ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত হয়েছিল তিনটি উদ্দেশ্যে – এক, পশ্চিমী সংস্কৃতি বিস্তার করা; দুই,শাসনকার্যের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষিত কর্মচারী যোগাড় করা; তিন, সার্বভৌমের প্রতি ভারতীয় প্রজাদের কর্তব্য পালন।[৩৪] এ শিক্ষা পরিকল্পনাই ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর ভিত্তি তৈরি করেছিল। ১৮৫৪ সালের পরেই শিক্ষা বিস্তার অভূতপূর্ব প্রেরণা লাভ করে। চার্লস উডের এই ব্যবস্থাকে ভারত উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ম্যাগনা কার্টা বলা হয়। এই শিক্ষা পরিকল্পনাই ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে। প্রকৃত অর্থেই এটি ছিল ভারতের আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে একটি মাইলফলক এবং এটি উপমহাদেশের পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে।

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এদেশে নব্য শিক্ষা বিস্তারে সরকারি উদ্যোগের তুলনায় বেসরকারি উদ্যোগের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে।[৩৫] ১৮৭০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে দ্রুত ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার দেখে ব্রিটিশ সরকার খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এসময় লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২ খ্রি.) প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের উপর জোর দেন এবং সরকারি অর্থের বেশির ভাগ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে বলে ঘোষণা করেন। এসময় তিনি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাঁদের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ভার দিলেন। এর ফলে উচ্চ শিক্ষার প্রতি সরকারের উদাসীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। অবশ্য এক্ষেত্রে তেমন ক্ষতি হয়নি কারণ বেসরকারি উদ্যোগে এর প্রসার ঘটতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ১৮৭১-১৮৮২ সালের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৭ গুণ এবং ছাত্র সংখ্যা ৭ গুণ।[৩৬]

ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূচনা ব্রিটিশ শাসনের একটি প্রগতিশীল কাজ। এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকৃতিতে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত। এ শিক্ষা ভারতীয়দের সামনে আধুনিক পশ্চিমী যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক চিন্তার মহান সম্পদ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সব পথ প্রদর্শকরা ও পরবর্তী সব নেতারাই ভারতীয় সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে থেকেই এসেছিলেন।[৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮০ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে শিক্ষার বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছিল। ১৮৮০ সালের পরে ভারতে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটে এবং দেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষামূলক কাজ আরম্ভ হয়। এই কাজ সংগঠিত করে মিশনারিরা, সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও প্রগতিশীল ভারতীয়রা। এদের মধ্যে ১৯০১-২ সালে ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারে ভারতীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগের অংশ ছিল সবচেয়ে বেশি।[৩৮] হান্টার কমিশন নামে খ্যাত ১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বাধ্য হয় কিছু পদক্ষেপ সুপারিশ করতে যাতে করে ব্যক্তি উদ্যোগকে যুগপৎ উৎসাহ দান এবং কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।[৩৯] এছাড়াও এ শিক্ষা কমিশন ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশকালে এসময় অভিমত প্রকাশ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি উচ্চাশার গ্রহণযোগ্য উদ্দেশ্যে পরিণত এবং সরকারি চাকুরিতে সম্মানজনক অবস্থান ও শিক্ষিত পেশার একটি পাসপোর্ট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

১৮৯৯ সালে ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিয়ে লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রি.) এদেশে আসেন। ভারতে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার শেষ রূপকার ছিলেন তিনি। প্রযুক্তিগত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে ব্যর্থ হলেও শিক্ষানীতিতে তিনি অত্যন্ত সফল ছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা কোড, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (১৯০৪ খ্রি.) মাধ্যমে তিনি ভারতে একটি একক ও কেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন।[৪০]

লর্ড কার্জন এসময় প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পঠন-পাঠন, বিজ্ঞান শিক্ষা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ইত্যাদির উপরও জোর দেন। শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করে শিক্ষণকে একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি। এছাড়া ভারতীয়দের বিদেশে উচ্চ কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষা লাভের ব্যবস্থাও করে দেন তিনি। দেশে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ১৯০২ সালে 'Indian Universities Commission' প্রতিষ্ঠা করেন। এ কমিশন সুপারিশ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের আকার ছোট করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষাগ্রহণকারী সংস্থা হিসেবে নয়, শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করবে। উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিভুক্ত কলেজসমূহে মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্য চাপ প্রদান করবে। শিক্ষা পাঠক্রম

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় সাহায্য প্রদান, দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজসমূহের বিলোপ সাধন এবং অধিভুক্ত কলেজসমূহে ন্যূনতম হারে ফি নির্ধারণ প্রভৃতি সম্পন্ন করার জন্য কমিশন সুপারিশ করে। তীব্র সমালোচনার কারণে শেষের দুটি সুপারিশ বাতিল করা হয় এবং অন্যান্যগুলির আইন পরিষদ ও সংবাদপত্রের বিরোধিতার মুখেও বাস্তবায়িত করা হয়। সমালোচকরা মন্তব্য করেছিলেন যে, এই আইনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধুমাত্র একটি সরকারি দপ্তরে পর্যবসিত হয়েছিল।[৪১]

লর্ড কার্জন-এর উত্তরাধিকারিগণ মূল উদ্দেশ্যকে নির্বিঘ্ন রেখে শিক্ষানীতি কিছুটা সংশোধন করেন। এ সংস্কারের প্রতি বিরূপ জনমত সত্ত্বেও তাঁর শাসনামলে উল্লেখযোগ্যভাবে শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পুনঃস্থাপন ও পুনর্গঠিত হয়েছিল এবং সেগুলির পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা অব্যাহত রেখে সেগুলিকে শিক্ষা দানকারী সংস্থার রূপ দান করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োজিত পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলেজগুলি পরিদর্শন করতেন। এসময় সরকারও সতর্ক ভূমিকা গ্রহণ করে এবং বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে স্বীকৃতি প্রদানের উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। বিশৃঙ্খল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটে। মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ হয়।

১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হবার পর দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ শিক্ষাকে আরো ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে ১৯১৭ সালে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সময় লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলারের সভাপতিত্বে 'স্যাডলার কমিশন' গঠন করা হয়। এর মৌলিক উদ্দেশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে কেন্দ্রীভূত থাকলেও এর প্রাপ্ত তথ্যাদি ও প্রস্তাবসমূহের গুরুত্ব ছিল সর্ব ভারতীয়। স্বনামধন্য জে.ডব্লিউ গ্রেগরী, স্যার ফিলিপ জোসেফ হার্টগ, প্রফেসর র‍্যামজে মুর, স্যার আশুতোষ মুখার্জী, ডব্লিউ.ডব্লিউ হর্নওয়েল এবং জিয়াউদ্দীন আহমদ ছিলেন কমিশনের অন্যান্য সদস্য।[৪২]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে 'হস্তান্তরিত' এবং 'সংরক্ষিত' বিষয়সমূহের পার্থক্য চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত করা হয় এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদেশগুলিকে পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। ১৯২১ সালে শিক্ষা দপ্তর ভারতীয় মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হলে শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে শিক্ষার যে দৃঢ় অগ্রগতি হয়েছিল তা নিচের পরিসংখ্যানে স্পষ্ট হয়[৪৩] –

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		ছাত্র সংখ্যা	
	১৯২১-২	১৯৩৬-৭	১৯২১-২	১৯৩৬-৭
বিশ্ববিদ্যালয়	১০	১৫	সংখ্যা পাওয়া যায়নি	৯,৬৯৭
কলা মহাবিদ্যালয়	১৬৫	২৭১	৪৫,৪১৮	৮৬,২৭৩
বৃত্তিমূলক মহাবিদ্যালয়	৬৪	৭৫	১৩,৬৬২	২০,৬৪৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭৫৩০	১৩,০৫৬	১১,০৬,৮০৩	২২,৮৭,৮৭২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৫,০১৭	১,৯২,২৪৪	৬১,০৯,৭৫২	১,০২,২৪,২৮৮
বিশেষ বিদ্যালয়	৩,৩৪৪	৫,৬৪৭	১,২০,৯২৫	২,৫৯,২৬৯
অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা	১,৬৬,১৩০	২,১১,৩০৮	৭৩,৯৬,৫৬০	১,২৮,৮৮,০৪৪
অনুনমোদিত প্রতিষ্ঠান সমূহ	১৬,৩২২	১৬,৬৪৭	৪,২২,৩৬৫	৫,০১,৫৩০
মোট সংখ্যা	১,৮২,৪৫২	২,২৭,৯৫৫	৭৮,১৮,৭২৫	১,৩৩,৮৯,৫৪৭

সূত্র - A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Book Depot, Bombay, 1948, p-139.

শিক্ষাদপ্তর ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে থাকা ছাড়াও আরও কতগুলো কারণ ছিল যাতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাখ্যা মেলে। এসময় শিক্ষাদপ্তর ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে থাকায় শিক্ষার বিস্তার দ্রুতগামী হয়। এছাড়াও এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতাও এই কারণগুলোর অন্যতম।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

জনশিক্ষার দ্রুত বিস্তার এই সময়ের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এসময় অধিকাংশ প্রদেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা সংক্রান্ত একাধিক আইন পাস হয়েছিল।

নিম্নের পরিসংখ্যানে ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চিত্র দেখা যায়[৪৫] –

প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান		
	১৯২১-২	১৯২৬-৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,৫৫,০১৭	১,৮৪,৮২৯
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা	৬১,০৯,৭৫২	৮০,১৭,৯২৩
প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় (প্রত্যক্ষ)	৪,৯৪,৬৯,০৮০ টাকা	৬,৭৫,১৪,৮০২ টাকা

সূত্র - A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Book Depot, Bombay, 1948, p-139.

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সূচনা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে একটি প্রেরণা জুগিয়েছিল। এ সময়ে (১৯১৬-১৭ খ্রি. হতে ১৯৪৬-৪৭ খ্রি.) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয় এবং সমগ্র একক ও অধিভুক্ত ধরনের ১৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্রিটিশ বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এদেশে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত একটি নতুন বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব হয়।[৪৬] ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষার সূচনা ব্রিটিশ শাসনের একটি প্রগতিশীল কাজ। ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকৃতিতে ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত। এ শিক্ষা ভারতীয়দের সামনে আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমী যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক চিন্তার মহান সম্পদ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।[৪৭] ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশে শিক্ষিত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব করেছিল। এই শিক্ষা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জন্য সহায়ক বলে প্রমাণিত হয় এবং শাসন ও শোষণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য ছিল এদেশের শাসন পরিচালনা ও সম্পদ আহরণে এই শিক্ষিত শ্রেণিই হবে তাদের প্রধান সহায়ক গোষ্ঠী।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের প্রথম যুগে ইংরেজ শাসকদের এদেশীয় পণ্ডিত, মুনশী, মৌলবীদের প্রয়োজন ছিল শাসন কার্যের সুবিধার জন্য। তাই এ যুগে সামান্য ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে তারা এদেশীয় প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু রেখেছিল। পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্যবিদ্যা শিক্ষার প্রচলন হয়। হাইস্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৃতীয় যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ব সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারই ছিল প্রথম দুই পর্বে সরকার ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের মুখ্য উদ্দেশ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এই শিক্ষানীতিই অনুসরণ করা হয়। তারপর আধুনিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রচলন ধীরে ধীরে হতে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি বলতে যাদের বোঝায় সেই শ্রেণির বিকাশ হয় মূলত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।[৪৮]

তবে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য এদেশে ও বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কলকাতা ও তার আশেপাশে বেসরকারি উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিক হতেই বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক প্লাবন এসেছিল। সকলেই ইংরেজি পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে কলকাতার শহরতলী অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার দাবী অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। এসময় বাংলায় নব শিক্ষার প্রসারে উদীয়মান অভিজাতদের সমষ্টিগত প্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে শিক্ষা প্রসারের কারণ যেমন স্পষ্ট তেমনি এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রেণিগত ও সম্প্রদায়গত এবং বর্ণগত চরিত্র এবং তাঁর সীমাবদ্ধতা খুবই লক্ষণীয়। এই নয়া

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত শ্রেণির শিক্ষা প্রসারের মূলে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের কোন যোগাযোগ ছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তবে তাঁদের বাস্তব বৈষয়িক জ্ঞান যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জমিজমা বা ব্যবসায়ের মত ইংরেজি বিদ্যা যে একটি অর্থনৈতিক মূলধন তা অনুধাবন করার মত বুদ্ধি তাঁদের ছিল।[৪৯]

১৮১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমূখের চেষ্টায় হিন্দু কলেজ (পরবর্তীতে নামকরণ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ) স্থাপিত হয়। এ কলেজটি বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখান থেকেই নব্য বাংলার প্রধান নেতারা ছাত্র হিসেবে পাশ করেন এবং পরবর্তীকালে বাংলায় নবজাগরণে বিশেষ ভূমিকা নেন। প্রথম দিকে ডেভিড হেয়ার, রাজা রামমোহন রায় সহ হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্ররাও নিজ উদ্যোগে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৮১৮ খ্রি. কলকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এ সোসাইটি কতগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। কলকাতার বাইরের জেলাগুলোতেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হতে থাকে। বাংলার জমিদারেরা বিভিন্ন জেলায় কতগুলো ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। এভাবে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই খ্রিস্টীয় মিশনারি এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে।

ব্রিটিশ ভারতে বাংলা ছিল এমন একটি প্রদেশ যেখানে নাগরিক সমাজ নিজেদের জন্য শিক্ষার খানিকটা সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে নিজেরাই স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছে।[৫০] এই অগ্রগতি আরো দুর্বার হল যখন ১৮৩৭ সালে সরকারি ঘোষণা এল যে, নিম্ন আদালতে দেশীয় ভাষা এবং উচ্চ আদালতে ইংরেজি ভাষায় কাজকর্ম পরিচালনা করা হবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ সালে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের নির্দেশ দেন। ইংরেজি হল সরকারি প্রশাসন ও আদালতের ভাষা। কিশোরী চাঁদ মিত্র, রাম গোপাল ঘোষ প্রমুখ ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা ১৮৪৪ সালে ২৫ নভেম্বর 'ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে' সভা করে গভর্নর জেনারেলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সহায়ক এবং শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল – এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪ খ্রি.), উইলিয়াম কেরি প্রতিষ্ঠিত 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (১৮৯৪ খ্রি.), মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দ্যা কালটিভেশন অব সায়েন্স' (১৮৭৬ খ্রি.), কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিট্যুট (১৮৯১ খ্রি.), দ্যা এসোসিয়েশন ফর দ্যা এ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন অব ইন্ডিয়ানস (১৯০৪ খ্রি.), রামমোহন লাইব্রেরি ও ফ্রি রিডিং রুম (১৯০৫ খ্রি.), নারী শিক্ষা বিস্তার ও উন্নতির জন্য উত্তরপাড়া 'হিতকারী সভা' এবং জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৫৯ খ্রি.)। বেঙ্গল ইকনমিক ও আর্ট মিউজিয়াম, বেথুন সোসাইটি, বড়বাজার ফেমিলি লিটারেরি ক্লাব, মধ্যবাংলা সম্মিলনী, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট এসোসিয়েশন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সমাজ', ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও বেশ নাম করেছিল। ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে যে নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা ও পরিশীলিত মন গড়ে উঠেছিল তাঁর পুষ্টির জন্য এ সমস্ত সহায়ক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। শুধু এগুলো নয়, প্রত্যেক জেলাতে সামাজিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতির জন্য স্বতন্ত্র সভা বা সমিতি গড়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে ছিল পাবলিক লাইব্রেরি, রিডিং রুম ও আইন ব্যবসায়িদের সংঘ বা 'বার এসোসিয়েশন'।[৫১]

ইংরেজদের আগমনের পর এদেশে তাদের যে সহযোগী শ্রেণি গড়ে ওঠে তারা ইংরেজি শিক্ষা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। নূতন ইংরেজ রাজার রাজভাষা ও রাজবিদ্যা উদীয়মান বাঙালী বিত্তবান ও বিদ্বান উভয়শ্রেণির মনে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ ইংরেজি বিদ্যা বিত্তলাভ ও সামাজিক মর্যাদালাভের সহায়ক।[৫২] বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর সরকারি চাকরি, ব্যবসায়ী কাজকর্ম এর প্রয়োজনে বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হয়। এতে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দুদের দ্রুত উন্নতি হয়। উইলিয়াম এ্যাডামের তিন খণ্ডে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, লর্ড মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষানীতি থেকে বাংলার ভদ্রলোকেরা,

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা বেশি লাভবান হয়। ব্রিটিশ শাসনে শিক্ষা ও চাকরিতে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে।

১৮৩৬-৮৬ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় যারা পাশ করেছিল তাদের মধ্যে ৫.২% মুসলমান এবং ৮৫.৩% ছিল হিন্দু। আরেক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৮৮৫-৮৬ সালে বেঙ্গল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে দেখা যায় ঐ বছর বাংলাদেশে সমস্ত রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৩,৫৮,০২৯ জন। এর মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ৩,৭৯,৮৪২ জন অর্থাৎ মোট শিক্ষার্থীর ২৭.৯ শতাংশ।[৫৩] ১৮৭১ সালে বাংলা দেশে নানা বিভাগের সরকারী চাকরির একটি সম্প্রদায়গত হিসাব দাখিল করেছেন হান্টার সাহেব। তাতে দেখা যায়, সমস্ত বিভাগের সরকারী উচ্চশ্রেণির কর্মচারীদের মোট সংখ্যা ২১১১ জন, তাঁর মধ্যে ইউরোপীয় ১৩৩৮ জন, হিন্দু ৬৮১ জন, এবং মুসলমান মাত্র ৯২ জন।[৫৪]

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই যখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে থাকে সেসময় এ শাসনযন্ত্রের সহযোগী হয় এই শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। বাংলার বাইরে ভারতের প্রায় সর্বত্র (বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, পেশোয়ার ইত্যাদি) চাকরি ক্ষেত্রে তারা নিজেদের স্থান সুসংহত করে। এ সকল স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্থানীয় পেশাজীবী সম্প্রদায় না থাকায় পেশাদারি মানুষ ও করণিকের চাহিদা মেটাতে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফলে দেখা যায় বাঙালি ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক ও কেরানী সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং উনিশ শতকের শেষ দিকে সারা ভারতে বাঙালির সম্মান ও মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে যায়। সর্বত্র বাঙালি জাতি পায় সম্মানের আসন। অবশ্য শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের এ অবস্থার পরিবর্তন হতেও বেশি সময় লাগেনি। কারণ উনিশ শতকের শেষ দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইংরেজি শিক্ষিত স্থানীয় ব্যক্তিরা চাকরি ক্ষেত্রে দাবীদার হয়ে ওঠে এবং একই সময়ে বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে চাকরি ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হয়। ফলে এসময় বাঙালি হিন্দুরা কর্মক্ষেত্রে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। এ সময় মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুদের সামনে

Dhaka University Institutional Repository

ভদ্রভাবে জীবন যাপনের জন্য একমাত্র বিকল্প পথ হয়ে দাঁড়ায় বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার ঘটানো। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকের বাধাদান ছিল নিয়মিত ব্যাপার। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী বণিক সংস্থাগুলোও এ প্রক্রিয়ায় বাঁধা প্রদান করত। ফলে এ ক্ষেত্রেও সফলতা আসেনি।

এদেশে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল কেরানী তৈরি করা। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ বলেন, "বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে কেরানীদের সংখ্যাধিক্য ইংরেজ আমলের গোঁড়া থেকেই দেখা যায় এবং বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির সে বৈশিষ্ট্য আজও অনেকটা অক্ষুণ্ন আছে।"[৫৫] ব্রিটিশ প্রবর্তিত এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়নি বলে এ শিক্ষা ছিল প্রধানত মানববিদ্যামুখী। ফলে দেখা যায় এ সময়ে বাংলা সহ পুরো ভারত থেকে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য ইউরোপে পাঠানো হলেও তারা এদেশে ফিরে এসে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। ব্রিটিশ আমলে যথাযথ শিল্পায়ন না হওয়াই ছিল এর কারণ। ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজন মিটলেও এদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও অন্যান্যদের কর্মসংস্থান করা এ শিক্ষাব্যবস্থা ও অর্থনীতির পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এদেশে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার তৈরি হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সন পর্যন্ত স্নাতকের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ গুণ, কিন্তু ঐ সময়ে স্নাতক যোগ্য চাকরির সংখ্যা বেড়েছে মাত্র শতকরা ১২ ভাগ।[৫৬]

এদেশে শিল্প এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের পশ্চাৎপদতার কারণে মধ্যবিত্তের চাকরির সুযোগ ছিল একেবারেই সীমিত। সে কারণে এ উপমহাদেশে এদের জন্য রাষ্ট্রই হয়ে দাঁড়ায় চাকরির সবচেয়ে বড় উৎস। উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন চাকরির বেলা তো বটেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মধ্যবিত্তের এত আগ্রহের কারণ নিহিত ছিল ওখানেই।[৫৭] এসময় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যুবক শুধু সরকারি বা বেসরকারি অফিসে চাকরির প্রতি আগ্রহ দেখাত। সমকালীন

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য হতে জানা যায় যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে এদেশের শিক্ষিত বাঙালির সরকারি চাকরির প্রতি এক অন্ধ মোহের সৃষ্টি হয়েছিল। 'সরকারি চাকুরিয়া' সার্থক পেশাদারি মানুষ বা ধনবান বণিকের চেয়ে সমাজে বেশি মর্যাদা পেতেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এ এক অদ্ভুত অচিন্তনীয় পরিবর্তন।[৫৮]

পার্সিভাল স্পিয়ারের মতে, সমগ্র উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের ক্ষেত্রে এককভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল ১৮৩৫ সালের শিক্ষানীতি। এটা ব্যতীত আজকের শিক্ষিত ভারতবাসীকে কল্পনা করা যায় না।[৫৯] এ শিক্ষানীতিতে লর্ড বেন্টিঙ্কের রেগুলেশনের মাধ্যমে 'ফিলটারেশন তত্ত্ব'কে গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে লর্ড মেকলে সেদিন আশা পোষণ করেছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে কালো চামড়ার সাহেব তৈরি করার, যারা আচারে আচরণে ইংরিজিয়ানায় বুদ হয়ে ক্রমে নিচু তলার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবেন। ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়াস সীমাবদ্ধ রইল উচ্চ শিক্ষার মধ্যে, পল্লী অঞ্চল থেকে দূরে কতিপয় শহুরে মধ্যশ্রেণির চৌহদ্দিতে।[৬০] অন্য একজন গবেষকও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বই ও পত্র পত্রিকা প্রকাশ করে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে সহায়তা করেন। তবে নিজেদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণে তাঁরা সমাজের সর্বস্তরে এ শিক্ষা তেমনটা ছড়িয়ে দিতে পারেননি।[৬১]

মিহির আচার্যের মতে, রামমোহন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পুষ্ট 'নব্য জমিদার শ্রেণি', মধ্যস্বত্বভোগী এবং তারি আশ্রয়ে লালিত 'মধ্যশ্রেণি' গড়ে উঠল, যারা দীর্ঘকাল এবং আজো পর্যন্ত শ্রেণি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তাবৎ ভারতবর্ষের মানুষের স্বনির্বাচিত মুখপাত্র। এই 'মধ্যশ্রেণিই' ইংরেজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরি স্বার্থে তৈরি ইতিহাসের শবাধারটিকে ভারতবর্ষের বৃহত্তর মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।[৬২] নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান হয়। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ফলে এদেশে নতুন পেশাদারি মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব হয়। এই শ্রেণি হিন্দু সমাজের বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্যকে বিবেচনা করেনি। ইংরেজি শিক্ষা এদেশের হিন্দু সমাজের বর্ণ কাঠামোর

Dhaka University Institutional Repository

উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানে। ইংরেজি শিক্ষা এদেশের জাতিগত ও প্রথাগত পেশাকে ধ্বংস করে এক পেশাগত বিপ্লব তৈরি করে যা সমাজ অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক।

আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল যে, ইংরেজি ভাষা বাংলা প্রদেশ ছাড়াও সারা ভারতবর্ষ জুড়েই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে সংবাদ সংযোগের মাধ্যম হিসেবে জাতীয় স্তরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে মত বিনিময় করতে দারুণ কাজ করেছিল। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের সব পথ প্রদর্শকরা ও পরবর্তী সব নেতারাই এ সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে থেকেই এসেছিলেন। এ অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার সূচনার প্রগতিশীল ভূমিকা এবং তাঁর ফল স্বরূপ আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বস্তুতপক্ষে সব প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতারাই তা সে আন্দোলন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অথবা সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন তাঁরা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী। ক্রমশ ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠা জাতীয় আন্দোলনের সব পথিকৃৎ ও নেতারাই ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত।

তথ্য নির্দেশ

১। N.K. Sinha, *The History of Bengal (1757-1905)*, Calcutta University Press, Calcutta, December 1967, p.435

২। O' Mallely (ed.), *Modern India and the West*, Oxford University Press, London, 1941, p.138

৩। A.Mukherjee, *Reform and Regeneration in Bengal 1774-1823*, Calcutta, 1960, p.3

৪। A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Book Depot, Bombay, 1948, p.127

৫। গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫, পৃ.২৪

৬। Syed Nurullah and J.P.Naik, *History of Education in India*, Macmillan & Co. Ltd. Bombay, 1943, p.92

৭। কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ.৮ (উদ্ধৃত), গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪

৮। Syed Mahmood, *A History of English Education in India (1781-1893)*, Aligarh, 1895, p.02

৯। Hans Kohn, *A History of Nationality in the East*, 1929, p.94-95

Dhaka University Institutional Repository

(quoted in), A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism,* Popular Book Depot, Bombay, 1948, p.129

১০। J.K. Majumdar (ed.), *Raja Rammohun Roy And Progressive Movements in India : A Selection from Records (1775-1845)*, Calcutta, 1941, p.250

১১। আ. ফ. সালাহউদ্দীন আহমদ, "উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ও কর্মকাণ্ড", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম খণ্ড (রাজনৈতিক ইতিহাস), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ.২৭৩

১২। N.K. Sinha, *op.cit.*, p.435

১৩। S.Nurullah and J.P. Naik, *op.cit.*, p.47

১৪। David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Firma K.L.Mukhopadhayay, Calcutta, India, 1969, p.47

১৫। সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, চয়নিকা, ঢাকা, জুলাই ২০১৩, পৃ.৩৪৬

১৬। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ.১৪৫

১৭। Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, Papyrus, Kolkata, July 1979, p.98

১৮। বিনয় ভূষণ রায়, 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি', এক্ষণ, ১৭শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৯৩১, পৃ.২ (উদ্ধৃত), গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১২০

২০। A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856,* Bangla Academy, Dacca, 1977, p.227

২১। C.L. Thorpe, 'Education and the Development of Muslim Nationalism in Pre-Partition India', Journal of Pakistan Historical Society, Vol. XIII, Part-I, 1965, p.12 (উদ্ধৃত), গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৫

২২। F.W. Thomas, *The History and Prospect of British Education in India,* Cambridge, 1891, p.25

২৩। মুসা আনসারী, *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.১৭৩

২৪। K.S. Vakil & S.Natarajan, *Education in India,* Allied Publishers, Kolkata, 1954, p.110

২৫। R.Muir, *The Making of British India 1756-1858,* Manchester : At the University Press, 1917, p.299

২৬। P.Spear, *The Oxford History of Modern India 1740-1975*, Oxford University Press, Delhi, 1978, p.206

২৭। Resolution on Education (March 7, 1835), (quoted in), D.Kopf, *op.cit.*, p.248

২৮। রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

২৯। এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, মে ১৯৯৪, পৃ.১০৭

৩০। Syed Nurullah and J.P.Naik, *op.cit*, p.128

৩১। Zaheda Ahmad, "State and Education", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971)*, Vol-III (Social and Cultural History), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p.110

৩২। F.W. Thomas, *op.cit.*, p.133

৩৩। Syed Mahmood, *op.cit.*, p.79

৩৪। S.Nurullah and J.P. Naik, *op.cit.*, p.179

৩৫। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৬

৩৬। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.৩৯

৩৭। A.R. Desai, *op.cit.*, p.144

৩৮। S.Nurullah and J.P. Naik, *op.cit*, p.209

৩৯। Zaheda Ahmad, "State and Education", *op.cit.*, p.112

৪০। B.B. Misra, *The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times*, Oxford University Press, Delhi, 1960, p.293

৪১। A.R. Desai, *op.cit.*, p.138

Dhaka University Institutional Repository

৪২। K.S. Vakil & S.Natarajan, *op.cit.*, p.167-168

৪৩। A.R. Desai, *op.cit.*, p.139

৪৪। Report of the Hartog Committee, p.31 and Quenquennial Review of the Progress of Education in India, 1927-32, Vol. I, p.03 (quoted in), A.R. Desai, *op.cit.*, p.139

৪৫। A.R. Desai, *op.cit.*, p.139

৪৬। A.Mukherjee, *op.cit.*, p.15

৪৭। A.R. Desai, *op.cit,*. p.144

৪৮। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৪০২ (বাংলা), পৃ.৬৬

৪৯। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৪

৫০। Zaheda Ahmad, "State and Education", *op.cit.*, p.131

৫১। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯-৪০

৫২। বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ.১৪২

৫৩। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৭

৫৪। বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, পৃ.২৫

৫৫। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, পৃ.৬৮

৫৬। B.B. Misra, *The Administrative History of India (1832-1947)*, New Delhi, 1970, p.227

Dhaka University Institutional Repository

৫৭। Zaheda Ahmad, "State and Education", *op.cit.*, p.114

৫৮। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪

৫৯। P.Spear, *op.cit.*, p.274

৬০। মিহির আচার্য, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা*, লেখক সমাবেশ, কলকাতা, ১৯৩৫, পৃ.১৬

৬১। আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)*, বাংলা একাডেমী, ২০১২, পৃ.২০৬

৬২। মিহির আচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি ও বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ এবং ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলায় যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তা কালক্রমে আরো সুসংহত হয়। ১৭৬৫ সালের পর থেকে কোম্পানি সরকারের গৃহীত নানামুখী প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপের ফলে বাংলার ইতিহাসে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ঘটে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণি আধুনিক বাংলার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এর আগে বাংলায় কোন প্রকার মধ্যবিত্তশ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না। যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ঔপনিবেশিক যুগে সৃষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণিটি পূর্বের মধ্যবিত্তশ্রেণির তুলনায় ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল।[১]

উনিশ শতকের গোঁড়া থেকে শুরু করে বর্তমান শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালির যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু শ্লাঘনীয়, যা কিছু বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার পশ্চাতে রয়েছে এই মধ্যবিত্তশ্রেণির অবদান। বাঙালির আধুনিক ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্প সাধনা, ধর্ম ও সমাজ চিন্তা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংবাদপত্র সর্বত্র এই শ্রেণির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা চোখে পড়ে। মোঘল যুগের অবসানে এদেশে যে নতুন বাংলা গড়ে উঠল তার ভিত্তি তৈরি করে এই মধ্যবিত্তশ্রেণি। এই মধ্যবিত্তশ্রেণির মাধ্যমে ব্রিটিশ বাংলায় খুব সীমিত পরিসরে এক ধরণের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক জাগরণ তৈরি হয় যাকে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ 'বঙ্গীয় রেনেসাঁস' নামে আখ্যায়িত করে থাকেন।

আলোচ্য অধ্যায়ে ব্রিটিশ শাসনে বাংলায় মধ্যবিত্তশ্রেণির আবির্ভাব ও তাদের সৃষ্টিকৃত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

Dhaka University Institutional Repository

'মধ্যবিত্ত' এই শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, এই সামাজিক শ্রেণি সমাজ বিন্যাসের মধ্যবর্তী স্তর। অর্থাৎ এর ওপরে একটি এবং এর নিচে আর একটি স্তর – মধ্যবর্তী রেখায় এর অবস্থান। যদিও বিত্ত দিয়ে মধ্যস্থল চিহ্নিত করার কোন মাত্রা নেই; তথাপি অন্যভাবে বলা যায় এই শ্রেণির মানুষের বিত্তের পরিমাণ মাঝারি ধরনের। এদের অতিবিত্ত নেই, আবার এরা বিত্তহীনও নয়। এদের ওপরে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণি আর নীচে কৃষক, শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির মানুষ। এই দুই শ্রেণি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হল এই মধ্যবিত্তশ্রেণি। সাধারণ অর্থে ফরাসি শব্দ 'বুর্জোয়া' (এর অর্থ নাগরিক, মধ্যবিত্তশ্রেণি বা ব্যবসায়ী) এবং মধ্যবিত্তশ্রেণিকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তরে বুর্জোয়ারাই মধ্যবিত্তশ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হত। এর কারণ ছিল বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কল্যাণে সম্পদশালী হত। অপরদিকে ভূ-স্বামীরা ছিল ভূমি নির্ভর। সুতরাং ভূমি নির্ভর না হয়ে স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করায় সেখানকার বুর্জোয়ারা মধ্যবিত্তশ্রেণি হিসেবে অভিহিত হতো।[২] অবশ্য পরবর্তীকালে 'বুর্জোয়া' শব্দটি আর মধ্যবিত্তশ্রেণির সমার্থক থাকেনি, কারণ তাঁরা বর্তমান ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি প্রভাবশালী শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে 'মধ্যবিত্ত' হলো তারা, যারা ধর্মযাজকও নন এবং রাজবংশীয়ও নন কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় ধন সম্পদ আহরণ করে থাকেন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে 'মধ্যবিত্তশ্রেণি' বলতে ব্যবসায়ী ও কেরানী সম্প্রদায়কে বোঝাত। ধনতান্ত্রিকতার বৃদ্ধিতে 'মধ্যবিত্তশ্রেণি' বলতে তাদের বোঝাত, যাদের ভূমি ছিল এবং ভূমির আয় থেকে যাদের ব্যয় নির্বাহ হত। বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এক শ্রেণির মালিকদের বলা হত 'টেনিওর হোল্ডার' অর্থাৎ মধ্যসত্ত্বাধিকারী, যারা কৃষকদের নিকট থেকে জমির খাজনা ইত্যাদি উপরি সত্ত্ব হিসেবে উপভোগ করত, কৃষিকাজে কিছুমাত্র সংশ্রব না রেখেও।[৩] বাংলাদেশে নতুন শ্রেণি রূপায়নের ফলে সমাজে যে শ্রেণির বিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশি এবং অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় যার আধিপত্যও ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হল মধ্যবিত্তশ্রেণি।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

'A Dictionary of Social Science' এ উল্লেখিত সংজ্ঞানুসারে, উচ্চবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির মাঝামাঝি স্তরে অবস্থান করে মধ্যবিত্তশ্রেণি।[৫] আবার, Columbia Encyclopaedia তে 'মধ্যবিত্ত' বলতে জমিদার ও কৃষকদের মাঝে অবস্থিত শ্রেণিকে নির্দেশ করা হয়েছে।[৬] পাশ্চাত্য সমাজ বিজ্ঞানী গ্রেটেনের মতে, "সমাজের সেই শ্রেণিকেই আমরা মধ্যবিত্ত বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং প্রাথমিক নির্ভরযোগ্য উপাদান। এদের মধ্যে জমিদার ও কৃষকদের কোন স্থান নেই, কেননা এদের জীবন যাত্রার প্রধান অবলম্বন হলো ভূমি, মুদ্রা নয়।"[৭] সুতরাং বলা যায় যে, অর্থই মধ্যবিত্তশ্রেণির সামাজিক নিরাপত্তা ও পদমর্যাদা নির্ধারণ করে থাকে।

সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, প্রতিটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজেই মধ্যবিত্তশ্রেণির পরিচয় পাওয়া যায়, যারা উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মাঝখানে ক্রিয়াশীল থাকে। এক কথায় মধ্যবিত্তশ্রেণি তারাই যাদের বিত্ত প্রচুর নয় আবার একেবারে কমও নয়। আবদুর রহিমের মতে, বর্তমানকালে সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে – বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক চেতনা। এ শ্রেণি ভুক্ত লোকেরা শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত এবং তাঁরা বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের জীবিকা উপার্জন করে থাকে। শিক্ষা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুণে তাঁরা দেশের একটি রাজনৈতিক শক্তি এবং বর্তমান যুগের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।[৮] বিনয় ঘোষের মতে, মধ্যবিত্তশ্রেণি ও নগরবাসী না থাকলে আধুনিক যুগের অভ্যুদয় হত না এবং মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের কোনও পার্থক্যও কিছু বোঝা যেত না।[৯]

সুতরাং মধ্যবিত্ত বলতে আমরা সেই শ্রেণিকেই বুঝি যারা শিক্ষিত, রুচিবোধ সম্পন্ন, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন, জীবনবোধ সম্পন্ন, উপার্জনের অর্থে চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা রাখে, আর যাদের জীবনে থাকে কিছু স্বপ্ন এবং সে সাথে উচ্চশ্রেণিতে আরোহণের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। মধ্যবিত্তশ্রেণির সংজ্ঞা নির্ধারণ জটিল বিষয় হলেও সমাজ বিজ্ঞানীরা এ শ্রেণির কিছু বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে একমত হয়েছেন। তাদের মতে, এ শ্রেণির জনগণ শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ শ্রেণি ভুক্তরা মূলত সরকারি

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারি চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী, শিল্পী, আইনজীবী, প্রকৌশলী, ডাক্তার, ব্যাংকসমূহে কর্মরত সকল বেতনভোগী কর্মকর্তা, পরিদর্শক, সুপারভাইজার এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন সংবাদপত্র, ধর্ম ও ব্যবসা ইত্যাদিতে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারী হয়ে থাকেন। কিন্তু এ মাপকাঠিতে মধ্যবিত্তশ্রেণিকে নির্দেশ করলে ঔপনিবেশিক বাংলার (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.) মধ্যবিত্ত সমাজ বিকাশের বাস্তবতাকে সহজে অনুধাবন করা যায় না। সে সাথে এই সমাজের কাঠামোতে সৃষ্ট একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত অনেকেই মধ্যবিত্তের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। ফলে এক ধরনের অস্পষ্টতা রয়ে যায়।

আবদুল বাছিরের মতে, ঔপনিবেশিক যুগে আমরা 'মধ্যবিত্ত' শব্দটিকে সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ না করে আরো প্রসারিত অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতি। যেমন কায়িক শ্রম পরিহারকারী ও অপরের শ্রম আত্মসাৎকারী অথবা কায়িক শ্রমজীবীদের শ্রমের ওপর প্রধানত নির্ভরশীল এবং প্রচুর বিত্ত বা বৃহদায়তন উৎপাদন উপকরণের মালিক নন এমন ব্যক্তিকে আমরা মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে চাই।[১০] আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার অবক্ষয় পর্বে এবং নতুন পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যুদয় ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিত্তবান এবং বিত্তহীন শ্রেণি দুটির মধ্যবর্তী স্তরে বিকশিত উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন ও অর্থনৈতিক স্বার্থের বিচারে অভিন্ন জনগোষ্ঠীকেই আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণি বলে অভিহিত করা যায়।[১১]

মুসলিম শাসনামলে যখন এদেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রচলিত ছিল, তখন সমাজে রাজনীতি সচেতন মধ্যবিত্তশ্রেণি অপরিজ্ঞাত ছিল।[১২] সমাজের ক্রম বিবর্তনের ফলে বাংলায় এই শ্রেণির উত্থান ঘটে। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তার 'সিয়ার মুতাক্ষরীন' বা 'আধুনিক কালের ইতিহাস' গ্রন্থে সমকালীন বাঙালি সমাজকে তিন ভাগ করেন – উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন।[১৩] এ থেকে ধারণা করা যায় এসময় বাংলায় সীমিত অর্থে হলেও একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। মূলতঃ ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ শক্তির জয় লাভের ফলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে নতুন ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে তাতে বাঙালি সমাজের নবোদ্ভুত শক্তিগুলো ইংরেজ শাসকদের সহযোগী একটি শ্রেণি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে বিকশিত হয়।[১৪] অবশ্য এ শ্রেণি সৃষ্টির পটভূমি রচিত হয়েছিল আরও পূর্বে মুর্শিদ কুলি খান কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় থেকে।[১৫] মুর্শিদ কুলি খানের রাজস্ব সংস্কারের ফলে অচিরেই বাংলায় প্রশাসক ছাড়াও জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে স্থানীয় বাঙালি হিন্দু অভিজাতগণ। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলের ইতিহাসে এই প্রথম গুনগত এক পরিবর্তন আনেন মুর্শিদ কুলি খান, এভাবেই রচিত হয় বাঙালি অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণি সৃষ্টির পটভূমি।[১৬] তবে নবাবী আমলে বাংলায় হিন্দু মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও মধ্যবিত্ত সমাজ তেমন সম্প্রসারিত হয়নি।

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের অন্যান্য দেশে এক নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির আবির্ভাব হয়। এ শ্রেণির উদ্ভব হয় প্রধানত সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটার ফলে। নতুন পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রয়োজনে দেশে ও বিদেশে যে বিপুল কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হয় সে প্রয়োজনেই গড়ে ওঠে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণি।[১৭] ইংল্যান্ডে বণিক শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তা হল না। এদেশে ইউরোপের মত অর্থনৈতিক বিপ্লব না হয়েও এক নতুন সামাজিক শ্রেণির আবির্ভাব হয়। সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিমের মতে, ভারতীয় উপমহাদেশে এ নতুন ধরনের সামাজিক শ্রেণির আগমন ছিল ব্রিটিশ শাসনের সরাসরি ফল। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা এ অঞ্চলে নতুন অর্থনীতি, নতুন ধরনের প্রশাসন ও নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিল। [১৮]

ইংরেজ কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রি.) এবং বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪ খ্রি.) মাধ্যমে বাংলা দখল করেছিল। ধীরে ধীরে তাঁরা পুরো ভারতবর্ষ অধিকার করে। বিশাল ভারতবর্ষ শাসনের প্রয়োজনে তাঁরা প্রথমে একদল অনুগত শ্রেণি তৈরির চেষ্টা করে। এ শ্রেণির মধ্যে স্থান পায় বহু ধরণের স্বার্থ, পেশা, গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী। এদের আবির্ভাব হয় মূলত একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে এবং এদের ঐক্যবন্ধন হল একই ধরণের জীবন, আচার আচরণ ও নৈতিক বোধ। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই এদেশীয়দের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণই মূলত সকল সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার করে সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রগামী গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং নিঃসন্দেহে তারাই বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির পথ প্রদর্শক। সাম্রাজ্য স্থাপনের সুচতুর ব্যবস্থাপনায় ইংরেজরা বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা দান করে বাংলায় বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তানদের নিয়েই মধ্যবিত্তশ্রেণি রূপ সুদৃঢ় স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ও বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির একাংশরূপে আবির্ভূত হয়। সব নিয়ে উনিশ শতকের শেষদিকে এক বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা অমিল ছিল ঠিকই তবে মিল ছিল অনেক বেশি। মধ্যবিত্তরা সকলেই ছিলেন অল্পবিস্তর শিক্ষিত। জমির উপর নির্ভরশীল, কায়িক শ্রমবিমুখ, সরকারী চাকরি প্রত্যাশী এবং পেশাদারি বৃত্তিতে নিযুক্ত। এদের চিন্তা ভাবনা, জীবনযাত্রা ও মানসিকতা অনেকটা একই ধরণের। এদের সম্পদের উৎস, রূপ ও ব্যয় করার পদ্ধতি অনেকটা এক রকম। এরা আধুনিকতা, গণতন্ত্র ও উদারনীতির পক্ষপাতী। এরা নয়া বাঙ্গালার রূপকার মধ্যবিত্ত সমাজ।[১৯]

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ব্রিটিশ প্রশাসন কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এগুলির মধ্যে ভূমি ব্যবস্থার নতুন বিন্যাস, ব্যবসায় বাণিজ্যে পুঁজিবাদী চেতনা সৃষ্টি, ইংরেজি ভাষার সরকারিকরণ, আইন আদালত স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিল্প স্থাপন উল্লেখযোগ্য। এই সকল সরকারি পদক্ষেপের ফলে বাংলায় সামগ্রিকভাবে আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব অনিবার্য হয়ে উঠে। ব্রিটিশ প্রবর্তিত নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বাণিজ্য নীতি, শিল্প কারখানা, যোগাযোগ এবং সর্বোপরি ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলেই মূলত এদেশে নতুন সামাজিক শ্রেণি হিসেবে মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। সুতরাং বলা যায় যে, স্বার্থ প্রণোদিত হয়েই ব্রিটিশ জাতি এদেশে অনুগ্রহ প্রত্যাশী মধ্যবিত্তশ্রেণির সৃষ্টি করেছিল। এদেশের মাটি থেকে তার উদ্ভব হয়নি। সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণ দৃষ্টি থেকেও এ শ্রেণির জন্ম হয়নি। ব্রিটিশরা এ শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল তাবেদার হওয়ার বীজমন্ত্র দিয়ে, নতুন ও মহৎ মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়ে নয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এই জাতীয় নিঃশর্ত ভালবাসা বিশ্বের ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত কোন মধ্যশ্রেণি বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রে নেই। এ বিশেষত্ব সম্পূর্ণ ভারতীয়।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশের পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর এদেশে সনাতন সামাজিক শ্রেণিগুলোতে অবক্ষয় শুরু হয়। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় সমাজে যে নতুন সামাজিক শ্রেণিগুলোর উদ্ভব হয়েছিল তার মধ্যে কৃষি এলাকাতে প্রধানত ছিল ১) ব্রিটিশ সরকার সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি, ২) অনুপস্থিত ভূস্বামী, ৩) জমিদার ও অনুপস্থিত ভূস্বামীদের অধীনে প্রজাগণ, ৪) উচ্চতর মধ্য এবং নিম্নতর পর্যায়ে বিভিন্ন স্বত্ববান কৃষকশ্রেণি, ৫) কৃষি শ্রমিক, ৬) আধুনিক বণিক শ্রেণি, ৭) আধুনিক মহাজন শ্রেণি। অন্যদিকে শহর এলাকাতে ছিল প্রধানত ১) শিল্পগত, বাণিজ্যগত এবং অর্থগত আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণি, ২) শিল্প, পরিবহণ, খনি এবং এইরকম সব উদ্যোগে নিযুক্ত আধুনিক শ্রমিক শ্রেণি, ৩) আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত ছোট ব্যবসায়ী এবং দোকানদার শ্রেণি, ৪) বৃত্তিভোগী শ্রেণি যেমন কৃতকৌশলী, ডাক্তার, আইনজীবী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ম্যানেজার, কেরানী এবং অন্যান্যরা যাদের নিয়ে গঠিত ছিল বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি।[২১]

ইংরেজরা বাংলা থেকে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সূচনা করে। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি মধ্যবিত্ত হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় 'সহযোগী সম্প্রদায়'। হিন্দু সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তা চেতনা ও শিক্ষার প্রসার এবং ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সৃষ্ট নতুন ব্যবস্থাকে সহজে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করার ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ হয় দ্রুত। অন্যদিকে তথাকথিত 'আশরাফ' মুসলমানগণ যখন তাঁদের অবস্থা উন্নয়নে এগিয়ে আসে তখন তাঁরা নিজেদের পিছিয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পায়[২২] এবং হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রাধান্য লক্ষ্য করে। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম যুগে যে বিশাল কর্মক্ষেত্র তৈরি হয় তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বাঙালি মধ্যবিত্ত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র বাঙালিদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে দেখা যায়। নতুন ভূমি ব্যবস্থা, বাণিজ্য, সরকারী চাকরি ও প্রশাসনের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির পেশাদার হিসেবে একমাত্র শিক্ষিত বাঙালিদের একচেটিয়া প্রভাব ছিল। বিশেষ করে ব্রিটিশ ভূমি রাজস্ব আইনে ভূমির সত্ত্ব স্বামিত্ব সম্বন্ধে বিধান থাকায় মামলা সৃষ্টির যে দিগন্ত খুলে গিয়েছিল সে সব ক্ষেত্রে বহু

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণির চাকুরে ও উকিল মোক্তারের ভিড় দেখা যায়। এর ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণি সংখ্যাও ধীরে ধীরে বিপুলায়তন হয়ে উঠল।

ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় বাংলাতেই প্রথম মধ্যবিত্তশ্রেণি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল। এই বিষয়ে বাংলাকে অগ্রণী বলা যেতে পারে। ইংরেজি শিক্ষিত পেশাজীবীরাই ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণির মূল স্রোতধারা। নিম্নোক্ত শ্রেণিগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণিভূক্ত ছিল।

ক) ব্যবসায়ী শ্রেণি, এজেন্টগণ, আধুনিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক, এই সব প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ও ডিরেক্টরবৃন্দ। তবে একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের অথবা শিল্পের প্রধানগণ এই শ্রেণিভুক্ত নন।

খ) বেতনভুক নির্বাহী কর্মকর্তা, যেমন ম্যানেজার, ইন্সপেক্টর সুপারভাইজার, টেকনিক্যাল অফিসার, অথবা ব্যাংক ব্যবসা ইত্যাদিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা।

গ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচ্চ বেতনভুক্ত অফিসারবৃন্দ। এদের মধ্যে শিল্প ও বণিক সমিতির, অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, সমাজ সেবা, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানাদি রয়েছে।

ঘ) হাইকোর্ট জজ এবং সেক্রেটারি পদমর্যাদার উর্ধ্বের ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকল সিভিল সার্ভিসের সদস্যগণ এই শ্রেণিভুক্ত। এই সার্ভিসের মধ্যে কৃষি, শিক্ষা, গণপূর্ত, পরিবহণ এবং যোগাযোগ বিভাগ উল্লেখযোগ্য।

ঙ) সকল স্বীকৃত পেশার সদস্যবৃন্দ। এদের মধ্যে আছে ডাক্তার, আইনজীবী, প্রভাষক, অধ্যাপক, উচ্চ এবং মধ্যম সারির লেখক, সাংবাদিক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, ধর্ম প্রচারক এবং পাদ্রীগণ।

Dhaka University Institutional Repository

চ) বৃহৎ ও ছোট আকারের ভূমি মালিক ছাড়া সকল মধ্যম আকারের ভূস্বামীগণ এই শ্রেণিভুক্ত। এদের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি আছে এমন কৃষক এবং জমির সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য পেশার ব্যক্তিবর্গ।

ছ) স্বচ্ছল দোকান মালিক, হোটেল এবং ম্যানেজার, হিসাবরক্ষক ইত্যাদি পেশার ব্যক্তিবর্গ।

জ) গ্রামীণ প্লান্টেশন শিল্পের মালিক। জমিদারীতে নিযুক্ত বেতনভুক কর্মচারী।

ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সমপর্যায়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

ঞ) করণিক, অফিস সহকারী এবং কায়িক পরিশ্রম করে না এমন ব্যক্তিবর্গ।

ট) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় সামাজিক, রাজনৈতিক অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ।[২৩]

অবশ্য ইংরেজ আগমনের আগেও এদেশে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। তবে সে শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন প্রকৃতির এবং আধুনিকতা বর্জিত। ইংরেজ আমলেই এদেশে মধ্যবিত্তশ্রেণি পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়।

উনিশ শতকের শেষ দশকে মধ্যবিত্তশ্রেণি বাংলায় মোটামুটিভাবে বিভিন্ন ফোরামে তাঁদের ভূমিকাকে জোরালো করতে সমর্থ হয়। নাজমুল করিমের মতে, কোম্পানি আমলে এদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তরের ফলেই মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণিকে তিনটি প্রধান ভাগে পরিচিতি দেয়া যায় – ক) বাণিজ্য নির্ভর মধ্যবিত্ত, খ) পেশাজীবী মধ্যবিত্ত, গ) ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণি। এই সময় গ্রাম অঞ্চলেও নতুন সামাজিক শ্রেণিসমূহের উন্মেষ ঘটে। এগুলো নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় – ক) ব্রিটিশ প্রশাসন সৃষ্ট নতুন জমিদার শ্রেণি, খ) নতুন জমিদারদের প্রজা, গ) জোতদার, ঘ) ব্যবসায়ী, ঙ) মহাজন শ্রেণি।[২৪] বি. বি. মিশ্রও ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণিকে অনুরূপভাবে চার ভাগে ভাগ করেছেন। এরা হল – ক) শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি; খ) ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত; গ) বাণিজ্য নির্ভর মধ্যবিত্ত এবং ঘ) শিল্প নির্ভর মধ্যবিত্ত।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ধারাটি ছিল এদেশের ভূমি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সমাজ বিজ্ঞানীদের ধারণা ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে বৃহৎ জমিদারদের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যাদের প্রধান নির্ভরতা হবে জমি।[২৬] ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে বাংলায় ভূমির মালিক ছিল গ্রাম প্রধানের নেতৃত্বে সকল গ্রামবাসী। বাংলার নবাব মুর্শিদ কুলী খানের আমলে (১৭০৪-২৭ খ্রি.) এদেশে প্রথম ভূমি ব্যবস্থায় কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। তিনি বাংলা সুবাকে চাকলা, জমিদারি ও জায়গীরদারিতে বিভক্ত করেন। এই সকল জমিদারি এক একজন বংশানুক্রমিক অথবা অস্থায়ী জমিদার ও ঠিকাদারদের অধীনে ন্যস্ত করেন। রাজস্ব প্রশাসনে তার প্রণীত এ ব্যবস্থা ব্রিটিশদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরবর্তীকালে এর উপর ভিত্তি করেই ব্রিটিশ ভারতীয় ভূমি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে বলে ধারণা করা হয়। কোম্পানির দিওয়ানি লাভ (১৭৬৫ সালে) বাংলার ভূমি ব্যবস্থার রূপান্তরের ক্ষেত্রে অন্যতম ঘটনা।

অতঃপর আটাশ বছর ধরে চললো ভূমি ব্যবস্থায় আশ্চর্য বিবর্তন ও পরিবর্তন, যার অনুষঙ্গ হিসেবে অর্থনৈতিক কাঠামোতেও সংসাধিত হল আলোড়ন ও বিপ্লব – ইচ্ছাকৃতভাবে তালুক বিলি, জমিদার সৃষ্টি; চললো পাঁচশালা-একশালা বন্দোবস্তের দ্বারা রাজস্ব বিষয়ে অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পরিশেষে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজ সর্বপ্রথমে এদেশে ভূমিতে স্বত্বস্বামিত্বের চেতনা আনয়ন করেছে – ভূমি পরিণত হয়েছে কেনাবেচার পণ্যে।[২৭] দিওয়ানি লাভের পর ভূমিনীতিতে কোম্পানি সরকারের প্রথম লক্ষ্য ছিল স্থানীয় ভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী বৃহৎ জমিদারিগুলোর ভাঙ্গন ধরানো। এ নিরিখে প্রথমে ইজারাদারি সুবিধাজনক হওয়ায় সে ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় করা হত। ১৭৭২ সালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৮৫ খ্রি.) ইজারাদারি পাঁচশালা বন্দোবস্তে নিলাম প্রদান করেন। ইজারা প্রদান নিলাম ডাকে হওয়ায় কোম্পানির বানিয়ান, মুৎসুদ্দি, সরকার, গোমস্তারা ব্যবসায়ে উপার্জিত অঢেল অর্থ ভূমিসত্ত্বে বিনিয়োগ করে। ফলে ভূমি কেন্দ্রিক এক প্রকার মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। নতুন ইজারা নীতির ফলে পুরাতন অভিজাত শ্রেণির জমিদারগোষ্ঠীতে ভাঙ্গন ধরে এবং নব্য বানিয়ানরা তাদের স্থান দখল করে। পাঁচশালা ও একশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে প্রধানত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতিতে। এ বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন একদল লোককে ভূমির প্রকৃত মালিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূর্যাস্ত আইনে পুরানো জমিদারীর ভাঙ্গন ধরে এবং তার স্থলে নব ভাবধারায় প্রভাবিত নব্য জমিদার শ্রেণির জন্ম হয়। এই নতুন জমিদার শ্রেণি স্বভাবতই ব্রিটিশদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল।[২৯] পুরাতন জমিদার গোষ্ঠীর পরিবর্তে চরিত্রে, মন মেজাজে কোম্পানির ইজারাদার বেনিয়ানরা নয়া জমিদার শ্রেণি হিসেবে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণিতে রূপায়িত হল। তারা কলকাতায় বিলাস বহুল জীবনে অভ্যস্ত হল এবং নিজেদের ভাগ্যের নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ শাসনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমর্থক হয়ে দাঁড়াল।[৩০] প্রধানত শহরবাসী এসকল জমিদার নিজেদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করলেন মধ্যস্বত্বভোগীর দল। পত্তনিদার, দার-পত্তনিদার, সেপত্তনিদার যেমন এল তেমনি এল জমির অকৃষক মালিক। এ ধারাবাহিকতায় কৃষিভূমির সত্বকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে কোথাও ৭টি, কোথাও ৮টি, কোথাও ১৭টি আবার কোথাও ৫০টি পর্যন্ত অধস্তন মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এ সূত্রে জন্ম নেয় তালুকদার, পত্তনিদার, জোতদার, গীতিদার, হাওলাদার, মৌরসী, মুকাররারীদার, চাকরান, পাইকান ইত্যাদি বিচিত্র নামধারী মধ্যসত্বভোগী। এরাই মূলত বাংলায় আধুনিক ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণি রূপে পরিচিত।[৩১] জমিদার শ্রেণির মত পত্তনিদাররাও চিরকালের জন্য নিদিষ্ট করা বাৎসরিক রাজস্ব প্রদান করে ইচ্ছেমত কৃষক শোষণের অধিকার পায়। কৃষিকাজের সাথে সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও কৃষককে শোষণ করে এরা সম্পদের অধিকারী হয়। এরাই ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের প্রধান রক্ষাকবচ হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৮৫৫ সালে বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জমি তালুকদারি বা মধ্যসত্ত্বের অধীনস্ত হয়। বন্দোবস্তের মালিকানা সংজ্ঞায়িত ও স্বীকৃত হওয়ায় এবং ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সকল আইন কানুন জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বার্থ সংরক্ষণে নিয়োজিত হওয়ায় অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের ফলে মধ্যস্বত্বভোগী এবং কর্মচারীবৃন্দ বিত্তশালী হয়ে উঠে। প্রাচীন জমিদারীর ধ্বংস ও বিভক্তি এবং পত্তনিসত্ত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি এ দুটি কারণেই বাংলায় ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তের বিকাশ দ্রুততর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, ১৮৫৮ সাল থেকে এদেশের ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পিতভাবে জমিতে কায়েমী স্বার্থপুষ্ট মধ্যবিত্তের উত্থান চেয়েছিলেন। ভূমি আশ্রয়ী, মধ্যবিত্ত এদেশের ব্রিটিশ শাসনের যেমন সমর্থক হবেন তেমনি এদেশের সম্পদ আহরণে এরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।[৩২] ফলে দেখা যায় ১৮৫৯ সালে প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে এদের অধিকার সরকারী স্বীকৃতি পেল। এসময় এদেশের বণিক, মহাজন, গোমস্তা এবং পরবর্তীকালে উকিল, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার প্রভৃতি পেশাদার ব্যক্তিরাও এই পত্তনি নিতে শুরু করেন। এই শ্রেণির লোকেরা তালুকদারি, গাঁতিদারি, হাওলাদারি স্বত্ব কিনে নিয়ে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও সাংসারিক আয় দুটোই বাড়ানোর চেষ্টা করে। পেশাদারি বৃত্তি থেকে আয় ও জমির উপস্বত্ব সাংসারিক আয় ও সামাজিক মর্যাদা উভয়েই বাড়িয়ে দেয়। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বাংলাদেশের তৎকালীন অবস্থায় সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের একমাত্র উপায় ছিল জমিদারি বা মধ্যস্বত্ব ক্রয়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে এদেশের সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে জমিদারি বা মধ্যস্বত্ব ক্রয়ের এক প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। বণিক, মহাজন, উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারি কর্মচারী সকলেই নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, কায়ক্লেশহীন আয়ের আশায় জমিদারি বা তালুকদারি স্বত্ব কিনতে লাগলেন। অবশ্য বাংলাদেশের পত্তনি, তালুকদারি বা গাঁতিদারি ব্যবস্থা থেকেই শুধু মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়নি। বাংলার ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তের উত্থানের পশ্চাতে অন্যতম একটি কারণ হল এদেশের হিন্দু মুসলমান সমাজের উত্তরাধিকার আইন। এ আইনের প্রয়োগের ফলে মুসলমান ও হিন্দুদের জমিদারীর খণ্ডীকরণ হয়। জমিদারী ক্রমশ ভাগ হবার ফলে উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে বাংলার মোট জমির দুই তৃতীয়াংশ উপস্বত্বভোগী জোতে পরিণত হয়। এই সব জোতের ক্রেতাদের অনেকে ছিলেন শহুরে মানুষ।

গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের পাঁচশালা, একশালা বন্দোবস্ত এবং কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণেই মূলত নতুন পুঁজিপতি, বানিয়া ও সরকার প্রমুখেরা জমিদারি ক্রয় করে সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হয়। ১৮৭২-৭৩ সালের 'বেঙ্গল এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট' থেকে

জানা যায় যে, বাংলা ও বিহারের মোট জমিদারীর সংখ্যা ছিল ১,৫৪,২৮০। এর ঠিক একশো বছর আগে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় (১৭৭২-৮৫ খ্রি.) জমিদারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০০।[৩৩] ব্রিটিশ ভূমি ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম সমাজে ভাঙ্গন ধরে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেণি চেতনার উদ্ভব ঘটে। এসময়কার বাংলার জমিদার এবং ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তরা বেশি সংখ্যকই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণি মুসলমান সমাজের চেয়ে হিন্দু সমাজেই অধিক হারে বিকাশ লাভ করেছিল। এই ধারা পরবর্তী দশকগুলোতেও অব্যাহত ছিল।

ছোট জমিদার, জোতদার এবং ধনী কৃষকদের ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণি বলা যায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষক এবং বর্গাদার কৃষক শ্রেণিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।[৩৪] ভূমি নির্ভর এই সামাজিক গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত এই সমাজ কৃষির উন্নতিতে কোন পুঁজি বিনিয়োগ করেনি। ব্রিটিশ আমলে এদেশে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি না হওয়ায় উনিশ শতকের মধ্যভাগে এদেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামবাসী ও কৃষি নির্ভর হয়ে রইল। এসময় মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা বাড়ল, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটল, অথচ জমি থেকে এসময় আয় কমে আসে যার ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের শেষদিকে এদেশের ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্তদের বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ফলে উনিশ শতকের শেষ দিকে শিক্ষিত ও পেশাদারি বাঙালি মধ্যবিত্ত ক্রমশ ভূমি থেকে সরে আসতে থাকে। এসময় সরকারি কর্মচারীদের মাত্র ৭%, উকিলদের ১০%, শিক্ষকদের ১০% এবং কবি সাহিত্যিকদের ১% এর জমি ছিল। এদের বেশির ভাগ ইংরেজি শিক্ষা ও চাকরিকে জীবন ধারণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন।[৩৫] বাংলার ভূমি নির্ভর মধ্যবিত্ত লেখাপড়া শিখে চাকরি লাভের উদ্দেশ্যে শহরে গিয়ে ভিড় করতে থাকে। এরা হল বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রথম প্রজন্ম।

বাংলাদেশে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এদেশে বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের বিকাশ দ্রুত হতে থাকে। অবশ্য কোম্পানির প্রশাসনিক নীতিও এক্ষেত্রে অনেকখানি সহায়ক হয়। ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের আওতায় বাঙলার বণিক, মুৎসুদ্দি, দালাল ও শিল্পোদযোগী পুঁজিপতিরা ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া শ্রেণীতে পরিণত হন।[৩৬] বাংলায়

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন বেশ আকর্ষণীয় জীবিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই সময়ে কিছু ব্যক্তি বাণিজ্যিক অথবা ব্যাংকিং সংস্থার এজেন্ট হিসেবে ব্যবসায় বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়। এরাই বাংলার আধুনিক বাণিজ্যিক ও অন্যান্য মধ্যবিত্তের পূর্বপুরুষ।

বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতির দেশ থেকে আগত বণিক সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে বাংলার অর্থনীতিতে পরিবর্তন সূচিত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল।[৩৭] বাংলায় ইউরোপীয় কোম্পানির বাণিজ্যের উপযোগী বিশাল ও উন্নত বাজার ছিল। এসময় বাংলার অন্তর্বাণিজ্যের বাজার ছিল দুই ধরনের, যথা – স্থানীয় ও আমদানি-রপ্তানি। এদেশীয়দের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া ইউরোপীয়দের পক্ষে এদেশে আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। কোম্পানির কর্মচারীরা আমদানি-রপ্তানি পণ্য ছাড়াও অভ্যন্তরীণ বাজারে ভোগ্যপণ্য বেচা কেনায় অংশ নিত। এজন্য তাদের দালাল, পাইকার, গোমস্তা, সরকার, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ানদের দরকার হত। এই কর্মযজ্ঞের সাথে শুধু বাঙালি হিন্দুরাই জড়িত হয়। ফলে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যে বাণিজ্য ও শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত বাংলায় গড়ে উঠে তাদের বেশির ভাগ ছিল বাঙালি হিন্দু।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও বাঙালি মুসলমান সমাজ পিছিয়ে ছিল। কলকাতায় বাণিজ্য নির্ভর শ্রেণির মধ্যে কিছু মুসলমান থাকলেও তাঁরা অবাঙালি ছিল। মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় বেশি হলেও বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে এর প্রতিফলন নেই। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালি বণিক ও মহাজনদের মধ্যে নবকৃষ্ণ দেব (শোভাবাজার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা), কৃষ্ণকান্ত নন্দী (কাশিমবাজার রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা), মদনমোহন দত্ত (হাটখোলা দত্ত পরিবার) ও রামদুলাল দে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করেন। ইউরোপীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে পশ্চিমী শ্বেতকায়দের সঙ্গে এদেশীয় মুসলমানদের সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। রাজশক্তির অহমিকা মুসলমানদের গ্রাস করেছিল। অপরদিকে মুসলমানদের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও লেনদেন বিরোধ তাদের সামগ্রিক বাণিজ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে ভেবে ইউরোপীয়রাও মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ঐতিহাসিক গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়ার

মতে, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, প্রধান প্রধান পণ্যের বাণিজ্যিকীরণ, পুঁজি যোগান, কাগজের টাকার প্রচলন ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে বাংলায় বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ঘটে।[৩৮]

ব্রিটিশদের ব্যবসায় বাণিজ্য ও কোম্পানিতে নিয়োজিত গোমস্তা, মুনিব, শারফ, বৈশ্য, বানিয়া, পাইকার, দালাল, সরকার ইত্যাদি বিচিত্র নামধারী এজেন্ট বা ব্রোকারদের কে ব্রিটিশরা নির্বিচারে গোমস্তা বা বানিয়া নামে আখ্যায়িত করত।[৩৯] নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রি.) এবং নবাব মীর কাশিমের (১৭৬০-৬৪ খ্রি.) পতনে এবং ইংরেজ বণিকদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে তারাই সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইংরেজরা প্রথমে এই শ্রেণির লোকদেরকে কারবারে ও কুঠিতে মূল্য আদান প্রদানের জন্য এবং পরে টাকা দাদন দেওয়া, পণ্য সংগ্রহ করা, কারিগরদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, পরিবহনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত করত। ড. ফ্রেয়ার তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি বলত এবং সামান্য মজুরির বিনিময়ে বিদেশিদের কাজ করে দিত।[৪০] ইংরেজ বণিকদের সহকারী হয়ে কাজ করত আরও একটি শ্রেণি, যারা শারফ বা পোদ্দার নামে পরিচিত ছিল। টাকা আদান প্রদান ও ঋণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি তাদের কাজ ছিল।[৪১] অন্য একটি শ্রেণির নাম ছিল পাইকার। এরা টাকা দাদন নিয়ে সরাসরি তাঁতি বা শিল্পীদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে কোম্পানির আড়ৎ এ সরবরাহ করত। এছাড়াও ছিল বিভিন্ন পাইকার, দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি, শারফ ও দোভাষীরাই ছিল এদেশের ইংরেজদের বাণিজ্যিক যোগসূত্র। এরা কোম্পানির বেনামে পৃথক বাণিজ্য করে প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিল। ইংরেজ সরকারের কল্যাণে এই সকল দালাল ও পাইকাররা ব্যবসায়ীর মর্যাদা লাভ করে এবং প্রচুর অর্থের মালিক হবার সুবাদে তাদের সামাজিক মর্যাদাও বেড়ে যায়। ইতিমধ্যে তারা ইংরেজদের সাথে ব্যবসায়ের অংশিদারিত্বও লাভ করে। তাদের অনেকেই ভূমি ও জমিদারিতে অর্থ বিনিয়োগ করে।[৪২]

এজেন্ট অথবা ব্রোকারগণ ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। এদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি উপার্জিত অর্থ ছোট ছোট জমিদারি ক্রয়ে ব্যয় করতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসা

Dhaka University Institutional Repository

প্রসারেও মনোযোগ দেন। ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তৃতির সাথে সাথে বাঙালি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আঠার শতকের শেষ দিকে কলকাতায় বসবাসরত ব্যবসায়ীর সংখ্যাও দ্রুত বাড়তে থাকে। এরা নিজেরা ব্যবসা করত আবার অনেকে ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করত। এসময় আন্তঃশুল্ক বিলোপের ফলে এবং অন্য ইউরোপীয়দের এদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার কারণে স্থানীয় বাঙালি ব্যবসায়ী গোমস্তা ও এজেন্টদের নিশ্চিত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ করে বাঙালি ছাড়া আর কোন ভারতীয়দের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ না দেয়ার নীতি বাঙালি মধ্যবিত্তের সামনে এক বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। সে সাথে কোম্পানির স্বার্থে বাণিজ্যিক পণ্য যেমন নীল, চা, আফিম, রেশম, চিনি ও কফি চাষাবাদের কাজে বহু আমলা, দেওয়ান, গোমস্তা নিয়োগ করা হত। তারা বেতন ও দস্তুরি ছাড়াও নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করত।[৪৩]

এ সময় ইংরেজ এজেন্সি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা, অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রয়োগ ও প্রসার ইত্যাদি নানা কারণেও ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ সম্ভব হয়। এছাড়াও ব্রিটিশ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য অভ্যন্তরীণ নানা বিষয়ে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, জলপথ, সেচ প্রণালী, রাজস্ব বিধি আইন আদালত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বাণিজ্য, শিল্প এমনকি বিচার বিভাগের কাজের জন্যও ব্রিটিশরা এদেশীয় বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তশ্রেণির শরণাপন্ন হত।[৪৪] এক কথায় এদেশীয় দালাল, পাইকার, গোমস্তা, সরকার, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ানরা ছিল ইউরোপীয়দের 'ফ্রেন্ড, ফিলজফার এ্যান্ড গাইড'।[৪৫] ভারতীয় সমাজ, জনজীবন, রীতিনীতি ও বিধিবিধান সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা তারাই ইংরেজদের সরবরাহ করত এবং শাসনকার্যের ব্যাপারেও ইংরেজ সরকার তাদের উপর নির্ভর করত। এই স্বার্থ সংরক্ষণ নীতিই এদেশে ইংরেজ ও বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তশ্রেণিকে অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ট করে তুলেছিল।

বাঙালি বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা ও বিকাশে শাসকদের গৃহীত সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদি ছাড়াও অনেক সংস্থা সহায়তা করে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা ট্রেড এ্যাসোসিয়েশন, ১৮৩৪ সালে স্থাপিত কলকাতা চেম্বার অব কমার্স এবং ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত নীলকর সমিতি ইত্যাদি। ১৮৩৩ সালে ইংরেজ কোম্পানির

Dhaka University Institutional Repository

একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলুপ্তি এদেশের বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের বিকাশে সহায়তা করে।[৪৬] ১৭৫৭-১৮৫৭ সালের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তশ্রেণির সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ শাসনামলে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, প্রধান প্রধান পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, পুঁজির যোগান, কাগুজে মুদ্রার প্রচলন, বাণিজ্যিক প্রশাসনের দক্ষতা ও কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি, সরকারের ওপর বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বাংলার বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই ইংরেজ কোম্পানি বাংলার কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। এর ফলে ইংল্যান্ডের সাথে এদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। কারণ শিল্প বিপ্লবের পর ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বাজারে বাংলার শিল্প পণ্যের (সূতী ও রেশম বস্ত্র) চাহিদা কমে যায়। ফলে কোম্পানি ইংল্যান্ডের শিল্পপণ্য এদেশে বিক্রির জন্য এদেশ থেকে কাঁচামাল – রেশম, চিনি, পাট, নীল, আফিম, তামাক, তৈলবীজ, কার্পাস প্রভৃতি রপ্তানিতে উৎসাহ দেয়। বিশ শতকের প্রথম দশকে ভারতের অন্যান্য প্রেসিডেন্সি অপেক্ষা বাংলায় রপ্তানি উদ্বৃত্ত ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে বাংলার কৃষিজ পণ্য প্রচুর পরিমাণে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে পাঠানোর ফলে এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদেশিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এই বিশাল পরিমাণ রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ ও গুদামজাত করা এবং আমদানি পণ্য বিক্রি করার জন্য বহু সংখ্যক বেনিয়ান, গোমস্তা, সরকার, পাইকার, দালাল, বেপারি ও আড়তদারের প্রয়োজন হত। সুতরাং বলা যায় যে, এই বিশাল বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য কলকাতা ও বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের তাঁরা ছিলেন প্রাণ পুরুষ।

ব্রিটিশ বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এদেশে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত একটি নতুন বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়।[৪৭] শিক্ষা সম্প্রসারণের দ্বারা বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণি সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল মোটামুটি তিনটি – সরকারি, বেসরকারি অফিস সমূহে কর্মচারীর চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক ও খ্রিস্টধর্ম প্রচার। এখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞান বিজ্ঞানের মোহমুগ্ধ এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ইংরেজ স্তাবকের সৃষ্টি করা যারা আপন স্বার্থেই ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব সাধনে প্রধান সহায়ক হবে।

ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কলকাতায়ই প্রথম চাকুরীজীবী তথা পেশাজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই শিক্ষিত (পেশাজীবী) মধ্যবিত্তশ্রেণি বলতে মূলত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং তাদেরই সৃষ্ট স্বীকৃত পেশা সমূহে নিয়োজিত সম্প্রদায়কে বোঝায়। এই শিক্ষিত শ্রেণিটি মানসিক গঠনে, নৈতিকতায়, মূল্যবোধে, জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও দর্শনে এবং জাতীয়তাবোধে অন্যান্য মধ্যবিত্তশ্রেণির চেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এদেশে যে শিক্ষিত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জন্য সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়। এদেশে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করে ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের পক্ষে সর্বপ্রথম ওকালতি করেন ইংরেজ সিভিলিয়ান চার্লস গ্রান্ট (১৭৪৬-১৮২৩ খ্রি.)। তার মতে, এদেশের সর্বব্যাপী ঘন জ্ঞানান্ধকার শিক্ষা বিস্তারে, এবং একমাত্র ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারেই দূর করা সম্ভব।[৪৮] কিন্তু তার এ আবেদন বিলেতী কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেনি। পরবর্তীতে খ্রিস্টান মিশনারিদের মাধ্যমে এদেশে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয়। কলকাতার বিশিষ্ট মুসলমানদের অনুরোধে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেও সেখানকার পাঠ্যসূচিতে ইংরেজি ছিল না। ১৭৯২ সালে বেনারসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বানিয়ান ও সরকারি কর্মচারীদের প্রয়োজন মত বেসরকারিভাবে ইংরেজি শিখানো হত। প্রাথমিক অবস্থায় প্রচলিত কিছু ইংরেজি শব্দ জানা থাকলেই ইংরেজি শিক্ষিত হিসেবে কদর করা হত। এই রপ্ত করা ইংরেজি শব্দই অর্থ বিত্ত অর্জনের উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় নতুন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বিত্ত ও বিদ্যা উভয়ই সামাজিক মর্যাদার জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। মূলত অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য এদেশে ও বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে আন্দোলন গড়ে ওঠে। কলকাতা ও তার আশেপাশে বেসরকারি উদ্যোগে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিক হতেই বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক প্লাবন এসেছিল। এসময়

Dhaka University Institutional Repository

সকলেই ইংরেজি পড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এসময় কলকাতার শহরতলী অঞ্চলে ইংরেজি শিক্ষার দাবী অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল।

১৮১৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। এ কলেজটি বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখান থেকেই নব্য বাংলার প্রধান নেতারা ছাত্র হিসেবে পাশ করেন এবং পরবর্তীকালে বাংলায় নবজাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ১৮১৮ খ্রি. কলকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এ সোসাইটি কতগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। কলকাতার বাইরের জেলাগুলোতেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হতে থাকে। বাংলার জমিদারেরা বিভিন্ন জেলায় কতগুলো ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। এভাবে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই খ্রিস্টীয় মিশনারি এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৮২৩ সালে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' গঠিত হয়। তবে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ১৮৩৩ সালের এ্যাক্ট। এর ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়। এসময় ব্রিটিশ সরকার নিজ স্বার্থেই ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বাড়াতে একে সরকারি ভাষার মর্যাদা দানের ব্যাপারে চিন্তা করে। এর ধারাবাহিকতায় গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল সদস্য লর্ড মেকলে তার প্রতিবেদনে বলেন যে, এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের মাধ্যমে এমন একটি শ্রেণির সৃষ্টি হবে যারা রক্তে ও রঙে ভারতীয় হলেও রুচি, মূল্যবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।[৪৯] লর্ড মেকলের এই উক্তিই আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভবের পূর্বাভাস বলা যায়। এভাবে ইংরেজি শিক্ষার বোধন হয়েছিল প্রধানত রাজনৈতিক গরজে এবং নগরবাসী একটিমাত্র শ্রেণির মঙ্গল বিধানে। বাস্তবপক্ষে ইংরেজি শিক্ষাই হল এদেশীয়দের সরকারি অফিস আদালতে চাকুরী লাভের একমাত্র পাসপোর্ট, আর এ জন্য এ ভাষাটির শিক্ষা হয় দ্রুত, নিশ্চিত ও সর্বব্যাপক। একমাত্র মধ্যবিত্ত ভদ্র সমাজেই তা সীমিত করা হয়েছিল। আবার ইংরেজি শিক্ষার সমস্ত সুযোগ সুবিধা মধ্যবিত্তশ্রেণির হিন্দুরাই আত্মসাৎ করল, দেশকে পাশ্চাত্যকরণের এই অনুপ্রবেশ যুদ্ধে মেকলেপন্থীরাই জয়ী হয়েছিলেন।[৫০] তবে লর্ড মেকলের মনোভাব সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মত প্রকাশ করেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

> তার (লর্ড মেকলে) উদ্দেশ্যের আংশিক সফল হয়েছে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি দোভাষী শ্রেণি বিকাশের মধ্যে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার কোন আদর্শ, যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক হিউম্যানিজম কোন কিছুই, শেষ পর্যন্ত স্থায়ী ও ব্যাপকভাবে বাঙালি বা ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের চরিত্রে বাসা বাঁধতে পারেনি। তার প্রধান কারণ দেশের জলবায়ু মাটির গুণ বদলায়নি। পাশ্চাত্য আদর্শের বীজ ছড়ানো হয়েছে এদেশের বর্ধিষ্ণু নাগরিক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। কেবল বীজের গুণে প্রথমদিকে উনিশ শতকে তার কয়েকটি বিস্ময়কর অঙ্কুরোদগমে আমরা ধাধিয়ে গিয়েছি। তথাকথিত নবজাগরণের সেই তরঙ্গের জোয়ার আসবে ভবিষ্যতে কিন্তু তাও আসেনি। কারণ পুরনো মাটিতে নতুন বীজের পরিপূর্ণ উদ্গম সম্ভব হয়নি। সমাজের আর্থিক স্তরের মৌল কাঠামো খানিকটা বদলেছিল ঠিকই। সমাজের গড়নও কিছুটা বদলেছিল কিন্তু মধ্যপথেই এই পুরাতনের ভাঙন এবং নতুনের গড়নের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অঙ্কুরেই তাই পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ ও নীতি শুকিয়ে যায়।[৫১]

লর্ড বেন্টিঙ্ক এর সময় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৩৭ সালে সরকারি অফিস আদালতে ইংরেজি ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশে সরকারি চাকুরির জন্য যোগ্যতা হিসেবে ইংরেজি শিক্ষাকে প্রকারান্তরে বাধ্যতামূলক করেন। এর ফলে এ দেশীয় লোকেদের মধ্যে ইংরেজির জন্য আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

ইংরেজদের আগমনের পর এদেশে তাদের যে সহযোগী শ্রেণি গড়ে ওঠে তারা ইংরেজি শিক্ষা লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। বিশেষ করে সরকারি চাকরি, ব্যবসায়ী কাজকর্ম এর প্রয়োজনে বাঙালি হিন্দুরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে অগ্রসর হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যাও বেশি ছিল। আর্থিক সামর্থ্য ও ইংরেজির প্রতি আগ্রহ দুটি বিষয়ই এখানে কাজ করেছিল। ফলে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকেই সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দুদের দ্রুত উন্নতি হয়। ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় বাঙালি হিন্দুরা এ শিক্ষাব্যবস্থায় ও শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা বজায় রাখে যা বিদ্যমান ছিল ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও উপযোগী ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। এ লক্ষে স্থানীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সরকারি শিক্ষা ব্যয়ের সবটাই আধুনিক ও ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় হতে থাকে।[৫২] অবশ্য সমাজের সকল স্তরে শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা থাকলেও বাস্তবে তা নগরবাসী উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির মধ্যে সীমিত থাকে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং নগরের বাইরে জনগণের জন্য এ শিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যও আধুনিক শিক্ষা ছিল অধরা। কারণ এই শিক্ষা ব্যবস্থা আর্থিকভাবে অসচ্ছল মুসলমানদের অনুকূলে ছিল না।[৫৩] এ সুযোগে হিন্দুরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এদেশের সকল পেশায় অধিকহারে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মাধ্যমেই পেশাজীবী মধ্যবিত্ত হিসেবে তারা নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে নেয়।

ঔপনিবেশিক যুগে স্বাধীন পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় আইনজীবী ও চিকিৎসকের পেশা। ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট সহ বিভিন্ন আদালত স্থাপিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিনীতির কারণে আইন পেশা ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৮৪৬ সালে আইন পেশা সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ১৮৩৭ সালে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি স্বীকৃত হলে শিক্ষিত হিন্দুরা পেশার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ ১৮৫৬ সালে রাজস্ব বিভাগীয় ৩৩৬ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ৫৪ জন মুসলমান, ৯ জন খ্রিস্টান এবং বাকি সকলেই হিন্দু।[৫৪] ইংরেজ শাসনে শিক্ষক সমাজ অবহেলিত হলেও তারা মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ সময় থেকেই সাংবাদিকতা, কবি-সাহিত্যিক পেশার সূচনা হয়। মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এ সকল পেশার কাজকে আরও বিস্তৃত করে। সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে।

ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল কেরানী তৈরি করা। এসময় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যুবক শুধু সরকারি বা বেসরকারি অফিসে চাকরির প্রতি আগ্রহ দেখাত। 'সরকারি চাকুরে' সার্থক পেশাদারি মানুষ বা ধনবান বণিকের চেয়ে সমাজে বেশি মর্যাদা পেতেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এ এক অদ্ভুত অচিন্তনীয় পরিবর্তন।[৫৫] যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা

Dhaka University Institutional Repository

বই ও পত্রিকা প্রকাশ করে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে সহায়তা করেন তাঁদের মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে এক ধরণের মানসিক জাগরণ তৈরি হয়। বাংলাদেশে উনিশ শতকের ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি। তাদের ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রেরণার মধ্যে নিশ্চয় পার্থক্য ছিল, এমনকি ইংরেজি শিক্ষিত একাংশের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামীও কম ছিল না।[৫৬] তা সত্ত্বেও একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের সব পথ প্রদর্শক ও পরবর্তী সব নেতাই বঙ্গীয় সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে থেকেই এসেছিলেন।

বাংলায় আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ফলে শিক্ষিত চাকুরীজীবী ও পেশাজীবী মধ্যবিত্তশ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিল্প ক্ষেত্রে এই শ্রেণির আগমন ঘটে বেশ দেরিতে। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে শ্রমশিল্পের প্রসারের সাথে সাথে ধীরে ধীরে বণিক, মুৎসুদ্দি, দালাল, জমিব্যবসায়ী থেকে শিল্পোদ্যোগী পুঁজিপতি পর্যন্ত ঔপনিবেশিক বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ হয়েছে। তবে বাংলায় শিল্পভিত্তিক আধুনিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে অত্যন্ত ধীর গতিতে। এর অন্যতম কারণ হল এদেশীয়দের মধ্যে শিল্প সৃষ্টি ও শিল্প স্থাপন ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ বিরোধী মনোভাব। ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ব্যাংকাররা শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় এক্ষেত্রে তেমন একটা এগিয়ে আসেনি। এছাড়া এসময়ে যন্ত্র ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রয়াস বাংলায় তেমন চোখে পড়েনি এবং শিল্প সৃষ্টিতে যে পরিমাণ অর্থ, সাধনা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা এদেশবাসীর আয়ত্তে ছিল না।[৫৭]

বস্তুত সরকারি শিল্পনীতি ও বাণিজ্য নীতির কারণেই স্বদেশী বণিক ব্যবসায়িদের পক্ষে শিল্প পুঁজি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেও সময় লেগেছে। ফলে শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্তের বিকাশ ব্যাহত হয়। ব্রিটিশ সরকার এদেশে প্রযুক্তিবিদ, কারিগর তৈরির দিকে মনোযোগ না দেয়ায় স্বল্পসংখ্যক বাঙালিরা করণিক, জুনিয়র সুপারভাইজার ও ফোরম্যান হিসেবে শিল্পে নিয়োগ পেত। এসময় বাংলার জমিদার, দেশপ্রেমিক ও মিশনারীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'টেকনিক্যাল স্কুল' স্থাপন করে এদেশীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে শিল্প

কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলনের নীতি গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধি পরগাছাধর্মী শিল্পভিত্তিক বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত কিছু পরিমাণে বিকশিত হলেও তাদের আনুপাতিক হার ছিল কম। এছাড়া হিন্দু বা মুসলমান উচ্চশ্রেণির কাছে শিল্পকর্ম সম্মানজনক পেশা বলে বিবেচিত না হওয়ায় শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত লোকজন ছিল হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নিচু শ্রেণির। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এদেশে শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভবে ধীরগতি দেখা যায়।

অবশ্য স্বদেশী আন্দোলনের সময়কালে (১৯০৫-১৯১১ খ্রি.) এদেশীয় বুদ্ধিজীবী ও দেশবরেণ্য নেতারা শিল্প স্থাপন ও প্রসারে এগিয়ে আসেন। এসময় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বাংলায় নতুন নতুন কিছু শিল্প গড়েও উঠেছিল। তবে পুঁজি এবং শিল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞতার অভাবে তা সফল হয়নি।

উনিশ শতকে বঙ্গদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ শতকের প্রথম ভাগ হতে বঙ্গ দেশে ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কৃতির পুনর্গঠনকল্পে কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে এক ধরণের গভীর আন্দোলন আরম্ভ হয় যার মাধ্যমে বঙ্গীয় সমাজের উচ্চ ও মধ্যস্তরের পুরাতন জীবনকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। বাঙালি হিন্দু ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার সৌন্দর্য ও শক্তির সন্ধান লাভ করল। এক নতুন শক্তি, নতুন কল্পনায় সে উদ্বুদ্ধ হল। হিন্দু মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, গোমস্তা ইত্যাদি শ্রেণির লোকের হাতে গেল অধিকাংশ জমিদারি আর ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের দখলে গেল ব্যবসা বাণিজ্য ও বড় বড় চাকুরী। তাঁরা এখন সরকারের সহায়ক শক্তি। তাই সরকার তাদের সমৃদ্ধি ও সন্তুষ্টি বিধানে অতীব যত্নশীল। উনিশ শতকের বাঙালি জীবন তাঁর এই নতুন জাগরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নতুন সৃষ্টির সন্ধানে তৎপর হল। আর মুসলমান সমাজ এখানে প্রায় অদৃশ্যই থাকল। এ নবজাগরণ আন্দোলনটিকে বাংলায় আধুনিক যুগের লেখকগণ ইউরোপীয় রেনেসাঁর অনুকরণে "বঙ্গীয় রেনেসাঁস" বলে চিহ্নিত করেছেন। বহুমুখী অগ্রগতির যে প্রচণ্ড গতিবেগ আর উদ্যমের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস, সেই গতিবেগ আর উদ্যম বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ছিল ম্রিয়মাণ। একটি বিদেশী আধা ঔপনিবেশিক শাসনের বাধাবাঁধনের আওতার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল এই আন্দোলন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার রেনেসাঁসের একটা নিজস্ব আপেক্ষিক মূল্য আছে। এ রেনেসাঁস আন্দোলনটি ছিল নগর কেন্দ্রিক এবং এটি পরিচালিত হয়েছিল জমিদার ও মধ্যশ্রেণি দ্বারা এবং এটি সীমাবদ্ধ ছিল জমিদার ও মধ্যশ্রেণি অধ্যুষিত কলকাতা ও অন্য কয়েকটি প্রধান শহরের মধ্যে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাথে এর মূল পার্থক্য ছিল যে, ইউরোপের রেনেসাঁস ছিল সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী ও বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক আন্দোলন। অন্যদিকে বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিল জমিদার ও মধ্যশ্রেণি অর্থাৎ ভূসম্পত্তির একচেটিয়া অধিকারীগণের আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ এবং ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর যোগ্য সহকারী ও সহায়করূপে কৃষক শোষণের অবাধ অধিকার অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে। বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলন ইউরোপের রেনেসাঁসের ন্যায় সমাজ কাঠামোর কোন পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়নি, বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ভূস্বামী শ্রেণির নিজ শোষণ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার এবং আরও শক্তিশালী করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং বঙ্গদেশের রেনেসাঁস আন্দোলন ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্রধর্মী। বঙ্গদেশের ভূস্বামী গোষ্ঠীর এই আত্মসংহতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকেই আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণির অন্তর্গত বুদ্ধিজীবী লেখকগণ ইউরোপের অনুকরণে "রেনেসাঁস" নামে অভিহিত করেছেন।[৫৮] মুসা আনসারীর মতে, উনিশ শতকের বাংলা অর্ধশতাব্দী পূর্বেই তার স্বাধীনতা হারিয়ে বসে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি তার আর্থ সামাজিক কাঠামো সুচিন্তিতভাবে সুনিয়ন্ত্রণ করে। তাই রেনেসাঁসের প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদান ছিল অনুপস্থিত।[৫৯] তবে এভাবে বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে বাতিল করে দেয়া যায় না। বাংলার নবজাগরণের অতি রঞ্জিত ছবি আঁকা অথবা তাঁকে তাচ্ছিল্যজ্ঞানে অস্বীকার করা এই দুই ই হল ঐতিহাসিক বাস্তব বিচার বিশ্লেষণ থেকে বিচ্যুতি। যুগ বিশেষের কীর্তি যেমন অসীম নয়, তাঁর আপেক্ষিক মূল্যটাও তা হলে অস্বীকার করা যায় না। উনিশ শতকের চিন্তা, কল্পনা, পরীক্ষা নিরীক্ষার স্বাধীনতা ও ইহলোকের তথা প্রকৃতির মধ্যে মানব জীবনের পরিপূর্ণতা অন্বেষা ইত্যাদি ইতালীয় রেনেসাঁসের ভাবার্থ যা বাংলার রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য ছিল। বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

রেনেসাঁস যদিও ইতালির রেনেসাঁর অনুরূপ হয়নি তথাপিও একে রেনেসাঁস বলে চিনতে অসুবিধা হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)*, বাংলা একাডেমী, ২০১২, পৃ.১৯০

২। B.B. Misra, *The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times*, Oxford University Press, Delhi, 1960, p.6

৩। আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পৃ.৫৭

৪। বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, পাঠভবন, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৬০, পৃ.১৬৭

৫। Julius Gould and William L. Kolt (eds.) *A Dictionary of Social Science*, Tavistock Publication, London, 1964, p.302 (উদ্ধৃত), আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯১

৬। *The New Illustrated Columbia Encyclopaedea*, Vol. 3, Columbia University Press, New York, 1978, p.207 (উদ্ধৃত), আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯১

৭। R. H. Gretton, *The English Middle Class* (1917), (ভূমিকা) (উদ্ধৃত), বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ.৬৩

৮। আবদুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬ খ্রি)*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৩৪

৯। বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, পৃ.১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

১০। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯২

১১। Max Weber, *Essays in Sociolosy* (Trans.) by H. H. Gerth and Wright Mills, Nutt, London, 1946, p.412

১২। আবদুর রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪

১৩। গোলাম হোসেন, *সিয়ার মুতাক্ষরীণ*, কলকাতা, ১৯০২, ৩খ, পৃ.১৯৩ ও ১৯৯

১৪। আবুল কাসেম ফজলুল হক, *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮, পৃ.৪৩

১৫। হাবিবুর রহমান, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র* , ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৩, পৃ.৫৫,৫৭

১৬। হাবিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৮-৩৯

১৭। B. B. Misra, *op.cit.*, p.06

১৮। A.K. Nazmul Karim, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh*, Nawroze Kitabistan, Dacca, 1976, p.97

১৯। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.০৪

২০। মিহির আচার্য, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা*, লেখক সমাবেশ, কলকাতা, জুলাই ১৯৩৫, পৃ.২২

২১। A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Book Depot, Bombay, 1948, p.160

Dhaka University Institutional Repository

২২। A.K. Nazmul Karim, *The Dynamics of Bangladesh*, Nawroze Kitabistan, Dacca, p.180

২৩। B. B. Misra, *op.cit.*, p.12-13

২৪। A.K. Nazmul Karim, *op.cit.,* p.98

২৫। B. B. Misra, *op.cit.*, p.12

২৬। Sunil Sen, *Agrariyan Relations In India*, New Delhi, 1979, p.10

২৭। আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৪

২৮। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.০৯

২৯। Radha Kamal Mukerjee, *Land Problems of India*, Longmans, Green & Co. Ltd, London, 1933, p.98

৩০। Sirajul Islam, *The Permanent Settlement in Bengal : A Study of its Operation (1790-1819),* Bangla Academy, Dacca, 1979, p.221

৩১। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০১

৩২। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭

৩৩। B. B. Misra, *op.cit.*, p.131

৩৪। গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge, 1963, p.55-57

৩৬। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, পৃ. ৫২-৫৩

৩৭। P.J. Marshall, "General Economic Conditions Under the East India Company", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971),* Vol-II (Economic History), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p.70

৩৮। গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

৩৯। আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫

৪০। আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

৪১। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৫

৪২। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৫

৪৩। আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

৪৪। অরবিন্দ পোদ্দার, *উনবিংশ শতাব্দীর পথিক*, পৃ. ১০ (উদ্ধৃত), আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

৪৫। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩

৪৬। B. B. Misra, *op.cit.*, p.69

৪৭। A.Mukherjee, *Reform and Regeneration in Bengal 1774-1823*, Calcutta, 1960, p.15

Dhaka University Institutional Repository

৪৮। আবদুল মওদুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

৪৯। বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, পৃ. ১৯৭

৫০। R.C. Majumdar, *An Advanced History of India*, Macmillan and Company Limited, Calcutta, 1950, p.818-819

৫১। বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মার্চ ১৯৪৮, পৃ.৫০

৫২। C.H. Phillips and M. Doreen, *Indian Society and African Studies*, Praaeger Publishers, London, 1976, p.34

৫৩। তাজুল ইসলাম হাশমী, *ঔপনিবেশিক বাঙলা*, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ.১০

৫৪। B.B. Misra, *op.cit.*, p.209

৫৫। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৪

৫৬। বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, পৃ.২২১

৫৭। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৭

৫৮। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ.১৫১

৫৯। মুসা আনসারী, *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৮, পৃ.২০৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিকাশ ও ভাবধারা

'রেনেসাঁস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল পুনর্জন্ম বা পুনর্জাগরন। খ্রিষ্টীয় পনের শতকে ইউরোপের নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় এবং সমকালীন ভাবজগতে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করে সেটাই রেনেসাঁস নামে পরিচিতি লাভ করে। ফরাসি ঐতিহাসিক মিশেলে সর্বপ্রথম 'র‍্যানেশাঁস' শব্দটি ব্যবহার করেন (১৮৫৫ খ্রি.)।[১] রেনেসাঁসের একদিকে ছিল প্রচণ্ড বিদ্রোহ, অন্যদিকে সম্মুখপানে ধাবমান হওয়ার আহ্বান।[২] তাদের বিদ্রোহ ছিল সমসাময়িক পারলৌকিক মানসিকতা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। রেনেসাঁস ছিল সামন্তযুগের অবক্ষয়ের আলামত এবং যুগ সন্ধিক্ষণের বার্তাবাহক। মধ্যযুগের ইউরোপের অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীনতা ও কুসংস্কারের অচলায়তন থেকে ইউরোপবাসীর চিন্তা ও মননশীলতার মুক্তি ছিল পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁসের প্রাণশক্তি। ব্যক্তির সার্বিক মুক্তি, প্রকৃতির বাস্তব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, অলৌকিক ও দৈব শক্তিতে বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, মানবতাবাদ প্রভৃতি ছিল পঞ্চদশ শতকের রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মূল লক্ষণ ছিল অনুসন্ধানী, যুক্তিবাদী, প্রশ্নকারী ও আত্মবিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গির জাগরণ।[৩] ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায়ের মতে, ইউরোপের রেনেসাঁস ছিল সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী-বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বে পরিচালিত বৈপ্লবিক আন্দোলন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইউরোপ জুড়ে যে যুগান্তকারী বৈপ্লবিক আন্দোলন চলেছিল, তাঁর অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি ধসে পড়েছিল, প্রতিক্রিয়াশীল ও ধ্বংসোন্মুখ সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে তৎকালের প্রগতিশীল ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় ঘোষিত হয়েছিল।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর (১৪৫৩ খ্রি.) সেখান থেকে গ্রীক ভাষা, সাহিত্য দর্শনের পণ্ডিতরা ইতালিতে চলে এলে এই রেনেসাঁস বা জাগৃতির উদ্ভব হয়। মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস, গীর্জাতন্ত্র ও কুসংস্কার থেকে ব্যক্তি মানসিকতার মুক্তি ঘটে। সাহিত্যে, শিল্পে, ভাস্কর্যে তার প্রকাশ ঘটে। আধুনিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের উদ্ভবের জন্য একটি বৌদ্ধিক পটভূমি এবং অনুকূল মননের সন্ধান করেন। অর্থাৎ এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ঐতিহাসিক পরিবর্তনে কোন আকস্মিকতা থাকে না বরং এক ধরণের ধারাবাহিকতা থাকে এবং সে পরিবর্তনটি হয় দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে।[৫] সুতরাং ঐতিহাসিক বর্ণনায় ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বিকাশের পূর্বেই নবম ও দ্বাদশ শতাব্দীর এক রেনেসাঁসের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেয়।

পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে এক নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমানদের ধ্বংসস্তূপের উপর জার্মান জাতির প্রতিষ্ঠা হয়ে হেলেনবাদের উত্থান ঘটে। রোমান সাম্রাজ্যের গ্রিক রোমান সাংস্কৃতিক পটভূমিতে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রভাবের ফলে যে হিব্রুবাদ প্রবেশ করেছিল এটি ছিল তাঁর বিপরীত। ফলে এ সময় থেকেই যুক্তিবাদ (হেলেনবাদ) ও শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের (হিব্রুবাদ) মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে। মধ্যযুগে এ চিন্তাধারাদ্বয়ের মধ্যকার বিরোধ প্রক্রিয়ার ফলেই রাষ্ট্র বনাম গির্জা দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশ ঘটেছিল। তবে একাদশ শতাব্দী হতে সামগ্রিক অবস্থার একটা পরিবর্তন দেখা যায়। এ সময় থেকে ধর্মের সাথে যুক্তিবাদের একটি সমন্বয় গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে এ সমন্বয়বাদ ভেঙে পড়ে এবং ধর্ম ও যুক্তি পৃথকভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। ডানস স্কটাস (১২৬৬-১৩০৮ খ্রি.) এবং উইলিয়াম ওয়াখাম (১২৮৫-১৩৪৭ খ্রি.) এ স্বতন্ত্রখাত প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয় যে, ওয়াখামের মৃত্যুর পর থেকে নব বিজ্ঞানের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালটি হল রেনেসাঁসের যুগ। এ সময়েই শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সাহিত্য সাধনার মধ্যদিয়ে সমগ্র ইউরোপে এক নতুন জীবন সাধনার সূত্রপাত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ শতকের আগে ইউরোপে নগর বিপ্লবের ফলে পশ্চিম ইউরোপ বিশেষত ইতালিতে এই নবজাগরণের বীজ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। প্রাচীন ধ্রুপদী গ্রীক, ল্যাটিন সাহিত্য ও দর্শন যা ছিল খ্রিষ্টপূর্ব প্যাগান বা পৌত্তলিক যুগের সৃষ্টি, যা মধ্যযুগে খ্রিষ্টীয় গির্জার প্রভাবে চাপা পড়ে যায়, তার ব্যাপক চর্চা আরম্ভ হয়। এই প্যাগান সংস্কৃতির বিজ্ঞান ও দর্শন চিন্তার প্রভাবে ইউরোপের মানসলোক নব ভাবধারায় উদ্ভাসিত হয়। মধ্যযুগের কুসংস্কার, আত্মবিশ্বাস, দৈবশক্তির উপর প্রগাঢ় আস্থা ত্যাগ করে লোকে যুক্তি, প্রমাণ ও বাস্তবতার ভিত্তিতে খোলা চোখে সবকিছু বিচার করতে শেখে। ধর্ম নিরপেক্ষতা, ইন্দ্রিয়বাদ, যুক্তিবাদ ও মানবতবাদ জনমানসকে আলোকিত করে। সাহিত্যে, শিল্পে এই নব ভাবের প্রকাশ দারুন ভাবে দেখা দেয়। এর সাথে আসে অনুসন্ধানী মনোবৃত্তি। তার ফলে বিজ্ঞান, গবেষণা ও ভৌগলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে দারুণ অগ্রগতি ঘটে। এর ফলশ্রুতিতে আধুনিক ইউরোপের জন্ম হয়।

রেনেসাঁসের প্রাথমিক বিকাশ ঘটে ইতালির স্বাধীন নগর সমূহে। ইতালির ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, পিসা, ভেনিস বা পদুয়া শহরগুলো ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের জন্মভূমি। এখানে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক ধরে রেনেসাঁসের ধারণা জন্মলাভ করে। রেনেসাঁসের প্রাথমিক বিকাশ ইতালির নগর সমূহে ঘটলেও সেখানেই এর স্থায়িত্ব আসেনি। বরং উনিশ শতকের পূর্বে রেনেসাঁসের মর্মবাণী এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে তা ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ এর পরবর্তীকালে ফ্রান্সে তাঁর পরিপুষ্টি সাধিত হয়। কিন্তু বাস্তবে ইংল্যান্ডে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীব্যাপী রেনেসাঁসের বিকাশ একটি পরিণতি লাভ করে। সমগ্র ইউরোপে সামন্ত যুগের অবক্ষয় এবং শহরাঞ্চলে নাগরিক অর্থনীতির বিকাশের মাধ্যমে এ পরিবর্তন শুরু হয়। ইউরোপীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামোর এরূপ রূপান্তরের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন আসে এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকট হতে থাকে। বাস্তব অবস্থায় বিরোধের ফলেই তাদের চিন্তাভাবনায় বিরোধ দেখা দেয় যার ধারাবাহিকতায় তারাই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আলোকে বিকিরণ করে।[৬] রেনেসাঁসের মাধ্যমে নতুন প্রাণের সূচনাকারীদের অন্যতম ছিলেন ফ্রান্সিসকো পেত্রাক (১৩০৪-৭৪ খ্রি.) এবং জিওভান্নি বোকাচ্চো (১৩১৩-৭৫ খ্রি.) তাঁরা মানুষকে নানা রূপে, নানা বর্ণে সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

উপজীব্য করে প্রথম পরিবেশন করেন। পরবর্তীতে রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০ খ্রি.), লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রি.), মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪ খ্রি.) প্রমূখ শিল্পীগন রূপ দিলেন ব্যাপক জীবনের নতুন ব্যাঞ্জনা, নানা কলাকৌশলে; নতুন রেখা ও বর্ণের প্রয়োগে। রেনেসাঁসের এই নেতৃত্ব গির্জার অনুশাসন হতে মুক্ত হয়ে মানবিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এই মানবতাবাদী জ্ঞান হল সেই সত্যের জ্ঞান যা সমগ্র মানব সমাজের জন্য প্রযোজ্য। এর মূলমন্ত্র হল ব্যক্তি মর্যাদা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, কুল কৌলীন্য নয়। এই নবজাগৃতি বর্তমান কর্ম চাঞ্চল্য, অতীতের দম্ভে আর ভবিষ্যতের স্পর্ধিত কল্পনায় মুখর হয়ে ওঠে। তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে পাণ্ডিত্যবাদী ও বন্ধ্যা বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদের বিদ্রোহ ছিল। এসময় বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন, মানবতার জয়গান ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের মহিমার প্রচারনাই মুখ্য ছিল।

রেনেসাঁস আন্দোলন ইতালিতে শুরু হয় তবে এখানে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই এর ভাবধারা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতালিতে এ আন্দোলন শুরু হয়ে মাত্র কয়েকটি শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটা সর্বসাধারনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ সামন্ততন্ত্র তখনও শক্তিশালী ছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল খুবই দুর্বল। তাছাড়া ষোড়শ শতকের শুরুতে অটোমান সাম্রাজ্য মিশর ও উত্তর আফ্রিকা জয় করলে ইতালীয় বণিক সমাজ প্রাচ্য দেশের বাণিজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এই বণিক বুর্জোয়াদের পতনের কারণে রেনেসাঁস আন্দোলনেরও পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে। ফ্রান্সে এ জাগরণের প্রথম বাহক ছিল রঁসা (১৫২৪-৮৫ খ্রি.), রেব্লে (১৪৯৪-১৫৫৩ খ্রি.) পরিচালিত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান। ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মঁতেঞ (Montaigne) (১৫৩৩-৯২ খ্রি.) সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি পরিহার করে মানবতার মর্যাদা তুলে ধরেন। অন্যদিকে স্পেনের সেরভান্টিসের (১৫৪৭-১৬১৩ খ্রি.) বিখ্যাত গ্রন্থ *ডন কুইকসোট* ছিল সামন্ত রীতিনীতির উপর প্রচণ্ড কষাঘাত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ইংল্যান্ড ব্যতীত আর কোথাও এই রেনেসাঁসের ভাবধারা বাস্তবরূপ লাভ করতে পারেনি। ইতালিতে রেনেসাঁস আন্দোলন শুরু হলেও নানা প্রতিবন্ধকতায় যখন তা ব্যর্থ হতে চলেছিল তখনই তাদের এই ভাবধারা প্রাপ্ত হয় ইংল্যান্ড। ঐতিহাসিকভাবেই এখানে সামন্তবাদের একচেটিয়াত্ব ছিল না। পরবর্তীতে ষোড়শ শতকের ইংল্যান্ডে এক নতুন

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ সামাজিক কাঠামো লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তখন থেকেই সামন্ত শক্তির ভাঙ্গনের পাশাপাশি নাগরিক অর্থনীতির বিকাশ দ্রুতগতিতে হতে থাকে। এক কথায় বলা যায়, এ সময়কালে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তগর্ভে মুদ্রা অর্থনীতির প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে টিউডর যুগে (১৪৮৫-১৬০৩ খ্রি.) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়ে নতুন সামাজিক গঠন প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়। এ যুগে ইংল্যান্ডের এই নতুন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে থাকায় মানুষের চিন্তা চেতনার রাজ্যও এ সময় প্রসারিত হতে থাকে। বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্যের সাথে যখন ইতালীয় রেনেসাঁস ভাবাদর্শ ও গ্রিক সাহিত্য, লাতিন ব্যাকরণ এদেশে আমদানি হয় তখনই মূলত তাদের সামনে সমগ্র হেলেনীয় জগৎ উন্মুক্ত হয়। প্লটাস (২৫৪-১৮৪ খ্রিস্টপূর্ব), সেনেকা (খ্রিস্টপূর্ব ০৪-৬৫ খ্রি.), প্লুটার্ক (৪৬-১২০ খ্রি.) সহ পেত্রাক, বোকাচ্চো, বান্দোল্লো (১৪৮০-১৫৬২ খ্রি.) ইংল্যান্ডের মানস পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করে। ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডে মনোবিপ্লব শুরু হয়। তবে তাদের নতুন জীবন দর্শনের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিল চারিদিকের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ। গির্জা ও ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের চিন্তা শক্তিকে মুক্তি দিতে প্রয়োজন হয় নতুন শিক্ষা সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। টিউডর বংশের রাজা ৮ম হেনরী (১৫০৯-৪৭ খ্রি.) নতুন শিক্ষা ও নবধর্মের আশায় এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে রোমের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে গড়ে তোলেন নিজেদের এ্যাংলিকান চার্চ। এভাবে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত বণিক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশে স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং রেনেসাঁসের ভাবাদর্শ দৃঢ়মূল হয়।[৭] ইংল্যান্ডের এই আর্থ সামাজিক পটভূমিতে যে নবজাগৃতির জোয়ার আসে তাতে গড়ে ওঠে এক বলিষ্ঠ জীবনবাদী নব সংস্কৃতি, এর রূপকার হলেন এডমুন্ড স্পেনসার (১৫৫২-৯৯ খ্রি.), ক্রিস্টোফার মার্লো (১৫৬৪-৯৩ খ্রি.), উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রি.), ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রি.) এবং আরও অনেকে।

বলা হয়ে থাকে রেনেসাঁস আন্দোলনের মাধ্যমে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান হয় এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ইউরোপের মধ্যযুগীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এভাবে চিহ্নিত করা যায় –

Dhaka University Institutional Repository

ক) চিন্তা ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাব।

খ) ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা, অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির প্রাধান্য।

গ) আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্তবাদ ও শ্রেণি বৈষম্য।

ঘ) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসনের প্রাধান্য।

অন্যদিকে প্রাক মধ্যযুগের অর্থাৎ প্রাচীন যুগের সভ্যতার যে দিকগুলো পনের শতকের ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের এবং নব গঠিত বুর্জোয়া শ্রেণির ধারকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল সেগুলো হল[৮] –

ক) অনুসন্ধিৎসু মনোভাবের জাগরণ।

খ) যুক্তির আলোকে সবকিছু গ্রহণ করার প্রবণতা অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ।

গ) সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহজাগতিকতা ও মানবতাবাদ অর্থাৎ মানবমুখীতার প্রাধান্য।

ঘ) রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সূচনা।

বাস্তব অর্থে ইতিহাসে কোন কিছুর পুনর্জন্ম না হলেও অতীত ইতিহাস হতে প্রেরণা লাভ করা যায় এবং সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। ফলে দেখা যায় যে, পনের শতকের রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে প্রাচীন গ্রীক বা রোমান সভ্যতাকে ফিরিয়ে আনা যায়নি সত্য, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে হাজার বছরের মধ্যযুগীয় সভ্যতার অবসান হয়েছে এবং যাকে বলা হয় আধুনিক সভ্যতা তার আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ ইউরোপের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ইহজাগতিকতা, মানবতাবাদ ও গণতন্ত্র, যার উৎস সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রিস্টপূর্ব), প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিস্টপূর্ব), এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব), এর যুগেই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় দেখা যায়। ইউরোপের পনের শতকের রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল সেটা পরিণতি লাভ করে

Dhaka University Institutional Repository

আঠার শতকের শেষের দিকের চিন্তাক্ষেত্রে দার্শনিক বিপ্লব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এবং এই প্রক্রিয়ার ফলেই গোড়াপত্তন হয় আধুনিক আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এবং সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবে নগরবাসী বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালির জীবন ও মানসে যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল বা পরিবর্তনের সপক্ষে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেটাই আমাদের সময়কালে 'বাংলার রেনেসাঁস' বা 'বাংলার নবজাগরণ' নামে আখ্যাত হয়ে এসেছে।[৯] উনবিংশ শতকের নবজাগরণকে ব্যাখ্যা করার জন্য রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) প্রথম 'রেনেসাঁস' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং তার ধারাবাহিকতায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রি.), অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রি.), বিপিন চন্দ্র পালও (১৮৫৮-১৯৩২ খ্রি.) তাদের লেখনির মাধ্যমে উক্ত সময়কে বাংলার জন্য রেনেসাঁস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১০] উনিশ শতকে বঙ্গীয় মানসলোকে নিঃসন্দেহে এক অভূতপূর্ব ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি হয়।[১১] অন্যান্য দেশের মত আমাদের বাংলাদেশের তথা সাড়া ভারতবর্ষের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে যে কিঞ্চিৎ গতিশীলতা ও প্রাণশক্তি ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সেই গতিশীলতা ও প্রাণশক্তির জোরেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগৃতি আন্দোলন উত্থান পতনের বন্ধুর পথে রাজা রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে, নতুন মনীষা, গঠন কুশলী, সমাজ সংস্কার ও সৃষ্টিশীল সাহিত্য শিল্প প্রতিভার বিকাশ হয়েছে।[১২]

স্যার যদুনাথ সরকার স্পষ্ট ও দ্বিধাহীনভাবে উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণকে রেনেসাঁস নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন যে, "কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর ইউরোপে যে রেনেসাঁ দেখা দেয়, উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণ ছিল তাঁর চেয়েও ব্যাপক, গভীর এবং অধিকতর বৈপ্লবিক। এই নবজাগরণ ছিল প্রকৃতই একটি রেনেসাঁস।"[১৩] অধ্যাপক সুশোভন চন্দ্র সরকার বিশ্লেষণী যুক্তির দ্বারা উনবিংশ শতকের নবজাগরণের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেও একে রেনেসাঁস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শাসন, বুর্জোয়া অর্থনীতি ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হয়। তার ফলে যে জাগরণ ঘটে তাকে সাধারণত রেনেসাঁস বলা হয়ে থাকে।"[১৪] তিনি আরও বলেন, "বাংলার নবজাগরণ, ভারতের নবজাগরণে যে ভূমিকা নেয় ইউরোপের রেনেসাঁসে ইতালির ভূমিকার সঙ্গে তা তুলনীয়।"[১৫]

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ হতে প্রথমে এককভাবে বিত্তশালী সম্প্রদায়ের দ্বারা এবং পরে স্বয়ং ইংরেজ শাসকগণের উদ্যোগে বঙ্গদেশে উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা প্রবর্তিত হয় তাতে বিত্তবান জমিদার ও মধ্যশ্রেণি ব্যতিত সমাজের অপর কোন শ্রেণির পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সে শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল শহরাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরবর্তীতে যে সকল সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলন শুরু হয় তাও কলকাতা ও বাংলার কয়েকটি প্রধান শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের যে সকল স্থানে এ শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বিস্তার ঘটে তা ছিল প্রধানত হিন্দু মধ্যশ্রেণি অধ্যুষিত অঞ্চল। অর্থাৎ এ কথা বলা যায় যে, শহর সীমার বাইরে এ আন্দোলনের প্রভাব খুব বেশী বিস্তৃত হয়নি। মূলত শহরবাসী বিত্তশালী সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থেই বঙ্গদেশের তথাকথিত রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি আন্দোলন আরম্ভ করে। বঙ্গীয় রেনেসাঁস সংক্রান্ত গবেষণাগুলো থেকেও এটা প্রতীয়মান হয় যে, এ রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক ছিলেন নগরবাসী ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা। সেই সময়ে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে একটা প্রচণ্ড জাগরণ ঘটেছিল, বহু ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল তাদের উদ্যম – তা অস্বীকার করার উপায় নেই। পোলার্ড বলেন, "নাগরিক জনতা ও মধ্যবিত্তশ্রেণি নবযুগের সক্রিয় শক্তি। যেখানে মধ্যবিত্তশ্রেণি গড়ে ওঠে না সেখানে রেনেসাঁস অথবা রিফরমেশন আন্দোলন হতে পারে না।"[১৬]

১৯৫১ সালের 'সেন্সাস' রিপোর্টে সংগৃহীত তথ্যসমূহের পর্যালোচনা করে 'সেন্সাস কমিশনার' শ্রী অশোক মিত্র যে ঐতিহাসিক সত্যে উপনীত হয়েছেন তা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের চরিত্র উদ্ঘাটনের পক্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

> "লক্ষ লক্ষ কৃষকের লুণ্ঠিত ধনবান এই ভূস্বামী শ্রেণিই শহরে নিয়ে আসল সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। তাদের মুখপাত্র ছিলেন 'রাজা' রামমোহন রায়। এই নব জাগরণকে অনেক সময় ভ্রম বশত 'রেনেসাঁস' বলা হয়ে থাকে। যে শ্রেণির লোক এটা হতে লাভবান হয়েছিল তারাই আদর করে এর নাম দিয়েছিল 'রেনেসাঁস'। যে শ্রেণির মধ্যে এই জাগরণ দেখা দিয়েছিল, তারই অনপনেয় ছাপ ছিল এই তথাকথিত 'রেনেসাঁসে'। এই জাগরণ এসেছিল প্রধানত শহরে এবং বেন্টিংক যাদের পরজীবী বলে অভিহিত করেছেন, সেই ভূস্বামী শ্রেণির মধ্যেই এটা ছিল সীমাবদ্ধ। এই মুৎসুদ্দি জমিদার গোষ্ঠীর অন্তরের কামনা ছিল গ্রাম হতে দূরবর্তী শহরে বসে শাসক গোষ্ঠীর গৌণ অংশীদার হওয়া। এটা ছিল 'রেনেসাঁসের' একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যটি পরিণতি লাভ করেছিল শাসক গোষ্ঠীর সাথে উক্ত পরজীবী জমিদার শ্রেণি ও ইংরেজ বণিকগণের মুৎসুদ্দিদের মৈত্রীর ভিতর দিয়ে।"[১৭]

লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী সময়ে নানা ঘটনা প্রবাহে প্রথম যুগের জমিদারী অবসান হয়ে এক নতুন জমিদার শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। এ বিত্তশালী জমিদার শ্রেণি বঙ্গদেশের নতুন অভিজাত শ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাদের নিকট হতে জমি ইজারা নিয়ে জোতদার বা তালুকদার নামধারী অধস্তন শ্রেণিটিও মধ্যশ্রেণি রূপে আবির্ভূত হয়ে অভিজাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়। এ শ্রেণিটি ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর কৃপায় অর্থনৈতিক প্রভুত্ব লাভ করলেও সামাজিক নেতৃত্ব তাদের ছিল না। এর মূল কারণ ছিল হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলতা এবং ব্রাহ্মণ সমাজের প্রভুত্ব। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পরিচালিত হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে নতুন অভিজাত শ্রেণিটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাদের আন্দোলনের ফলেই ব্রাহ্ম ধর্ম ও নব হিন্দুবাদ প্রবর্তিত হয়। এছাড়াও পাওয়া যায় সে সময়ের বঙ্গীয় সমাজকে উন্নততর করে তোলার বেশ কিছু অপরিহার্য উপাদান যেমন – নতুন ধরণের শিক্ষা সাহিত্য, সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতি, জাতীয়তাবাদের ধারণা ইত্যাদি। এ সকল সমাজ সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপই সমগ্রভাবে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুকরণে বঙ্গীয় রেনেসাঁস বা বাংলার নবজাগৃতি নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসকে বাঙালি বিদ্বানেরা পদ্ধতিগতভাবে চারটি পর্বে গড়ে তোলেন। প্রথমত, তাঁরা বাংলা গদ্যভাষা ও নতুন বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়ত,

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের স্বর্ণযুগ নামে আখ্যাত ধ্রুপদী যুগের পুনরাবিষ্কার করেন যার সঙ্গে রয়েছে গ্রিস ও রোমের গৌরবময় ঐশ্বর্যের সমতুল্যতা সনাক্তকরণ। তৃতীয়ত, ভারতীয় বিদ্বানেরা নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের দেওয়া প্রোটেস্ট্যান্ট রিফর্মেশন সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। চতুর্থত, বৈশ্বিক প্রগতি সম্পর্কে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধারণায় উপনীত হন, যার ওপর নির্ভরশীল ছিল তাঁদের প্রত্যাশা। এ কথা সত্য যে, এ নতুন প্রত্যাশার ধারায় তাঁরা অতীতকে পুনরুদ্ধার করতে অনাগ্রহী কিন্তু ভবিষ্যতের মধ্যে স্বর্ণযুগকে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিল।

উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় মূলত ২টি শ্রেণি ছিল – একটি হল ইংরেজ আশীর্বাদ পুষ্ট ভূস্বামী গোষ্ঠী এবং অপরটি কৃষক সম্প্রদায়। ভূস্বামী গোষ্ঠী জমিদার ও মধ্যশ্রেণি অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে সমাজে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এ সংগ্রামে মধ্যশ্রেণিই ছিল জমিদার গোষ্ঠীর প্রধান সহায়, প্রধান কার্যকরী শক্তি এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রধান কর্মীদল। রেনেসাঁস আন্দোলনের যা কিছু নতুন সৃষ্টি তার প্রায় সকলই এদের কীর্তি। মধ্যশ্রেণির মধ্যে একভাগ ছিল গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী। ভূমিস্বত্বই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। এরা কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীলও ছিল। মধ্যশ্রেণির অন্য অংশটি ছিল প্রধানত শহরবাসী। তালুকদারির আয় ছাড়াও এরা শহরের চাকুরীজীবী হিসেবে অর্থ উপার্জন করত। এরা বহুক্ষেত্রেই ছিল প্রগতিশীল। ফলে এই মধ্যশ্রেণির মাধ্যমে বঙ্গীয় রেনেসাঁসে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও প্রগতিশীলতা উভয়ই দেখা যায়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, ১৮৩০ সালের আগে এখানে পাঠ্যপুস্তক রচনাসহ ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি ও ছোট বড় কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭ খ্রি.) তার একটি বড় নিদর্শন। কলকাতার উচ্চশ্রেণির লোকেরা এটি গড়ে তোলেন। এটি ছিল তখন সমগ্র এশিয়ায় ইউরোপীয় আদলে উচ্চশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান।[১৮]

এ সময়ে কলকাতায় বাংলা ও ইংরেজিতে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা এবং বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। কলকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়। ক্রমশ বিদ্বজ্জনেরা আধুনিক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। সে সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার এবং ইউরোপীয় ঘটনাবলী ও জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দেন। এভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে সচেতনতা বেড়ে চলে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল বিভিন্ন রকম সভা ও সমিতি। অবশ্য অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হতে ইংরেজ শাসক বণিকরাই প্রথমে এ ধরণের সোসাইটি স্থাপন করতে শুরু করে। এরপর নবযুগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিত্তবান ও শিক্ষিত বাঙ্গালীরা উদ্যোগী হয়ে এ ধরণের সভা স্থাপন করতে শুরু করে। উনিশ শতকের গোঁড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত বড় বড় বিদ্বৎ সভাগুলির পরিচালক মণ্ডলীর সামাজিক শ্রেণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যারা বিদ্বান ও বিত্তবান দুই-ই, তারাই এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শশীপদ পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয় গোস্বামী, স্বামী বিবেকানন্দ, রমেশ দত্ত প্রমুখ ছিলেন বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজের মধ্যমণি; এরা সবাই ছিলেন এদেশের উচ্চবিত্ত, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির উৎস ছিল ভূমিস্বত্ত্ব, ভূমি খাজনা এবং ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য ও আস্থা।[১৯]

রাজা রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভা থেকে আরম্ভ করে গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন, ব্রাহ্ম সমাজ, তত্ত্ববোধিনী সভা, বেথুন সোসাইটি, সুহৃদ সমিতি, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, কেশব চন্দ্র সেনের Goodwill Fraternity ও সঙ্গত সভা প্রভৃতি সমস্ত বিদ্বৎসভায় এই উচ্চ শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরাই প্রাধান্য লাভ করেছেন। এই বিদ্বৎসভাগুলিই ছিল নবযুগের আদর্শ প্রচারের প্রধান প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যম এবং এইগুলির ভিতর দিয়েই বুদ্ধিজীবীরা সমাজের সর্বশ্রেণির মধ্যে তাদের নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতেন।[২০] তখন থেকেই আসল আদর্শ সংগ্রাম শুরু হয় এবং সেই আন্দোলন কলকাতা কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের শুরু মূলত ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। উন্নত ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা ও ইউরোপীয় বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল এ রেনেসাঁসের প্রগতিশীলতার উৎস। বিশেষত, খ্রিস্টান ধর্মের আদর্শের অনুকরণে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন, ইউরোপীয় সাহিত্য হতে নতুন সৃষ্টির প্রেরণা লাভ এবং ইউরোপীয় আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মত বঙ্গীয় সমাজের সংস্কার সাধন ছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের উদ্দেশ্য। ইংরেজ শাসনের অধীনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হতে উদ্ভূত অভিজাত শ্রেণিটি ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমেই যে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবর্তন করে এ প্রসঙ্গে আর. পি. দত্ত বলেন, "সাম্রাজ্যবাদী শাসন কার্যের দক্ষ পরিচালনার জন্য (ইংরেজ শাসকগণের দ্বারা ভারতবর্ষের উপর) যে শিক্ষা বাবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই এমনকি পীট-হেস্টিংস-ওয়েলিংটন প্রমুখ শাসকশ্রেণির স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিচালকবৃন্দের ভারত গ্রাস ও ভারত শোষণের ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধেও ইংল্যান্ডের জনসাধারণের সংগ্রামের ঐতিহ্য ও প্রেরণা এবং সেই সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মিল্টন-শেলী-বায়রনের সাহিত্য সম্ভারের বিপুল স্রোতের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।"[২১]

মধ্যযুগের তন্দ্রা, আত্মবিশ্বাস ও কুসংস্কার হতে যেমন রেনেসাঁসের গতিধারায় ইতালি প্রথম মুক্তির পথ দেখায়, তেমনি ভারতের মধ্যযুগের আত্মবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে উনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণ মুক্তির পথ নির্দেশ করে। ইতালির রেনেসাঁসে ধ্রুপদী সাহিত্য যথা গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের যে ব্যাপক চর্চা হয়, বাংলাতেও প্রাচ্যবাদীরা সেরূপ ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ও মধ্যযুগের ফার্সি সাহিত্যের চর্চা করে। ডেভিড কফের মতে, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল থেকেই প্রাচ্য বিদ্যায় অনুরাগী পণ্ডিতরা প্রাচ্য দেশীয় সাহিত্য ও দর্শনের চর্চার সূত্রপাত করেন। স্যার উইলিয়াম জোনস, ম্যাক্সমুলার, উইলসন প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে রাজা রামমোহন রায় এই প্রাচ্য বিদ্যার চর্চাকে বরণ করেন। তিনি নিজে বেদ ও উপনিষদের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করে প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনর্জীবন ঘটান। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে যে স্বাধীন, অনুসন্ধানী, যুক্তিবাদী মানসিকতা দেখা যায়, বাংলার ইয়ং বেঙ্গল এবং ডিরোজিও গোষ্ঠীর তীব্র যুক্তিবাদী দৃষ্টি ও প্রচলিত কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনে তা প্রতিফলিত হয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানবতাবাদ রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে বিকশিত হতে দেখা যায়। রেনেসাঁস প্রসূত যুক্তিবাদ ও বস্তুবাদ থেকে জন্মলাভ করে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়াস।

মূলত বাংলার নবজাগরণের বীজ ছিল মিশ্র, এতে কিছুটা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এবং কিছুটা পাশ্চাত্য বিশেষত ইংল্যান্ডের সংস্কৃতির মিশ্রণ বিদ্যমান। একটি বিদেশী শাসকের শৃঙ্খলিত শাসন ও তার সংস্কৃতির ছোঁয়ায় বাংলায় নবজাগরণ ঘটেছিল বলেই ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বিরাট গতিবেগ এবং প্রচণ্ড উদ্যম ও বিভিন্নমুখী সৃজনশীলতা বাংলার রেনেসাঁসে ছিল অনুপস্থিত।[২২] এসময় বাংলার নবজাগরণে দুটি পৃথক ধারার সমন্বয় দেখা যায়। প্রথমটি হল পাশ্চাত্যের উদারপন্থী ভাবধারা এবং দ্বিতীয়টি হল পুনরুজ্জীবনবাদী প্রাচ্যবাদ। প্রথম ভাবধারার প্রভাবে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও নারীমুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি ঘটে। এর ফলে সতীদাহ নিরোধ, বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার, বহুবিবাহ প্রথা বন্ধের চেষ্টা করা হয়। এসময় যুক্তির আলোকে প্রচলিত প্রথা ও আচারগুলো যাচাই করা হয়। মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলেই যুক্তিবাদের প্রসার ঘটে। আর যুক্তিবাদের সঙ্গে আসে মানবতাবাদ। দ্বিতীয় ধারা অনুযায়ী বলা হয় যে, সরকারি আইনের সাহায্যে সামাজিক কুসংস্কার ও কুপ্রথা রদ করার চেষ্টা ভুল নীতি। এ ধারার অনুসারীগণ ভারতের প্রাচীন সভ্যতার নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন। ইউরোপের সকল কিছুই শ্রেষ্ঠ এবং ভারতের সব কিছুই নিকৃষ্ট একথা তারা মানতেন না। সুশোভন সরকারের মতে, উনিশ শতকের বাংলায় পাশ্চাত্যবাদ ছিল অধিকতর প্রগতিশীল প্রবণতা। ইতিহাসগত বিচারে আমাদের এই 'নবজাগরণ' ঘটেছিল নতুনের প্রতি আকর্ষণের ফলেই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে অভিহিত করেছিলেন 'জাদুস্পর্শ' বলে।[২৩] ভারতীয় জাতি গড়ে তোলার ব্যাপারে পাশ্চাত্যবাদ অনেক বেশি উপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক, কেননা এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষভাবে মানুষকে মানুষের অধিকার দেয়, এর যুক্তিবাদ ধ্বংস করে পরিবর্তন বিরোধী ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামিকে, এর সামাজিক সংস্কারগুলো উজ্জ্বল করে তোলে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সম্ভাবনাকে। পাশ্চাত্যবাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলো আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ডেভিড কফের মতে, ইউরোপীয় প্রাচ্যবাদীরাই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দিক গুলিকে অনুসন্ধান করে প্রথমে তুলে ধরেন।[২৪] পরবর্তী সময়ে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ সে ধারাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন। পুনরুজ্জীবনবাদীদের একাংশ হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে এতই মোহগ্রস্ত ছিলেন যে, তারা ভারতীয় সভ্যতা বলতে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতাই বুঝতেন। মধ্যযুগের ভারতের মুসলমানদের সভ্যতা ও সমন্বয়কে তারা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। শেষ পর্যন্ত বাংলার নবজাগরণে একটি তৃতীয় ধারার উদ্ভব হয়, যাকে বলা যায় সমন্বয়বাদী ধারা। প্রাচীন যুগের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও যুক্তিসিদ্ধ তার সঙ্গে প্রতীচ্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের যা কিছু শ্রেষ্ঠ উভয়ের সমন্বয় দ্বারা বাংলা তথা ভারতের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথনির্দেশ ছিল এই সমন্বয়বাদী ধারার বৈশিষ্ট্য। মূলত এই সমন্বয়ের পথ ধরেই আধুনিক ভারত গড়ে উঠে। এই সমন্বয়বাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে সমন্বয়বাদ জীবন্তভাবে মূর্ত হয়। এমনকি বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ী চিন্তার পরিচয় জগদীশ চন্দ্র বসু ও প্রফুল্ল চন্দ্রের মধ্যে লক্ষণীয়। তারা একাধারে নিউটন ও ফ্যারাডের চিন্তাধারার সাথে হিন্দু বস্তুবাদী বিজ্ঞান যথা উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার তত্ত্বও গ্রহণ করেন। কার্যত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবধারার সমন্বয়ে গঠিত এই নবজাগরণকে তার নিজস্ব প্রকৃতির ওপর তার সমন্বয়বাদী চরিত্রের দ্বারাই বিচার করতে হবে।

অবশ্য বাঙালি বিদ্বানেরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে বঙ্গীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে প্রথম দিকে কিছুটা অনিশ্চিত ছিলেন। দুটি ভিন্ন ধরনের সভ্যতার যোগাযোগ ও সংঘাত এবং নবআবিষ্কৃত ঐতিহাসিক মাত্রা রেনেসাঁসের ধারণাকে গতিশীল করলেও তার মধ্যে একটি অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন রকম। একদিকে বাঙালি পণ্ডিতেরা প্রাচ্যবিদদের কাছ থেকে প্রথম অবহিত হন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে; অপরদিকে মিশনারিদের নিকট থেকে জেনেছেন প্রোটেস্ট্যান্টদের মনোভাব, যাঁরা ইতোমধ্যে ইউরোপের মধ্যযুগকে অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ দুটি ধারণা রেনেসাঁসের সৌষম্য মানবতাবাদ সম্পর্কে বাঙালিদের ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁরা সনাক্ত করেন, নেতিবাচক ঐতিহাসিক কারণে তাঁদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে; এবং এ ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্ভব, তাঁরা নিজেরা যার প্রতিনিধি।

বাংলার নবজাগরণের শুরুতে ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন বা নব্য বঙ্গ আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য প্যারীচাদ মিত্র এই গোষ্ঠীকে 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামেও অভিহিত করেন। বিনয় ঘোষ এদের পরিচয় সম্পর্কে বলেন, রামমোহনের যুগের উপান্তে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এই তরুণ দলের বিকাশ হয়। এরা সকলেই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং সেখানে ইংরেজি শিক্ষা লাভ করে নবযুগের পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে যিনি ছাত্রদের এই নবযুগ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি বাঙালি নন, একজন ইউরোপীয়, বয়সে প্রায় ছাত্রদের মত তরুণ, নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্র গোষ্ঠীর দীক্ষাগুরু ডিরোজিও ছিলেন বলে তাদের 'ডিরোজিয়ানও' বলা হত। 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে বাংলার যে তরুণদল ইতিহাসে সুপরিচিত, তাঁরা 'ডিরোজিয়ান'।[২৫]

উনবিংশ শতকের বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন চলে। এ আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ ইউরেশীয় পর্তুগিজ বংশীয় ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রি.) যুক্তিবাদী চিন্তা ও ইংরেজি সাহিত্যে দক্ষতার জন্য পরিচিত ছিলেন। ১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজে সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[২৬] তিনি নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর বাইরেও তার ছাত্রদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন। এসকল বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি তার ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদ, ন্যায় বিচারবোধ ও সর্বোপরি স্বদেশ হিতৈষণার বীজ রোপণ করেন। তিনি ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক বিষয়ে ছাত্রদের স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে যুক্তির আলোকে তার নিজ মত প্রকাশ করতেন। তাকে কেন্দ্র করে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তার প্রভাবেই তার অনুগামী ছাত্ররা হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাসকে তীব্র আক্রমণ করেন। ডিরোজিও তার ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদ স্ফুরণের জন্য একাডেমিক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পৌত্তলিকতা, পুরোহিত তন্ত্র ও সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

কুসংস্কার সম্পর্কে স্বাধীন ও খোলামেলা আলোচনা ও বিতর্ক হত। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ভল্টেয়ার, হিউম, লক, টমাস পেইনের রচনা থেকে উজ্জীবিত হয়ে হিন্দু সমাজের কু প্রথার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। এসময় তারা তাদের মতবাদ প্রকাশের জন্য কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এর মধ্যে ১৮৩০ খ্রি. প্রকাশিত পার্থেনন পত্রিকায় স্ত্রী শিক্ষার দাবী করা হয় ও সামাজিক কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

ডিরোজিওবাদীদের প্রভাব ক্রমে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়তে থাকলে কলকাতার রক্ষণশীল সমাজে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সংবাদ প্রভাকর ও সমাচার চন্দ্রিকার মতো পত্রিকাগুলো ইয়ং বেঙ্গলের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ডিরোজিওকে সব কিছুর জন্য দায়ী করা হয়। ১৮৩১ সালে তাঁকে হিন্দু কলেজ হতে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। এ বছরই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। তবে তিনি তার ছাত্রদের মনে যে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করেছিলেন তা নষ্ট হয়নি।[২৭] ডেভিড কফের মতে, তিনি ছিলেন ভারতের সক্রেটিস।[২৮]

প্রাথমিক উগ্রতা ত্যাগ করে পরবর্তী সময়ে এ গোষ্ঠী বাংলার নবজাগরণে গঠনমূলক অবদান রাখার চেষ্টা করে। এসময় ব্রিটিশ শাসনের কুফল ও অত্যাচার মূলক দিক সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচিত হয়। ১৮৪০ এর দশকে ধীরে ধীরে এ আন্দোলনের অবসান ঘটে তবে এর পরবর্তী প্রভাব ছিল ব্যাপক।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক পুরুষ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের এক মহান সংস্কারক। বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার রাধানগর গ্রামের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হলেও বাল্যকাল হতে তিনি গতানুগতিক সনাতনী শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়াও পরবর্তীতে তিনি হিন্দি ও বেশ কয়েকটি প্রাচ্যভাষা, যেমন সংস্কৃত, আরবি ও ফারসিতে উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ ভালভাবে আয়ত্ত করেন এবং মুসলমান পন্ডিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও আইনশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। আরবি ভাষার মাধ্যমে প্রাচীন

গ্রিক দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান যেমন অ্যারিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা ও ইউক্লিডের মূলনীতিসমূহের প্রাথমিক পর্যায়ের সাথে তার পরিচয় ঘটে। ফলে তিনি কিছুটা সমালোচনামূলক ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আত্মস্থ করেন। ইসলাম ও হিন্দুধর্মের শাস্ত্রসম্মত বিধানসমূহের তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং পারস্যের সুফি মরমিবাদী কবিদের কাব্যসমূহের সাথে তাঁর পরিচিতি ও সেই সাথে অ্যারিস্টোটলীয় যুক্তিবিদ্যা অল্প বয়সে তাঁকে সনাতন ধর্মসমূহের ব্যাপারে কিছুটা বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করে তোলে।

রামমোহনের প্রথম দিকের রচনাসমূহ ছিল আরবি ও ফারসি ভাষায়। তার গবেষণামূলক পুস্তিকা 'তুহফাতুল মুহাহহিদিনে' (১৮০৪ সালে প্রকাশিত) তিনি ঘোষণা করেন যে, 'কোন রকম পার্থক্য ব্যতিরেকে সকল ধর্মেই সচরাচর ভ্রান্ত মত পরিদৃষ্ট হয়,' এবং মত পোষণ করেন যে, কোন নবী, ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও প্রত্যাদেশের সাহায্য ছাড়াই নিজস্ব কর্মক্ষমতার মাধ্যমে সর্বজনীন সর্বোৎকৃষ্ট সত্তাকে অনুধাবন করা সম্ভব।[২৯] বস্তুত, তুহফাত প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে রামমোহন হিন্দুদের সনাতন প্রতিমা পূজা মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা হিন্দু প্রথা ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তিনি সমালোচনামুখর ছিলেন। কোম্পানি আমলের শুরুর দিকে তিনি কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সদর দীউয়ানি আদালতের সাথে যুক্ত নেতৃস্থানীয় ভারতীয় পন্ডিতদের সাথে পরিচিত হন। এছাড়াও তিনি ইউরোপীয় কর্মকর্তা ও বণিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন, যাঁদের অনেকেই উদারবাদী চিন্তা ও ফরাসি বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের সান্নিধ্যে এসেই মূলত তিনি সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হন।

১৮১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে রামমোহন কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন যার মাধ্যমে তাঁর জীবনের নতুন এক পর্ব শুরু হয়। এসময় তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি তাঁর জীবনকে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। তাঁর কলকাতা পৌঁছার এক বছরের মধ্যেই সমমনা ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে একটি একান্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।[৩০] শীঘ্রই তিনি তাঁর চারপাশে ছোট কিন্তু প্রভাবশালী একটি বন্ধুমহল গড়ে তুলতে সমর্থ হন। এ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয়ই। তাঁর ঘনিষ্ঠ ভারতীয়

বন্ধুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬ খ্রি.) ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-৮৬ খ্রি.)। তাঁরা দুজন ছিলেন নেতৃস্থানীয় ও সম্পদশালী জমিদার, যাঁদের ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সাথে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। যদিও তাঁরা ধর্মবিষয়ে রামমোহনের আমূল সংস্কারের ধারণাসমূহের সাথে পুরোপুরি একমত হননি, তবুও তারা সামাজিক সংস্কার সাধন ও পাশ্চত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টাকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেছেন।

রামমোহন রায় হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের এক মহান যুগের সূত্রপাত করেন। তিনি সতীদাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন, যার ফলে লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে বিশেষ আইনের মাধ্যমে এ প্রথা বন্ধের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রতিমা পূজাকেও দৃঢ়ভাবে বর্জন করেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ধর্ম এক সর্বজনীন ঈশ্বরের পূজা করতে নির্দেশ দেয়। ১৮২৮ সালে তিনি 'ব্রাহ্মসভা' (পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মসমাজ) প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১] এটি হিন্দু ধর্মের একটি নতুন শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারা মৌলিক হলেও তা ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। সংস্কারমূলক ও উদারবাদী ধারণা সমূহ প্রচারের জন্য তিনি ১৮২১ সালে 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একটি বাংলা সংবাদপত্র এবং ১৮২২ সালে 'মিরাত-উল-আখবার' নামে একটি ফারসি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উপমহাদেশে জাতীয় চেতনার উন্মেষেও তাঁর প্রভূত অবদান ছিল। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ ব্রিটিশ রাজ এর অনুগত ও সমর্থক ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, কালক্রমে ব্রিটিশ জনগণ তাদের নিজের দেশে যে রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তা পরবর্তীতে ব্রিটিশ ভূখন্ডসমূহের জনগণের জন্যও প্রসারিত হবে। ভারতীয় জনগণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণে তাঁরা ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং এর প্রতিবাদও করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ১৮২৩ সালে গভর্নর জেনারেল জন অ্যাডাম (১৮২৩-২৩ খ্রি.) যখন ভারতীয় প্রেসের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন, তখন তিনি ও তাঁর বন্ধুগণ 'প্রিভি কাউন্সিলে' স্মারকলিপি পেশ করে বলিষ্ঠভাবে এর প্রতিবাদ করেছিলেন।[৩২] আবার, রামমোহন ও তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৮২৬ সালের ভারতীয় জুরি আইনের নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক বৈষম্যমূলক ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতার হিন্দু ও মুসলমান

নাগরিকদের পক্ষে একটি স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাঠান। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের স্বার্থ বিরোধী সরকারের রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধেও তিনি ও তাঁর বন্ধুগণ গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের (১৮২৮-৩৫ খ্রি.) নিকট ১৮২৯ সালে আরেকটি আবেদনপত্র পেশ করেন।

প্রধানত রামমোহন রায়ের উদ্যোগেই বিদেশী সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদসমূহের মধ্যেই জাতীয় চেতনাবোধের প্রাথমিক প্রকাশ পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর সময়ে সংঘটিত ইংল্যান্ডের সংস্কার আন্দোলন এবং ইউরোপের উদারবাদী ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবসমূহের অগ্রগতি তিনি গভীর আগ্রহের সাথে পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতার শত্রুরা ও স্বৈরতন্ত্রের বন্ধুরা কখনও সাফল্যমন্ডিত হয়নি এবং কখনও হবেও না।

রাজা রামমোহন রায়ের পর বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে যিনি সুপরিচিত তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.) একাধারে তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃত পন্ডিত, লেখক, শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক, জনহিতৈষী। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম। বাল্যকাল হতেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র এবং যার স্বীকৃতি স্বরূপ ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেছিলেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান পন্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদ লাভ করেন এবং পরের মাসে ওই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি কলেজের অনেক সংস্কার করেন। এর আগে এ কলেজে পড়ার অধিকার ছিল কেবল ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাত্রদের, কিন্তু তিনি সব শ্রেণির হিন্দুদের জন্যে কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করেন। এছাড়াও তিনি কলেজে পড়ার জন্যে ছাত্রদের নামেমাত্র বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন এবং প্রতিপদ ও অষ্টমীর বদলে রবিবার সপ্তাহিক ছুটি চালু করেন। কলেজের ডিগ্রি লাভের পর ছাত্ররা যেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করতে পারে, সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। কলেজের পাঠ্যক্রমেও গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। পূর্বে

ব্যাকরণ, বীজগণিত ও গণিত শেখানো হতো সংস্কৃতে, কিন্তু তিনি সংস্কৃতের বদলে ব্যাকরণ বাংলার মাধ্যমে এবং গণিত ইংরেজির মাধ্যমে পড়ানোর নিয়ম চালু করেন। ইংরেজি ভাষা শেখাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেন। বাংলা শিক্ষার ওপরও তিনি জোর দেন। তবে তারচেয়ে ব্যাপক পরিবর্তন করেন দর্শন পাঠ্যক্রমে। তিনি সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্ত এবং প্রাচীনপন্থী বলে বিবেচনা করতেন। সে জন্যে, তিনি বার্কলের দর্শন এবং অনুরূপ পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন এবং তার পরিবর্তে বেকনের দর্শন এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের তর্কশাস্ত্র পড়ানোর সুপারিশ করেন।

১৮৫৪ সালে চার্লস উডের শিক্ষা সনদ গৃহীত হওয়ার পর সরকার গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশে ১৮৫৫ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদের অতিরিক্ত সহকারী স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন জেলায় স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। দুবছরের মধ্যে তিনি বিশটি স্কুল স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি এসব স্কুলে পড়ানোর জন্যে, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যও একটি স্কুল স্থাপন করেন। তিনি নিজ গ্রামে নিজ খরচে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এসব বাংলা মডেল স্কুল ছাড়াও সরকার বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্য রক্ষণশীল সমাজের তীব্র বিরোধিতার মুখে এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা কঠিন ছিল। ফলে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ সমর্থক বিদ্যাসাগরকেই সরকার এ কাজের দায়িত্ব প্রদান করে। তিনি নিজ উদ্যোগে মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান ও নদীয়ায় স্ত্রী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করেন।[৩৩] পরবর্তীতে ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাসের মধ্যে এধরণের আরও পঁয়ত্রিশটি স্কুল স্থাপন করতে সমর্থ হন। এ রকমের উচ্চপদে বাঙালিদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে, বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। এ সময়ে তিনি বেথুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হন। এই সোসাইটির কাজ ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং পরিবার ও সমাজে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা। তাঁর রচিত বর্ণপরিচয় (১৮৫১ খ্রি.) প্রকাশের আগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের হাতেখড়ির জন্য এ রকম কোন আদর্শ পাঠ্যপুস্তক ছিল না। বর্ণ পরিচয়ের মতোই সাফল্য লাভ করেছিল বোধোদয়, কথামালা, চরিতাবলী এবং জীবন চরিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও বর্ণপরিচয়ের মতো অভিনব এর আগে বাংলা ভাষায় কোনো সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল না। এছাড়াও চার খণ্ডে লেখা ব্যাকরণ কৌমুদীও তাঁর একটি ঐতিহাসিক অবদান।

তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তিনি কেবল লেখাপড়া শেখানোর কৌশল হিসেবে এগুলি লেখেননি, বরং ছাত্রদের নীতিবোধ উন্নত করা এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানও তাঁর লক্ষ্য ছিল। যেমন চরিতমালায় তিনি প্রাচীন ভারতের মুনি ঋষিদের জীবনী না লিখে ইউরোপের ষোল জন বিখ্যাত ব্যক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

তেমনি জীবনচরিতে তিনি কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন এবং হার্শেলের মতো বিজ্ঞানীদের এবং উইলিয়ম জোনসের মতো পন্ডিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি লিখেছেন। নীতিবোধেও একই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। এতে তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্ম এবং আচার অনুষ্ঠানের কোন উল্লেখ করেননি, বরং যেসব নীতিবোধ সকল মানুষের থাকা উচিত, তাঁর কথা লিখেছেন। কথামালায় তিনি নীতিমূলক গল্প সংগ্রহ করেছেন। আর তিন খন্ড আখ্যানমঞ্জরীতে আরব, পারস্যের পাশাপাশি ইউরোপ ও আমেরিকার সত্যিকার এবং জনপ্রিয় গল্প সন্নিবেশিত করেছেন। এসব গল্পের শিরোনাম মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুভক্তি, আতিথেয়তা, পরোপকার এবং সাধুতার পুরস্কার থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি কেবল ছাত্রদের নীতিবোধ উন্নত করতে চাননি, সেই সঙ্গে চেয়েছিলেন তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে। তাঁর পাঠ্যপুস্তকগুলি দীর্ঘদিন বঙ্গদেশের সর্বত্র পাঠ্য ছিল। এগুলোর মাধ্যমে তিনি একই সঙ্গে প্রামাণ্য ভাষা ও বানান যেমন শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন, তেমনি পেরেছিলেন নীতিবোধ উন্নত করতে। তিনি কেবল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নয়, বরং তাঁর অন্যান্য রচনা দিয়েও বাংলা গদ্যের সংস্কার এবং তার মান উন্নত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতগণ এবং রামমোহন রায় যে বাংলা গদ্যরীতি নির্মাণ করেছিলেন, তা ছিল আড়ষ্ট, কৃত্রিম এবং কোনোমতে ভাব প্রকাশের উপযোগী। তাঁর আগেকার গদ্যে তথ্য প্রকাশের মতো শব্দাবলী ছিল কিন্তু তাতে এমন সৌন্দর্য, সাবলীলতা এবং গতির স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, যাকে সাহিত্যিক গদ্য বলা যায়। ১৮৪৭ সালে বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর তা পাল্টে দিলেন। তিনি বাংলা গদ্যের শব্দ, বাক্য কাঠামোর সংস্কার, কর্তা ও ক্রিয়াপদ এবং ক্রিয়া ও কর্মের মধ্যে যথাযথ অন্বয় স্থাপন করে বাংলা গদ্যকে মাধুর্য দান করেন। তাছাড়া শ্বাস-যতির সমন্বয় ঘটান এবং পাঠক যাতে তা সহজেই দেখতে পান, তাঁর জন্য ইংরেজি রীতির যতিচিহ্ন বিশেষ করে 'কমা' ব্যবহার করেন। এজন্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যের প্রধান পুরুষ বলা হয়। কারণ এ সময়ের প্রায় সকলের গদ্যে ছাপ লেগে আছে কর্মী ও শ্রমিকের হাতের, শিল্পীর হাতের ছোঁয়া সেখানে খুবই দুর্লভ। তিনিই প্রথম দেখা দেন শিল্পীরূপে। তবে তিনি কর্মী ছিলেন না, চিত্রকর ছিলেন না, ছিলেন ভাস্কর।[৩৪] সম্ভবত একারণেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের 'প্রথম প্রকৃত শিল্পী' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৫]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক মনোভাবাপন্ন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, পুরোনো মূল্যবোধ এবং পরিবারের ভেতর থেকে পরিবর্তন আনতে না পারলে সমাজ এবং দেশের কখনো প্রকৃত উন্নতি হবে না। এ জন্যে তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। বাল্যবিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে তাঁর প্রথম বেনামী লেখা প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে বেঙ্গল স্পেক্টেটর পত্রিকায়। আর এ বিষয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে, দ্বিতীয় গ্রন্থ অক্টোবর মাসে। এভাবে বিধবা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া ছাড়াও, বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রবর্তনের পক্ষে একটি আইন প্রণয়নের জন্যে তিনি সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং এর পক্ষে ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরসংবলিত আবেদনপত্র সরকারের কাছে পাঠান। পরে এরকমের আরও অনেক আবেদনপত্র আসে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে। অপরপক্ষে, একই সময়ে রক্ষণশীল সমাজ এ ধরণের আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করে সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিল। তাঁদের যুক্তি ছিল যে, এ রকমের আইন

পাস করে দেশবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করা সরকারের পক্ষে উচিত হবে না। এতে স্বাক্ষর ছিল ৩৬,৭৬৩ জনের। বিরোধীদের পক্ষে পাল্লা ভারী থাকলেও ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হয়।[৩৬] বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বন্ধুরা মিলে ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে রক্ষণশীল সমাজের বিক্ষোভ এবং প্রচন্ড বাধার মুখে ঘটা করে এক বিধবার বিবাহ দেন। পাত্র ছিল সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের একজন সহকর্মী। তাছাড়া নিজের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বিধবার বিবাহ দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নে সাফল্য লাভ করায় পরে কুলীনদের বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ আইন পাস করার পক্ষে সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আরেকজন প্রবাদ পুরুষ হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রি.) বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তাঁর অসীম অবদানের জন্যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। প্রথম আধুনিক বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁকে গণ্য করা হয়। বাংলা ভাষার আদি সাহিত্যপত্র 'বঙ্গদর্শনের' প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন তিনি।

শিশু বয়সেই বঙ্কিমের অসামান্য মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৪৪ সালে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে তাঁর একাডেমিক শিক্ষার সূচনা হয়। ১৮৪৯ সালে তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন। এখানে অধ্যয়নকালেই বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-৫৯ খ্রি.) 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' গদ্য-পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর বহু রচনা এই দুই কাগজে প্রকাশিত হয়। কর্মজীবনে ব্রিটিশ রাজের অধীনে চাকুরী করেন তিনি। তবে সরকারি কর্মকর্তা নয় বরং লেখক এবং হিন্দু পুনর্জাগরণের দার্শনিক হিসেবেই তিনি অধিক প্রখ্যাত। তাঁর লেখক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পশ্চাতে চারটি স্বতন্ত্র ধারা ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথমত, উনিশ শতকের শুরুতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমূখ মনীষীর আধুনিক চিন্তাধারার ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ; দ্বিতীয়ত, সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ক্রমবিকাশ; তৃতীয়ত, নব্য হিন্দুত্ববাদের উত্থান এবং চতুর্থত, কলকাতায় ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধিকারী বুদ্ধিজীবী ও বিত্তবান মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারার স্রষ্টা নন, বরং প্রচলিত ধারারই ফল। তিনি পূর্বসূরিদের সৃষ্ট ধারার সুযোগ সুবিধা

পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং প্রগতির ধারাকে আরও অগ্রসর করে একটা স্বতন্ত্র রূপ দিতে অনন্য অবদান রাখেন। এ প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার বলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির যে নবজাগরণ হয়েছিল, তাঁর সবটাই যুগপ্রবৃত্তি বা ইউরোপীয় প্রভাবের বশে ঘটে নি, যখন তা বঙ্কিমচন্দ্রে এসে পৌছালো তখন জাতির গুঁঢ়তর চৈতন্যে সাড়া জাগিয়েছে, অতএব বাঙালির নিজস্ব দানও তাতে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সহ অন্যান্য কবি মনিষীগণ ভুঁইফোঁড় ছিলেন না – তাদের ব্যক্তিগত প্রতিভায় জাতির সংস্কার এবং সংস্কৃতিও শক্তি সঞ্চার করেছিল।[৩৭]

১৮৮০ থেকে তিনি একজন পুনরুত্থানবাদী সংস্কারক হওয়ার চেষ্টা করেন। আনন্দমঠ (১৮৮২ খ্রি.) তাঁর অন্যতম স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। পরবর্তীকালে তাঁর সকল চিন্তাধারা ধর্মীয় পূনরুত্থান ও জাতীয় নবজাগরণের কর্মকান্ডে আবর্তিত হয়। এ সময় থেকে তাঁর লেখনি যে ধারণা দেয় তাতে তাঁকে সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদ ও লেখকের চেয়ে একজন দেশপ্রেমিক ও গর্বিত হিন্দু বলেই মনে হয়। তিনি প্রাচীন ভারতের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। তাঁর এ ধারণা আনন্দমঠ (১৮৮২ খ্রি.) ও দেবী চৌধুরাণী (১৮৮২ খ্রি.) গ্রন্থে এবং ধর্মশাস্ত্র ও গীতার ভাষ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি নব্য হিন্দুবাদের একজন সংস্কারক ছিলেন এবং একটি হিন্দু জাতি গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে অবশ্য তিনি আশ্চর্যজনকভাবে ইতিহাসের ধারাকে উপেক্ষা করেছিলেন। বিগত কয়েক শতকে বাংলার সমাজ ও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে যে পরিবর্তন ও পুনর্গঠন হয়েছে তা তাঁর মানসপটে ধরা পড়েনি। বাংলা অঞ্চল যে ইতোমধ্যে একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে এবং এখানকার হিন্দু-মুসলমানরা যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বসবাস করেছে, একথা তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক হওয়া অসম্ভব। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস সমূহে, যেগুলির সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের সম্পর্ক খুবই কম, হিন্দু দেশপ্রেম এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচারের প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর বিজয় দেখানো হয়েছে, যেমন – রাজসিংহ (১৮৮২ খ্রি.) এবং সীতারাম (১৮৮৮ খ্রি.)। কোন কোনটিতে

আবার ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধেও হিন্দুজাতির বিজয় দেখানো হয়েছে, যেমন – দেবী চৌধুরাণী এবং আনন্দমঠ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর হিন্দুজাতির পুনরুত্থান বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থে 'বন্দে মাতরম্', 'মাতৃভূমি', 'জন্মভূমি', 'স্বরাজ', 'মন্ত্র' প্রভৃতি নতুন শ্লোগান তৈরি করেন। পরবর্তীতে এগুলি হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল।[৩৮] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যপন্থী রাজনৈতিক নেতারা প্রথম দিকে তাঁর এই হিন্দু জাতীয়তাবাদী শ্লোগানে খুব বেশি আগ্রহী না হলেও স্বদেশী যুগের যুবসমাজের কাছে তাঁর প্রচন্ড জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়েছিল। এটি কংগ্রেসকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে এবং পরবর্তীকালে একটি জাতীয়তাবাদী দলে পরিণত হতে প্রভাবিত করে। এরপর কংগ্রেস তার জাতীয় রাজনীতির শ্লোগান হিসেবে 'বন্দে মাতরম্'কে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে তা ছড়িয়ে পড়ে। অতীতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার এবং পরবর্তী জীবনে সাহিত্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) ও কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৪ খ্রি.) আবির্ভাব পর্যন্ত সকলের কাছে, এমনকি শিক্ষিত মুসলিম সমাজের কাছেও সে সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত হতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রতিনিধি দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩ খ্রি.)। তিনি ছিলেন বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। বাংলার আধুনিক নাট্যধারার প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাট্যরচনার পথে না গিয়ে বাস্তবধর্মী সামাজিক নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। এই ধারায় তিনিই হয়ে ওঠেন পরবর্তীকালের নাট্যকারদের আদর্শস্থানীয়।

দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম নদিয়ায়। বাল্যকাল থেকে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বলে পারিবারিক বাঁধার কারণে কলকাতায় পালিয়ে গিয়েও লেখাপড়া করেন তিনি। হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) হতে পাশ করে পোস্টমাস্টার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীকালে ডাক বিভাগের উচ্চস্তরের কর্মচারী হলেও সে পরিমাণ সম্মানী তিনি পাননি।

তবে এ বিভাগের কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি গ্রাম বাংলার কৃষকদের দুরাবস্থার চিত্র অবলোকন করেন অতি নিকট থেকে।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হল নীলদর্পণ (১৮৬০ খ্রি.), যা বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ পরিচিত নাটক। স্বাদেশিকতা, নীল বিদ্রোহ ও সমসাময়িক বাংলার সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এই নাটকের যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর। এই নাটকটি তিনি রচনা করেছিলেন নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ-পথিক ছদ্মনামে। এই নাটক তাঁকে খ্যাতি ও সম্মানের চূড়ান্ত শীর্ষে উন্নীত করে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হলে এবং এর ইংরেজি অনুবাদ প্রচারিত হলে একদিনেই এ নাটক বাঙালি মহলে যতটা প্রশংসিত হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গমহলে ঠিক ততটাই ঘৃণিত হয়েছিল। এই নাটক অবলম্বন করে বাঙালির স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সূচনা, এই নাটক সম্বন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও রায়তদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়, এর মধ্যে দিয়েই শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের বর্বর চরিত্র উদ্ঘাটিত হয়। এ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয় হল বাঙালি কৃষক ও ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী। এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল প্রয়োগ। নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়। স্বদেশে ও বিদেশে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ফলে সরকার ১৮৬০ সালে 'ইন্ডিগো কমিশন' বা 'নীল কমিশন' বসাতে বাধ্য হন। আইন করে নীলকরদের বর্বরতা বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়।[৩৯] সেই সময়কার বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সমাজ জীবনে এই নাটক গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষজনের জীবনকথা এমনই স্বার্থক ও গভীরভাবে নীলদর্পণ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে যে অনেকেই এই নাটককে বাংলার প্রথম গণনাটক হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আবার বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলে এই নাটকই প্রথম জাতীয় জীবনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার ঘটিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকবি, নাট্যকার, বাংলা ভাষায় সনেটের প্রবর্তক, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রি.) বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। কায়স্থ বংশে জন্ম হলেও তিনি যৌবনে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল নাম গ্রহণ করেন এবং ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ কাজে ব্যর্থ হয়ে জীবনের দ্বিতীয় পর্বে তিনি আকৃষ্ট হন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি। এই সময়েই তিনি বাংলায় নাটক, প্রহসন ও কাব্য রচনা করতে শুরু করেন। তিনি বাংলা ভাষায় সনেট ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শকে বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি কাব্যের বীজ সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন পশ্চিম পৃথিবীতে এবং সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন বাংলা কবিতাকে। শুধু কবিতা নয়, তিনি বদলে দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যকেই।[৪০]

তখনকার বাংলা সাহিত্যে রচনার শৈলীগত এবং বিষয় ভাবনাগত যে আড়ষ্টতা ছিল, তিনি তা অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতাগুণে দূরীভূত করেন। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন, 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। প্রথমটির বিষয় ছিল ইংরেজি শিক্ষিত নববাবু সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল সনাতনপন্থী সমাজপতিদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন। ফলে নাটকের বিষয়বস্তু নব্য ও সনাতনপন্থী উভয় সমাজকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

১৮৬১ সালে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বনে রচনা করেন ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ নামক একটি মহাকাব্য। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক মহাকাব্য। মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণ আহৃত কাহিনীর পুণরাবৃত্তি নয়, এটি নবজাগ্রত বাঙালির দৃষ্টি নিয়তি লাঞ্ছিত নবমানবতাবোধের সকরুণ মহাকাব্যের রূপে অপূর্ব গীতি কাব্য। এ কাব্যের মাধ্যমেই তিনি মহাকবির মর্যাদা লাভ করেন এবং তাঁর নব আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দও বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রামায়ণে বর্ণিত অধর্মাচারী, অত্যাচারী ও পাপী রাবণকে একজন দেশপ্রেমিক, বীর যোদ্ধা ও বিশাল শক্তির আধার রূপে চিত্রিত করে মধুসূদন উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ভারতবাসীর

চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনে প্রকৃত সত্য সন্ধান ও দেশপ্রেমের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, বাংলা সাহিত্যে তা তুলনাহীন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, " মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নয়, তাঁর ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখতে পাই। ... এর মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে।"[৪১]

মধুসূদন দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের যুগপ্রবর্তক কবি। তিনি তাঁর কাব্যের বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত সংস্কৃত কাব্য থেকে, কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ অনুযায়ী সমকালীন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জীবনদর্শন ও রুচির উপযোগী করে তিনি তা কাব্যে রূপায়িত করেন এবং তার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের এই অন্যতম পথিকৃৎ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার দ্বারা বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করে এই ভাষা ও সাহিত্যের যে উৎকর্ষ সাধন করেন, এর ফলেই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপন এবং ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রি.) ছিলেন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। একই সাথে ব্রিটিশ ভারতে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণাটিও প্রবর্তন করেন। কলকাতার এক উচ্চবিত্ত হিন্দু বাঙালি পরিবারে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষণ ছিল। গুরু রামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে তিনি শেখেন, সকল জীবই ঈশ্বরের প্রতিভূ; তাই মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।[৪২] তাঁর সর্বাধিক উদ্ধৃত একটি উক্তি হল – "বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি, কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

১৮৮০ সালে, তিনি কেশবচন্দ্র সেনের নব বিধানের সদস্য হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কেশব চন্দ্রের ব্যান্ড অব হোপ এর সদস্য হিসেবে যুবসমাজকে ধূমপান এবং মদ্যপানে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টাও করেছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম ধারণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পরিব্রাজক হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। পাঁচ বছর ধরে তিনি

ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও সমাজব্যবস্থার সাথে পরিচিত হন। এসময় থেকেই সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জন্মায় এবং তিনি জাতির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, বিবেকানন্দ দেশের শোষিত, নির্যাতিত মানুষের মুক্তি কামনা করেছিলেন। এজন্য তিনি নিজেকে সমাজবাদীও বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতের দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের আত্মজাগরণ ঘটুক। আত্মশক্তির উদ্বোধন হোক।[৪৩]

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে প্রথম বিশ্বধর্ম মহাসভার উদ্বোধন হয়। এ দিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রথম সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এখানে তিনি ভারত এবং হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন।[৪৪] ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি কলম্বোয় তিনি প্রাচ্যে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। যেখানে পাশ্চাত্যে তিনি ভারতের মহান আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কথা বলেছিলেন, সেখানে ভারতে ফিরে তাঁর 'কলম্বো থেকে আলমোরা' বক্তৃতা ছিল জনগণের জন্য নৈতিক অনুপ্রেরণা, বর্ণাশ্রম দূরীকরণ, বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহদান, দেশের শিল্পায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান সম্পর্কে। এ বক্তৃতাসমূহকে জাতীয়তাবাদী ঐকান্তিকতা ও আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁর বক্তৃতাসমূহ মহাত্মা গান্ধী, বিপিন চন্দ্র পাল এবং বালগঙ্গাধর তিলক সহ আরো অনেক ভারতীয় নেতাদের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

তার প্রতিষ্ঠিত ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ ছিল শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং দাতব্য কাজের মধ্য দিয়ে জনগণকে সাহায্য করার এক সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলনের প্রারম্ভ। তিনি ভারতে ও ভারতের বাইরে হিন্দুধর্মকে পুনরায় উজ্জীবিত করে তুলতে সফল হয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে জাতীয়তাবাদী ধারণার অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী আদর্শটিকে তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সমাজ সংস্কারক হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের গভীর দেশাত্মবোধ সারা ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ যতটা অবদান রেখেছিলেন, ততটা অন্য কেউ এককভাবে রাখতে পারেননি। ভারতের সর্বব্যাপী দারিদ্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি

বলেছিলেন যে, এই দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যই ভারতে জাতীয় নবজাগরণের প্রয়োজন আছে। তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণা ভারতীয় দার্শনিক ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবিত করেছিল। তাঁর দর্শনের সাফল্য এখানেই আবিষ্কার করা সম্ভব।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম পুরোধা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) ছিলেন একাধারে কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। মূলত কবি হিসেবেই তাঁর প্রতিভা বিশ্বময় স্বীকৃত। ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এশিয়ার বিদগ্ধ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার জয়ের গৌরব অর্জন করেন। তিনি কেবল তাঁর কালের কবি নন, তিনি কালজয়ী। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর আবির্ভাব ছিল এক যুগান্তর। মানুষের কীর্তি মহীরুহের মতো আকাশে-আলোতে-বাতাসে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়ালেও মাটির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগটুকু হারাতে পারে না। সেই মাটির বন্ধন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে হল উনিশ শতকের বাংলাদেশে নব-জাগরণের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র।[৪৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ সালের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর অভিজাত ঠাকুর পরিবারে। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এ যুগের অন্যতম সমাজ সংস্কারক এবং একেশ্বরবাদের প্রবক্তা রাজা রামমোহন রায় ছিলেন দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রামমোহন রায়ের আদর্শ দ্বারকানাথ, তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এবং দৌহিত্র রবীন্দ্রনাথের ওপর এক অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করে। সে যুগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ছিল সাহিত্য সংস্কৃতি, মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীল ভাবধারার অন্যতম পীঠস্থান।

হিন্দুমেলায় পঠিত তাঁর কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' এর ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানাঙ্কুর সাহিত্যপত্রে সেকালের বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে স্থান পেয়েছিলেন। যে স্বদেশিচেতনা দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে বিকাশ লাভ করেছিল, তারই আনুকূল্যে প্রবর্তিত হয় হিন্দুমেলা। বাঙালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশের ইতিহাসে হিন্দুমেলা বিশেষভাবে স্মরণীয়।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পিতার আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। ব্রাহ্মসমাজে এসময় নানারকম দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা বিরাজমান ছিল। সে যুগের কলকাতার ধর্মান্দোলনের সময় তরুণ রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। এরপরে জমিদারি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে তাঁর জীবনের নতুন আরেকটি অধ্যায় শুরু হয়। এসময় থেকে তিনি লোকজীবনের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পান এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দরিদ্র মানুষের সাধারণ জীবন পর্যবেক্ষণ করেন। কবি কল্পনার জগৎ থেকে নেমে আসেন বাস্তব পৃথিবীর প্রত্যক্ষ জীবনে। ফলে রচিত হয় বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি।

রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণ দীপ্তির বিচ্ছুরণ ঘটায় সাধনা পত্রিকা। এ পত্রিকায় তিনি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর শিক্ষাবিষয়ক মতামত এবং রাজনৈতিক আলোচনা সম্বলিত লেখা ওই পত্রিকাতেই ছাপা হতো। শিক্ষা ও রাজনৈতিক বিষয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। রবীন্দ্র মানসে রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হল ইউরোপের জীবন ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। ভারতের জীবন সমাজকেন্দ্রিক। ইউরোপের ইতিহাস হল রাষ্ট্র, শাসন, আইন ও বিচারের ইতিহাস। ভারতের ইতিহাস তাঁর সামাজিক জীবন, আচার আচরণ, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যার। এক কথায় লোকায়ত জীবনের ইতিহাস। সাধারণ মানুষের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ এ ইতিহাসের বিষয়। ব্রিটিশ এদেশের রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করুক ক্ষতি নেই। রাষ্ট্র নেতাদের কাজ হবে সমাজের ভিতরে পরিবর্তন ঘটানো। তাতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি। সামাজিক জীবনে ঐক্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য।[৪৭]

রবীন্দ্রনাথ সবসময়ই গঠনমূলক কাজের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নিজের জাতি, সমাজ ও দেশকে উত্তমরূপে জানা, বৃহত্তর মানবিক নীতিবোধ দিয়ে নিজেদের সংশোধন করে চলা এবং বিদেশি শাসকের ভিক্ষার দানে নির্ভরশীল না থেকে আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠা এসবই ছিল তাঁর প্রবন্ধমালার মূল বক্তব্য। এ সময়ের প্রবন্ধে একদিকে ফুটে ওঠে বাঙালি সমাজের নানা দিক নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা, আর অন্যদিকে ভারতের ঐতিহ্য, তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি এবং ঐক্যসাধনার ধারার স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি, তবে সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নও রাখেননি; বরং তিনি ছিলেন স্বাদেশিকতার বরেণ্য পুরুষ। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় যে কংগ্রেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, 'বন্দে মাতরম্' গান গেয়ে তিনি তার উদ্বোধন করেন। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক যে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন, তারই প্রেরণায় কবি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী উৎসব'। সাধনা, বঙ্গদর্শন ও ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কবি তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং রাখি বন্ধনের দিনটিকে স্মরণ করে রচনা করেন একটি গান:

বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।[৪৮]

সে সময় কবির স্বদেশ পর্বের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য গান রচিত হয়। তিনি তখন দেশ ও সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার বিস্তৃত কর্মসূচি তুলে ধরেন তাঁর বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে। এতে তিনি পল্লীসংগঠন সম্পর্কে গঠনাত্মক কার্যপদ্ধতি, লোকশিক্ষা, সামাজিক কর্তৃত্ব, সমবায় প্রভৃতি জনসেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে এর নাম হয় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়। ওই বিদ্যালয়ই রূপান্তরিত হয় বিশ্বভারতীতে। এখানকার জীবনযাত্রা ছিল প্রাচীন ভারতীয় তপোবনের আদর্শে পরিচালিত। এখানে ছিল গুরুর সাহচর্যে শিষ্যের নিবিড়, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন। পরবর্তী সময়ে বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বিশ্বের প্রতি ভারতের আতিথ্য, ভারতের চর্চা, জগতের সংস্কৃতিতে ভারতের ঔৎসুক্য, ভারতের নিষ্ঠা এবং মানবপ্রেম। শান্তিনিকেতন পর্বে রচিত চোখের বালি, নৌকাডুবি এবং গোরা উপন্যাসে একদিকে জীবনের বাস্তবতা, মনস্তত্ত্ব এবং অন্যদিকে স্বদেশের নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন তিনি। জাতিগত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে

Dhaka University Institutional Repository

চিরন্তন ভারতবর্ষকে কবি এখানেই আবিষ্কার করেন এবং ভারতবর্ষের জাতীয় প্রকৃতি ও তার ইতিহাসের ধারা তাঁর কাছে হয়ে ওঠে গভীর অর্থবহ।

পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ চলমান বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি নতুন দিকে মোড় নেয়। এসময় তার প্রধান অবলম্বন হয় প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬ খ্রি.) সম্পাদিত সবুজপত্র পত্রিকা। সে যুগে সবুজপত্র প্রগতিশীল চিন্তার বাহনরূপে দেখা দেয়। ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে পুলিশ গুলি চালিয়ে নিরীহ ও অসহায় নাগরিকদের হত্যা করলে তিনি ব্রিটিশ ভাইসরয়কে এক পত্র লিখে এর প্রতিবাদ করেন এবং তাঁকে প্রদানকৃত (১৯১৫ সালে) 'নাইট' উপাধি ফিরিয়ে দেন।[৪৯]

আমেরিকা ভ্রমণের পরবর্তীকালে কবির শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ধারণায় কিছু পরিবর্তন ঘটে এবং বিশ্বভারতীর সত্যিকার রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনের এ পর্বে তিনি বিশ্বভারতীর বিদ্যাচর্চাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকপাঠ্য শিক্ষাস্তর থেকে উচ্চতর স্বাধীন চর্চায় উন্নীত করেন। ভারতীয় দর্শন ও শিক্ষার সুসমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী সম্মিলিতভাবে রবীন্দ্রনাথের মূল শিক্ষাচিন্তার প্রকাশ। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা ও প্রতিদিনের জীবনকে এক করতে। তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশদের চাপানো শিক্ষাব্যবস্থা ছিল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। এই অসামঞ্জস্য দূর করে শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গীভূত করা তার লক্ষ্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ তাঁর মানবমুখী ঐক্যমূলক জীবনতত্ত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। ১৯২০ সালে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে যেসব বক্তব্য দিয়েছিলেন তার সংকলন হল 'Creative Unity'। এতে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্ববোধ ও মানব ঐক্যের বাণী। মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মানবসভ্যতার পরিত্রাণের কথা ভেবে তিনি বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা করেছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নতুন মোড় নিয়েছিল। আন্দোলনকে সমর্থন করলেও তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদ কিংবা সন্ত্রাসবাদকে কখনও সমর্থন করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ হলেও তাঁর স্থান বিংশ শতাব্দীতেই; কারণ তাঁর প্রতিভা ও মনীষার যে দৃঢ়তর অভিব্যক্তি, এবং কাব্য সাধনার বাইরেও নব নব ভাব-চিন্তার নায়ক রূপে তাঁর যে আত্মপ্রকাশ, তা এই বিংশ শতাব্দীতেই ঘটেছে; এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের যা কিছু প্রভাব, তাও এই কালের শিক্ষিত সমাজের উপর পড়েছে।[৫০] তিনি ছিলেন অনন্ত জীবন, চিরজীবী মানবাত্মা ও প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যের কবি। মৃত্যুকে তিনি দেখেছেন মহাজীবনের যতি হিসেবে। জীবন-মৃত্যু ও জগত, সংসার তাঁর নিকট প্রতিভাত হয় এক অখণ্ড রূপে। তাই তাঁর গানে জীবনলীলার সুর বাজে এভাবে –

'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে

তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।'[৫১]

পরিশেষে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বিকাশ, ভাবধারার আলোচনা এবং এ রেনেসাঁসের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নে একথা বলা যায় যে, এদেশে বাঙালি মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এতে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হলো। এক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা কার্যকর ভূমিকা পালন করল। বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো মানবিক চেতনার বিকাশ। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তি নির্ভরতা, চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো ধর্ম ও জাতি সম্পর্কে উদার দৃষ্টি। অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র। তবে এর অন্য দিকও ছিল। এই 'রেনেসাঁস' আন্দোলন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আদৌ স্পর্শ বা প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে কতিপয় শহর ব্যতিত বিশাল বঙ্গদেশের কোন অস্তিত্বই ছিল না এই 'রেনেসাঁসের' নিকট। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের পরে, কৃষক বিদ্রোহের এক বিরাট যুগের অবসানে, ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গীয় ভূমিসংক্রান্ত আইন, ১৮৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দের 'দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির' রিপোর্ট এবং ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন আবির্ভূত হবার পরেই কতিপয় গ্রাম শহরের 'রেনেসাঁসের' দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থাৎ রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আগমন করল সত্যি, কিন্তু তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম সে অর্থে জাগ্রত হল না।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতালীর র‍্যানেশাঁস, বাঙালির সংস্কৃতি*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ.১৩

২। মুসা আনসারী, *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৮, পৃ.১৪১

৩। প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, শ্রীধর প্রকাশনী, কলিকাতা, ২০১২, পৃ.৪৪১

৪। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ.১৫১

৫। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪২

৬। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৫

৭। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫১

৮। সালাহ্উদ্দীন আহমদ, আমাদের রেনেসাঁ ভাবনা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ৩ জুন, ২০০১, পৃ.৩

৯। সালাহ্উদ্দীন আহমদ, আমাদের রেনেসাঁ ভাবনা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩

১০। David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Firma K.L.Mukhopadhayay, Calcutta, India, 1969, p.03

১১। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪০

১২। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৪৩-৪৪

Dhaka University Institutional Repository

১৩। Jadunath Sarkar, *The History of Bengal*, vol-ii, Muslim Period (1200-1757), The University of Dacca, 1948, p.498

১৪। Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, Papyrus, Calcutta, July 1979, p.13

১৫। Susobhan Sarkar, *op.cit.*, p.13

১৬। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫১

১৭। Census Report; 1951, Vol. vi. Part IA, p.437 (উদ্ধৃত), সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫২

১৮। R.C.Majumdar (ed.), *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Part-II, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1965, p.68

১৯। মুসা আনসারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৯

২০। বিনয় ঘোষ, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মার্চ ১৯৪৮, পৃ.১৫২

২১। R.P. Dutt, *India Today and Tomorrow*, People's Publishing House, Delhi, 1955, p.109

২২। Susobhan Sarkar, *op.cit.*, p.69

২৩। Susobhan Sarkar, *op.cit.*, p.75

২৪। David Kopf, *op.cit.*, p.175

২৫। বিনয় ঘোষ, *বিদ্রোহী ডিরোজিও*, অয়ন, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃ.১৮

Dhaka University Institutional Repository

২৬। Arabinda Poddar, *Renaissance in Bengal Quests and Confrontations 1800-1860*, Indian Institute of Advance Study, Simla, 1960, p.114

২৭। Arabinda Poddar, *op.cit.*, p.117

২৮। David Kopf, *op.cit.*, p.289

২৯। B.N. Dasgupta, *The Life & Times of Rajah Rammohun Roy*, Ambika Publications, New Delhi, 1980, p.98

৩০। A.Mukherjee, *Reform and Regeneration in Bengal 1774-1823*, Calcutta, 1960, p.144

৩১। B.B. Misra, *The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times*, Oxford University Press, Delhi, 1960, p.197

৩২। আ. ফ. সালাহউদ্দীন আহমদ, "উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ও কর্মকাণ্ড", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম খণ্ড (রাজনৈতিক ইতিহাস), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ.২৭৪

৩৩। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ.৭৮

৩৪। Humayun Azad, "Bangla Literature in Nineteenth Century", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971)*, Vol-III (Social and Cultural History), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p.294

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮০

৩৬। R.C.Majumdar (ed.), *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Part-II, p.277-278

৩৭। মোহিতলাল মজুমদার, *বাংলার নবযুগ*, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৌষ ১৩৫২, পৃ.৪৯

৩৮। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৪-৬৫

৩৯। ব্লায়ার বি. ক্লিং, "নীল বিদ্রোহ", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম খণ্ড (রাজনৈতিক ইতিহাস), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃ.২৬০

৪০। Humayun Azad, "Bangla Literature in Nineteenth Century", *op.cit.*, p.299

৪১। অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে*, দীপায়ন, কলকাতা, কার্তিক ১৩৬০, পৃ.১৫৭

৪২। R.C. Majumdar, *Bengal in the Nineteenth Century*, Calcutta, December 1960, p.77

৪৩। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫

৪৪। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৬

৪৫। অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৩৮

৪৬। R.C. Majumdar, *op.cit.*, p.75

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫

৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (অখণ্ড), স্বদেশ পর্ব (কবিতা নং - ২০), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৪০০ (অখণ্ডসূচি-সহ একত্র প্রকাশ), পৃ.২৫৫

৪৯। শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, *বঙ্গের কৃতি সন্তান*, প্রথম ভাগ, ডায়মন্ড বুক স্টল, কলকাতা, মাঘ ১৩৫২, পৃ.৯২

৫০। মোহিতলাল মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯১

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* (অখণ্ড), পূজা পর্ব (কবিতা নং - ২৪৮), পৃ.১০৮

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বঙ্গীয় রেনেসাঁসে কৃষকশ্রেণির প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান বিচার

উনবিংশ শতাব্দি ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা ও আবিষ্কারের যুগ। এ শতকে ইউরোপে যে উদারনৈতিক চিন্তাধারা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ সাধিত হয় তাঁর ঢেউ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এসে লেগেছিল। ১৭৫৭ সাল থেকে কোম্পানি সরকারের গৃহীত নানামুখী প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পদক্ষেপের ফলে বাংলায় একটি মধ্যবিত্তশ্রেণির বিকাশ ঘটে।[১] সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এই মধ্যবিত্তশ্রেণির মাধ্যমে বাংলার পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কৃতি বিষয়ক যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা বঙ্গীয় রেনেসাঁস নামে পরিচিত। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ হতে বঙ্গদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনর্গঠনকল্পে কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনটি শুরু হয়েছিল তাঁর সাথে বাংলার সাধারণ জনগণ বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক কি ছিল তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচ্য অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠী কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাদের মনোভাব, চিন্তা চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রণনীতি ও রণকৌশলের সাফল্য রূপ বাংলায় যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল কালক্রমে তা আরো সুসংহত হয়। ব্রিটিশ শাসনের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। ফলে ইংরেজদের জীবনযাত্রা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে বাঙালিদেরই সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে এবং তারাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষার বদৌলতে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হয়।[২] বাংলার এই নতুন শ্রেণি বিন্যাসের যুগে যারা এইভাবে সমাজটাকে ভেঙ্গেচুরে ফেললেন তাঁরা হলেন ব্রিটিশ পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণি এবং তাদেরই প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলেন বাংলার বনেদী ও নতুন হঠাৎ জমিদার শ্রেণি।[৩] কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে রেনেসাঁস আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

যখন চলছিল ঠিক সে সময়েই বঙ্গদেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ ও জমিদার, তালুকদার গোষ্ঠীর শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব অপেক্ষা ব্যাপক ও অল্পবিস্তর সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহের প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সেই ঝড়ের দুর্নিবার আঘাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অঞ্চলের ইংরেজ শাসন ও ভূম্যধিকারী গোষ্ঠীর শোষণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[৪] ভারতের শান্ত, নিরীহ ও তুষ্ট কৃষকেরা জমিদার, মহাজনদের উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত। এ বিদ্রোহ মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। তখন বিদ্রোহকেই প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হত। গ্রামাঞ্চলের কৃষক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল ইংরেজ শাসন ও জমিদার মধ্যসত্বভোগীদের উচ্ছেদ করে কৃষকের হৃত ভূমিসত্ত্বের পুনরুদ্ধার এবং শোষণ-উৎপীড়নের মূলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে।[৫] এ আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল বঙ্গদেশের সমগ্র গ্রামাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এ আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিল। কৃষক বিদ্রোহগুলি নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর বড় ধরনের আঘাত ছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভারতীয় কৃষক সমাজ ব্রিটিশের দ্বারা চাপিয়ে দেয়া ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সেই সময়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নায়কগণ ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হলেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি স্বরূপ কৃষক সম্প্রদায়ের সংগ্রামের সমর্থনে অগ্রসর হতে পারেনি। তৎকালীন বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ই ছিল সংখ্যায় বেশি তথাপি তাদের অধিকার আদায়ের যে কোন প্রচেষ্টাতে শিক্ষিত ও ভূস্বামী সম্প্রদায় সরাসরি বিরোধিতা করেছে।[৬] এখানেই বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের স্ববিরোধীতা উপস্থিত।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ শক্তির জয় লাভের ফলে বাংলার স্বাধীন নবাবি আমলের অবসান ঘটে এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে এদেশে ইংরেজ শক্তির আগমন ও ক্ষমতা গ্রহণ ছিল পূর্বের যে কোন অবস্থার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।[৭] আধুনিক গবেষকদের অনেকে মনে করেন যে, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশদের বাংলা অঞ্চল দখলের সাথে সাথে দক্ষিণ এশিয়ায় ঔপনিবেশিক যুগের জয়যাত্রা শুরু হয় এবং জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়।[৮] এ সকল পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে এদেশের সকল পেশা ও বর্ণের মানুষের জীবনে। তবে কৃষক কারিগরের উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি মারাত্মক।[৯] প্রাক ঔপনিবেশিক আমলে ভূমির ব্যবহার নিয়ে কৃষক শ্রেণি

Dhaka University Institutional Repository

ও সরকারের মধ্যে কখনো বিরোধ বাধেনি, বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে উৎপাদনের ভাগাভাগি নিয়ে। কিন্তু এই নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে কোম্পানি আমলে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.)। লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রি.) প্রবর্তিত ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার ফলে দেশে যে জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির সৃষ্টি হয়, অনতিকাল পরে তারাই সমাজের ভিত্তি ও অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে দীর্ঘ দিনের মালিকানা হারিয়ে কৃষক শ্রেণি হয় ভূমি হারা। এ ঘটনা এর আগে আর কখনো ঘটেনি।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মতে, যে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তাঁরা লর্ড কর্নওয়ালিসের তৈরি অভিজাত শ্রেণি। এরা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি।[১০] অন্যদিকে এসময় গ্রামের বোঝা বেড়েছে, কৃষির শোচনীয় অবনতি ঘটেছে এবং নতুন এক নিঃস্ব ক্ষেতমজুর শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে। শহর ও গ্রামের ব্যবধান দূর হল না, বরং বেড়ে গেল। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংকট ঘনিয়ে এল। ইংরেজদের নতুন জমিদারী ব্যবস্থার ফলে যদি কেউ ধ্বংস হয়ে থাকে তাহলে বাংলার প্রজারা এবং বাংলার কৃষক কারিগরেরা ধ্বংস হয়েছে। বাংলার প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়েছে, জমিদারের দস্যু ও লাঠিয়ালরা তাদের ঘর বাড়ি ক্ষেত খামার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুট করে গ্রাম ছাড়া করেছে।[১১]

সর্বাধিক মুনাফা প্রত্যাশী ব্রিটিশ কোম্পানির ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দুঃসময়ে খাজনা মওকুফ এবং তাকাভি ঋণের মত কোন সুবিধা প্রদান ছাড়াই সকল কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করতে বদ্ধ পরিকর ছিল। সরকারের ভূমিনীতি প্রজাদেরকে সরকারি প্রতিনিধি তথা ভূস্বামীদের শোষণের শিকারে পরিণত করে। ঐতিহ্যবাহী গ্রাম পঞ্চায়েতের অবর্তমানে বিচ্ছিন্ন গ্রাম সমাজ তখন অসহায়ভাবে রাষ্ট্র ও তাঁর প্রতিনিধি যেমন জমিদার, তালুকদার প্রমুখের শোষণের কবলে পতিত হয়। কৃষকের জন্য সরকার একটি অদৃশ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অথচ কৃষকের দেয়া রাজস্বের উপরেই সরকারের অস্তিত্ব ও সাফল্য নির্ভরশীল ছিল। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকদের কৃষক নির্যাতন সম্পর্কে সরকার জেনেও ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। স্বাভাবিক কারণেই দেশের সর্বত্র ঔপনিবেশিক শাসন এবং এর পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় অতি ঘন ঘন। যদিও বাংলার বিশেষ বিশেষ স্থান ছিল বিদ্রোহপ্রবণ তবে

Dhaka University Institutional Repository

মোটামুটিভাবে বিদ্রোহের ক্ষেত্র ছিল বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় ব্যাপ্ত।[১২] বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের সমসাময়িক কালে সমগ্র বাংলার বহু অঞ্চলে কৃষকগণ আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছিল। সকল কৃষক আন্দোলন গুরুত্ব ও আকারে যদিও সমান ছিল না। কোন কোন আন্দোলন ছিল ক্ষণস্থায়ী ও অতিশয় স্থানিক আবার কোন কোন আন্দোলন ছিল অতিশয় ব্যাপক, সুসংগঠিত এবং যা ব্রিটিশ আশীর্বাদপুষ্ট মধ্যবিত্তশ্রেণিকে প্রভাবিত করেছিল। এ ধরনের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে কোম্পানি আমলে উল্লেখযোগ্য ছিল ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০ খ্রি.), ত্রিপুরার শমসের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৬৮ খ্রি.), সন্দ্বীপের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৬৯ খ্রি.), পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭ খ্রি.), মালঙ্গিদের বিদ্রোহ (১৭৮০-১৮০৪ খ্রি.), রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩ খ্রি.), বাংলার চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৮-৯৯ খ্রি.), ময়মনসিংহের পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ (১৮২৪-৩৩ খ্রি.), তিতুমিরের বিদ্রোহ (১৮৩১ খ্রি.), ফরায়েজি আন্দোলন (১৮৩৮-৪৭ খ্রি.), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬ খ্রি.) ইত্যাদি।[১৩] ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরেও কৃষকদের এই আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। এসময় যেসব বিদ্রোহ হয়েছিল তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬১ খ্রি.), সিরাজগঞ্জ ও পাবনার বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩ খ্রি.)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণে বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনে মানবতাবাদ ও বৈপ্লবিক শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব ছিল কিন্তু বঙ্গদেশ তথা ভারতের অশিক্ষিত এবং শ্রেণি সংগঠন ও শ্রেণি চেতনাহীন জনসাধারণের অর্থাৎ কৃষকের পক্ষে সে ধরনের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে সচেতনভাবে বৈপ্লবিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার উপায় ছিল না। পাশাপাশি অধিকার বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, করভারে আক্রান্ত কৃষকের জন্য বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাগণ ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করছিলেন কী ?

এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই নবজাগরণের নেতারা পিছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ ও কৃষক সমাজের উন্নতির জন্য কোন আন্তরিক আগ্রহ দেখান নি। যেহেতু এই নবজাগরণের অনেক নেতা ছিলেন জমিদার শ্রেণির বা সরকারি চাকুরিয়া মধ্যবিত্ত সেহেতু তাঁরা কৃষকদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল হতে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেন নি। বাধ্যতামূলক

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টাও তাঁরা করেন নি। নীল বিদ্রোহের সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-৬১ খ্রি.) ও দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৩ খ্রি.) ছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি হতভাগ্য কৃষকদের সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। এমনকি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময়ও এই নবজাগরণের নেতাদের মধ্যে এই বিদ্রোহের প্রতি আন্তরিক সমর্থনের কোন প্রমান নেই। কারণ এই বাঙালি ভদ্রলোকেরাই ইংরেজ প্রভুকে সর্বপ্রথম বিধাতার আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছিলেন। এই শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কল্যাণেই তাদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি।[১৪] ফলে কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সম্পর্কেও তাঁরা উদাসীন ছিলেন। যে ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলন হয় সেই ভূমিসত্ত্বের অধিকার প্রাপ্ত হয়েই এই শ্রেণি সমাজের অভিজাত হিসেবে গড়ে ওঠে এবং কালক্রমে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা করে। ফলে যখন কৃষক আন্দোলন ভূমিস্বার্থের মূলোৎপাটনে উদ্যত হয় তখন তাঁরা এই কৃষক সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। জমিদারেরা সব সময় ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করত এবং বিরোধিতা করত কেবল তখনই যখন তাদের জমিদারী অধিকারে হাত পড়ত। ব্রিটিশ সরকার তাদের পক্ষ হতে এদেরকে বিশ্বাসযোগ্য অনুগত শক্তি বলে মনে করত এবং এদেরকে দাক্ষিণ্য করত।[১৫] এর পশ্চাতে কারণ ছিল সরকার ভয় পায় যে, যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসে তাহলে মধ্যবিত্তের মস্তিষ্ক ও কৃষকের বাহু মিলিত হলে ব্রিটিশের দুর্দিন দেখা দিবে। এজন্য মধ্যবিত্তকে হাতে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরা কিস্তি বন্দি শাসন সংস্কার ও স্বায়ত্তশাসনের টোপ ব্যবহার করেন। এই জমিদারী অভিজাত সম্প্রদায়ও আশংকা করেছিল যে, সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক যে কোন রকমের গণতান্ত্রিক রূপান্তর তাদের শ্রেণি স্বার্থকে এবং এমনকি তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন করবে।[১৬] পরবর্তীকালে যতই কৃষক প্রজা ও ক্ষেত মজুরের আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল ততই জমিদারেরা তাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য পূর্বের চেয়ে বেশি করে ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভর করতে শুরু করে।[১৭] একদিকে অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি উন্নত বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে প্রগতিশীল মতবাদের অনুসারি হয়ে ওঠে, অন্যদিকে মূল শ্রেণিস্বার্থের প্রভাবে কৃষক শ্রেণির যুক্তিসংগত সংগ্রাম ও আন্দোলনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দেয়। এ অবস্থাকে আমরা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের

Dhaka University Institutional Repository

স্ববিরোধীতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই স্ববিরোধীতা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেরই অনিবার্য পরিণতি।[১৮]

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সাথে বাংলার নবজাগরণের যে তুলনা করা হয় সেখানে একটি অন্যতম পার্থক্য হল বঙ্গীয় রেনেসাঁসে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শ দেখা যায় তাঁর উৎপত্তি এদেশের সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে নয় বরং এ আদর্শের উৎস ছিল বৈদেশিক বিপ্লবের সফলতা। আবার অন্যভাবে বলা যায় যে, দেশের অভ্যন্তরে মানসিক জাগরণের জন্য যে শ্রেণির প্রয়োজন সর্বাধিক, সেই শ্রেণিটিই তো ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় ছিল অনুপস্থিত, আর থাকলেও তাঁরা ছিল ব্রিটিশ অনুগত। এর কারণ হল ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন ও শোষণের মাধ্যমে দেশীয় বণিক বুর্জোয়া শ্রেণিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এ সময় অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির শূন্যস্থান পূরণ হয় যে শ্রেণির দ্বারা তাঁরা ছিল ব্রিটিশ কোম্পানি কর্তৃক প্রবর্তিত ভূমিনীতি তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে আবির্ভূত। এই জমিদার ও মধ্যশ্রেণি ইংরেজ শাসকগণের ভূমি ব্যবস্থা হতে সৃষ্ট ও ভূমিস্বত্বের অধিকারী হয়েছিল বলে ইংরেজ শাসকগণের প্রতি তাদের আনুগত্যও ছিল সর্বাধিক। একই সাথে তাঁরা নানা কারণে কৃষক সম্প্রদায়ের বিরোধীও ছিল। আর এ সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই পরবর্তীকালে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের উদ্ভব হয়। তাই দেখা যায়, বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েও নিজেরা ভূস্বামী শ্রেণির অন্তর্গত বলে তাদের রেনেসাঁস আন্দোলন হতে ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষক সম্প্রদায়কে কেবল দূরে রেখেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁরা নিজ শ্রেণির করায়ত্ত কৃষক শোষণের অধিকার ও ব্যবস্থাকে আরো দৃঢ় করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন এবং ইংরেজ শাসন ও ইংরেজ সৃষ্ট নতুন সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য বিদেশী শাসকগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। ভূমিস্বার্থই এদেরকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ হতে বিচ্যুত করে প্রতিক্রিয়াশিলতার আশ্রয় গ্রহণ করতে এবং কৃষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী ও অন্যান্য শোষক সম্প্রদায়ের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিল।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার নবজাগরণের বেশির ভাগ নায়ক ছিলেন সরকারি কর্মচারী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রি.) ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ; রাজ নারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯ খ্রি.) ছিলেন প্রধান শিক্ষক; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪ খ্রি.), নবীন চন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রি.) ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭ খ্রি.) ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এসময় একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। এ পরিবার বিশ্বাস করত বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি। সুতরাং এই নায়কদের মধ্যে ফ্লোরেন্সের বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিচ্ছায়া খোঁজা নিস্ফল। তা সত্ত্বেও বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মধ্যশ্রেণির জনগণ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা – গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী এবং শহরবাসী চাকুরীজীবী। এদের মধ্যে শহরবাসী চাকুরীজীবী শ্রেণিটি বহুক্ষেত্রেই প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিল। এখান থেকেই বোঝা যায় যে, কৃষক মুক্তির প্রশ্নটি উক্ত দুই অংশের উপর দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। এক অংশ ছিল কৃষক মুক্তির প্রশ্নে সকল আন্দোলন সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধী, অপর অংশ ছিল এই মুক্তি সংগ্রামের অল্প বিস্তর সমর্থক।

ফলে দেখা যায়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মুখপাত্রগণও দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে – এক অংশ প্রতিক্রিয়াশীল, যারা প্রকাশ্যে কৃষকের সুযোগ সুবিধার বিরোধিতা করে প্রতিপক্ষ ইংরেজদের সাহায্য করেছে। অন্য অংশ ছিল প্রগতিশীল। একদিকে 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী', 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রিকা এবং 'নীল দর্পণ', 'জমিদার দর্পণ' প্রভৃতি নাটক কৃষক সংগ্রামের পক্ষে দণ্ডায়মান হয়। এরা ছিল প্রগতিশীল অংশ। উদাহরণস্বরূপ দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পণ' নাটকে নীলকরদের অত্যাচারে একটি কৃষক পরিবারের ধ্বংস হওয়ার অশ্রুসজল কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ নাটক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিবেক জাগিয়ে তোলে এবং নীল চাষিদের স্বপক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির একাংশ নীল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীলও ছিলেন। এদের মধ্যে শিশির কুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১ খ্রি.) ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শিশির কুমার ঘোষ গ্রামে গ্রামে ঘুরে নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাতেন এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় সেগুলো ছাপতেন। তিনি নীল চাষিদের পক্ষে বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় লিখে সরকারের ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির বিবেক জাগাবার চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অপর দিকে রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) 'সংবাদকৌমুদী', ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতি এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তার 'বঙ্গদর্শন' কৃষক সংগ্রামের ঘোরতর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এরা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, মধ্যবিত্তশ্রেণির উভয় অংশই ছিল ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক। ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ইংরেজি শিক্ষার কারণে এ শ্রেণিটি কখনও ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ বা অমঙ্গল কামনা করতে পারেনি। এ শ্রেণির জাতীয় চেতনা ব্রিটিশ প্রেমে মোহাচ্ছন্ন ছিল বলেই এটা ঘটেছিল। এমনকি এই নবজাগরণ মুসলিম সম্প্রদায়কেও আকর্ষণ করতে পারেনি। কারণ উনবিংশ শতকের এই নবজাগরণে হিন্দু সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও হিন্দু সভ্যতার গোঁড়ামি এতই ছিল যে, এসময় যা কিছু সংস্কারের চেষ্টা করা হয় তা শুধু হিন্দু সমাজকে কেন্দ্রে রেখেই করা হয়েছিল।

ফলে দেখা যায় যে, প্রায় একই সময়ে বাংলা ও ভারতের বৃহত্তর কৃষক সম্প্রদায় যখন প্রাণপণে ইংরেজ শাসন ও জমিদারি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিল, তখন মধ্যবিত্তশ্রেণির উভয় অংশ, বিশেষত প্রতিক্রিয়াশীল অংশ, সংগ্রামরত কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে যোগদানের পরিবর্তে বিদেশী ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করার জন্য তাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল নিয়োগ করেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বিভিন্ন সময়ে কৃষক বিদ্রোহ দমনে যে রূপ উন্মত্ততা দেখিয়েছে তা মধ্যবিত্তশ্রেণির সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করে রেখেছে।[২০] পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দিতে কৃষি ও চাকরি সংকট তীব্র আকারে দেখা দেয়ার পরেই মধ্যশ্রেণির একাংশের মোহভঙ্গ হতে আরম্ভ করে এবং এরা (প্রগতিশীল অংশ) ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তখনও তারা ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য কৃষক ও শ্রমিকের বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদান করতে এগিয়ে আসেনি। সেসময় তাদের সেই রুদ্ধ আক্রোশ দুটি ভিন্ন কর্মধারায় প্রবাহিত হয়েছিল – একটি বুর্জোয়া জমিদার গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত আপসমূলক কংগ্রেসি কর্মপন্থা এবং অপরটি হতাশাছন্ন মধ্যবিত্তশ্রেণি সুলভ সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থা।

এভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রগতিশীল অংশ বিংশ শতাব্দিতে এসে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৩০ খ্রি. চরম কৃষি সংকটের পর হতে মধ্যবিত্তশ্রেণির ভূমিস্বত্বহীন দরিদ্র

Dhaka University Institutional Repository

অংশ আরো গভীর ও ব্যাপক অর্থনৈতিক দুর্দশায় পতিত হয়ে জীবিকার জন্য দলে দলে কল কারখানায় প্রবেশ করতে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী যুবকগণ বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করে চলে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদের ভূমিকা প্রগতিশীলতার উচ্চস্তরে আরোহণ করে।[২১]

বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলন শুরুর বহু পূর্ব হতেই বাংলার কৃষক সম্প্রদায় আত্মরক্ষার জন্য এদেশ হতে ইংরেজ শক্তির উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করে আসছিল। ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থা এবং জমিদার ও মধ্যবিত্তশ্রেণির শোষণ, উৎপীড়নের বিরুদ্ধেই মূলত এ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের এই ইংরেজ ও জমিদার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামের সমান্তরালেই শহরাঞ্চলে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে শুরু হয় বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলন। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম পুরুষ। তিনিই এই মুমূর্ষু জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন এবং ঘুমন্ত দেশকে জাগিয়ে নতুন পথে পরিচালিত করেছিলেন।[২২] একারণে তাঁকে নবজাগরণের প্রধান পুরোহিতও বলা হয়। আধুনিক শিক্ষার আলোকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার বিবর্জিত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তাঁর মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, তাঁর কুসংস্কারমুক্ত মন ও অনুসন্ধিৎসা এবং দার্শনিক সুলভ প্রজ্ঞার জন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁকে আধুনিক ভারতের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, প্রখ্যাত মনিষী বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রি.) ও লুথারের (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রি.) সাথে তাঁকে তুলনা করা যায়।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.) বিবেচনায় দেশ যখন অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, অন্ধ বিশ্বাস তার জীবনধারাকে রুদ্ধ করেছিল; সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা লুপ্ত হয়েছিল, জাতি যখন কয়েকটি ক্ষয়ধারা প্রথাকে সার সত্য জ্ঞান করে আঁকড়ে ধরেছিল, সেই সংকট সময়ে রাজা রামমোহন রায় ভারত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন একজন সামন্ত ভূস্বামী এবং কোম্পানির মুৎসুদ্দি। ইংরেজি শিক্ষা তাকে ইউরোপীয় ভাবধারা সম্পর্কে প্রভাবিত করলেও ভূস্বামী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ও ভূস্বামী শ্রেণির সমর্থক হওয়ায় কিছু সীমাবদ্ধতাকে তিনি জয় করতে পারেননি। দেশের জন্য একটি সমৃদ্ধশালী মধ্যবিত্তশ্রেণি

Dhaka University Institutional Repository

অপরিহার্যতার মত প্রকাশের পাশাপাশি তিনি জমিদারী প্রথাকেই আদর্শ ভূমি ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যদিও এসময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিভিন্ন কুফলের কারণে যখন সর্বত্র এর সমালোচনা হচ্ছিল। তার এধরনের মনোভাব কৃষক সমাজের দুর্দশাকে দূর করতে তো পারেইনি বরং এসময় তিনি কৃষক সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের বিরোধী অবস্থানও গ্রহণ করেন। গ্রামাঞ্চলের কৃষকগণ যখন ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করছিল, তখন তিনি নব নব তত্ত্ব ও আন্দোলন সৃষ্টি করে ভারত ভূমিতে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

এসময় একদিকে যেমন তার নেতৃত্বে সেকালের সর্বাপেক্ষা বীভৎস ও পাশবিক সতীদাহ প্রথা বন্ধের আন্দোলন সফল হয়েছিল; তিনিই প্রথম স্ত্রী শিক্ষা এবং স্ত্রী পুরুষের সমানাধিকারের কথা প্রচার করেছিলেন, মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, এমনকি কৃষকের করভার লাঘবের কথাও বলেছেন, অন্যদিকে নীলচাষের দ্বারা কৃষকের মহা উপকার সাধিত হয়েছে বলে ঘোষণা করে নীলকর দস্যুদের প্রশংসা পত্রও দিয়েছেন।[২৪] এছাড়াও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করে ইংল্যান্ড হতে এদেশে লবণ আমদানি করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন[২৫] – যার ফলে একমাত্র বঙ্গদেশেই প্রায় ছয় লক্ষ লবণ কারিগর বেকার হয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষি শ্রমিকে (ক্ষেত মজুরে) পরিণত হয়েছিল। ভারতীয়গণ স্বাধীনতা লাভের যোগ্য নয় বলেই বঙ্গদেশের কৃষক যখন জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করছিল তখনও তিনি স্বাধীনতার দাবী তোলেননি। এমনকি তিনি ১৮৩১ সালে ব্রিটিশ রাজকে উদ্দেশ্য করে লিখেন যে, কৃষক ও গ্রামবাসীগণ নিতান্ত অজ্ঞ; সুতরাং তারা পূর্বকালের বা বর্তমানকালের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিস্পৃহ। ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারীদের আচরণের উপরেই তাদের নিরাপত্তা বা দুঃখ কষ্ট নির্ভর করে। যারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থেকে ঐশ্বর্যশালী হয়েছে এবং যারা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' ফলে শান্তিতে জমিদারী ভোগ করছে তারা তাদের বিচক্ষণতা দ্বারা ইংরেজ শাসনাধীনে ভবিষ্যৎ উন্নতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে সক্ষম। আমি তাদের সাধারণ মনোভাব সম্বন্ধে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, তাদের ক্ষমতা ও গুণানুসারে তাদেরকে ক্রমশ উচ্চতর সরকারি মর্যাদা দান করলে ইংরেজ সরকারের প্রতি তাদের অনুরক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন নবযুগের নতুন চিন্তার সারথি। ইউরোপের ফরাসি বিপ্লব, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান চেতনা, মানবতাবাদ, বস্তুবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ বাঙালি মনীষাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তবে বাঙালি মনীষা প্রাচীন ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে নতুন সমাজ গড়তে চায়নি। বাঙালি সংস্কৃতির বিবর্তনে একটি মুখ্য প্রবণতা ছিল ঐতিহ্যের আধুনিকীকরণ। তবে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যরা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য ধারাকে স্বাগত জানাতে আগ্রহী ছিল। রাজা রামমোহন রায় যেমন এ পথের পথিক ছিলেন না, তেমনি তিনি রাধাকান্ত দেব ও ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো রক্ষণশীল ঘরানারও ছিলেন না।

বাংলার মানুষের মুক্তির উপায় হিসেবে রাজা রামমোহন রায় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ ও উদার নীতির অপেক্ষা করেন। কারণ তার মতে, এ দুটির উদ্ভব ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভব। ইংল্যান্ডের রাজা ও পার্লামেন্ট এবং ইংল্যান্ডের সমাজপতিদের উদারতা ও স্বদিচ্ছায় তার অগাধ বিশ্বাস ছিল।[২৭] একারণে এদেশের কৃষক প্রজার হয়ে ইংরেজ শাসনের বন্ধন ছিন্ন করা তার কাছে ছিল অচিন্তনীয়। বরং এদেশে ব্রিটিশ শাসনের কাঠামোকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তিনি ত্রিবিধ কর্মপ্রণালী প্রবর্তনের পরামর্শ সংক্রান্ত যে লিখিত আবেদন ইংল্যান্ডের রাজার নিকট পেশ করেন তাতে ভারতবাসীদিগকে "মহামহিম ইংলন্ডেশ্বরের অতি বশংবদ প্রজাবৃন্দ" বলে উল্লেখ করে অকুণ্ঠ রাজভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। এ পত্রে তিনি মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের কথা উল্লেখ করে লিখেন যে, প্রজাবর্গের অভাব অভিযোগ যথাস্থানে পেশ করা সম্ভব না হলে অথবা এর প্রতিকার করা না গেলে বিপ্লব ঘটতে পারে। কিন্তু স্বাধীন মুদ্রণ যন্ত্র সে বিপদের নিবারণ ঘটাতে সক্ষম হবে।[২৮] তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে ভারতের জন্য উত্তম আইন প্রণয়নের জন্য ভারতের অভিজাত শ্রেণির মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ভারতের অগণিত কৃষক যারা তার ভাষায় অজ্ঞ, নিরক্ষর তাদের মতামত গ্রহণ করাকে প্রয়োজন বলে মনে করেননি। এসময় তিনি সর্বোচ্চ আদালতে যে স্মারকলিপি দেন তাতে উল্লেখ করেন, "ভারতবাসীগণের পরম সৌভাগ্য যে, তারা ভগবত করুণায় সমগ্র ইংরেজ জাতির রক্ষণাবেক্ষণে বর্তমান। সে সাথে ইংল্যান্ডের রাজা, ইংল্যান্ডের লর্ডগণ ও ইংরেজ পার্লামেন্ট তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কর্তা।" এ মতামতের মাধ্যমে রামমোহন রায়ের শ্রেণি চরিত্র ও জাতীয়তাবাদের স্বরূপ প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। আর তার ব্যক্তি চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মতামতের মধ্য দিয়ে। তিনি তার "Rights of Hindus Over Ancestral Property" নামক প্রবন্ধের ৩৯ টি পয়েন্টের বিভিন্ন স্থানে লিখেছেন যে, সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রদান, উত্তরাধিকার আইন প্রণয়নের যে ব্যবস্থা কোম্পানি সরকার করেছে তা অতীতের যে কোন শাসন ব্যবস্থার চেয়ে উন্নততর।[২৯]

রাজা রামমোহন রায়ের মতে, ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতের বুদ্ধিভিত্তিক মঙ্গল সাধন করেছে। একারণেই তিনি মনে করতেন যেহেতু ইংরেজ জাতি শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণি; তাই তারা ভারতে উপনিবেশ বিস্তার করলে এতে ভারতীয়দের মঙ্গল হবে।[৩০] অথচ ব্রিটিশ শাসনকে এদেশে সভ্যতা বিতরণের পরিবর্তে লুণ্ঠনকারী শাসক শ্রেণি হিসেবেই চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তিনি এবং তার সহকর্মীরা ঔপনিবেশিক নির্মমতাকে বাস্তবে দেখতে পাননি কারণ এতে তাদের বস্তুগত স্বার্থ জড়িত ছিল। রামমোহন রায়ের পক্ষে ইংরেজ শাসনকে উপনিবেশ হিসেবে দেখতে না পাওয়াটা প্রমাণ করে যে, জাগতিক স্বার্থে তিনি যতোটা স্বার্থপর ততোটাই নির্মম।[৩১]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্য একজন ব্যক্তিত্ব হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁর সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যিক ব্যক্তিত্ব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবে তিনিও সাফল্য ও ব্যর্থতার বাইরে ছিলেন না। তাঁর সবচেয়ে মহত্তর কৃতিত্ব হল তিনি তাঁর পৌত্র রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কর্মী পুরুষ, সম্ভাবনাপূর্ণ এক বিপুল প্রাণ শক্তির উৎস। বস্তুত রাজা রামমোহন রায় এবং তার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬ খ্রি.) মনোভাব ছিল দেশী জমিদারদের পাশে একটি শ্বেত জমিদার গোষ্ঠীকে সহযোগী হিসেবে পাওয়ার। এ কারণেই কোম্পানির বিরুদ্ধে গৌরবময় কৃষক সংগ্রামকে সংস্কারবদ্ধ মনের অদূরদর্শী আস্ফালন বলে বিদ্রূপ ও নিন্দা করে ইংরেজ প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। লবণ ও নীলের ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ ঠাকুরের পারিবারিক ব্যবসা পরবর্তীতে তার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫ খ্রি.) মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তিনি জমিদারদের প্রতিষ্ঠান ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন (১৮৩৭ খ্রি.), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করেন। এসকল কর্মকাণ্ডে এদেশের কৃষক প্রজার কোন অংশগ্রহণ ছিলনা। আসলে কৃষিজীবী মানুষ বাঙালী মধ্যবিত্তের মানসিক ও সামাজিক জগতে কখনো প্রবেশ করতে পারেনি।[৩২]

রাজা রামমোহন রায়ের পরে এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আগে এদেশে নবযুগের হিউম্যানিস্ট চিন্তাধারার অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন ডিরোজিও। তবে তিনি ও তাঁর অনুসারীদের ব্যর্থতা এখানেই যে, এদেশের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হতে পারেননি। তাঁরা বায়বীয় স্তরেই বিচরণ করেছেন। মনে হয় ডিরোজিয়ানরা বাঙালি সমাজের সাথে অনাত্মীয়ের মতো আচরণ করেছেন। ইয়ং বেঙ্গল যে পরিমাণ মেঘমালা নিয়ে এসেছিল বাঙালি সমাজের নবায়নে তেমন পরিমাণ বর্ষণ করতে পারেনি।

রাজা রামমোহন রায়ের পর ভূমধ্যিকারি গোষ্ঠীর একনিষ্ঠ মুখপাত্র হিসেবে যার নাম বলা যায় তিনি হলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যেখানে বঙ্গীয় সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় পাশ্চাত্য সভ্যতা হতে প্রগতিশীল ভাবধারা আহরণ করে তার ভিত্তিতে এক গভীর সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করে গিয়েছিলেন, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র তার 'নব হিন্দুত্ববাদের' নামে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রগতিশীল ভাবধারার বিরুদ্ধাচারণই করেছেন। তিনি তার প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তার উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রচার করেছেন এবং একটি চরম রক্ষণশীল সমাজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। সামন্ত প্রথার সকল রক্ষণশীল কুসংস্কারের ঘোরতর সমর্থক হওয়ায় এদেশের গোঁড়া হিন্দু ও উচ্চ শ্রেণির নিকট বঙ্কিম সাহিত্য গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

তার উপন্যাসে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন সমর্থন নেই, সামন্ত অভিজাত সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন কথা নেই। তার আবেদন কেবল প্রগতির পথরোধকারীদের নিকটে। বঙ্কিম সাহিত্য হল প্রগতিবিরোধী অভিজাত গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণির সমাজেরই প্রতিনিধি। তিনি যে চরম প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার শ্রেণির মুখপাত্র ছিলেন নিঃসন্দেহে সে শ্রেণিটির উদ্ভব হয় ব্রিটিশদের হাতে। ঐতিহাসিক 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' পটভূমিতে রচিত তার অন্যতম সাহিত্য 'আনন্দমঠ' (১৮৮২ খ্রি.) ছিল একদিকে হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

রেনেসাঁস ও অপর দিকে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার পক্ষে প্রচারের সাহিত্য। এ গ্রন্থে তিনি জমিদার ও ইংরেজ শাসনের স্বার্থে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার বিপরীত ব্যাখ্যা দিয়ে ইংরেজ ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়াছেন। কেবল 'আনন্দমঠ' নয় বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গ্রন্থেই ইংরেজদের জয়গান করতে দেখা যায়।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতা তার নিকট ছিল ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ এবং সেই পথকে তিনি অন্তরের সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে দেশবাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। তিনি মনে করতেন ইংরেজদের কাছ থেকে যে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠার ধারণা পাওয়া গেছে তা প্রায় দৈব প্রাপ্তি।[৩৩] তবে তার সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র যে গ্রন্থে কিছুটা প্রগতিশীলতার সন্ধান পাওয়া যায় তা হল 'সাম্য' (১৮৭৯ খ্রি.)। এ 'সাম্য' পুস্তিকায় সামন্ততন্ত্র বিরোধী ফরাসী বিপ্লবকে অভিনন্দিত করেছিলেন যার সূত্রপাত হয়েছিল ধর্মের গোঁড়ামি ও দাসত্বের বিরুদ্ধে, অথচ উনবিংশ শতকে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে সেই সামন্ততন্ত্রকে কৃষি বিপ্লবের হাত হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে নতুন করে আধ্যাত্মবাদ আর ধর্মের কুসংস্কার প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

সে সময়ের ভারতে বঙ্গদেশ সহ অন্যান্য অঞ্চলে পাশ্চাত্যের ভাবধারা ও বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের অনুশাসন এবং হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহের প্রবল জোয়ার দেখা দিয়েছিল। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সমকালের নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রবল জোয়ারকে প্রতিহত করে 'নব হিন্দুত্ববাদ' এর প্রতিষ্ঠা দ্বারা ধর্মের ক্ষেত্রেও বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি চরিত্রকে স্পষ্ট রূপ দান করেন। তিনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ধ্যান ধারণাকে প্রকৃত ধর্ম বলে প্রচার করে নতুন প্রগতিশীল ভাবধারাকে পাশ কাটিয়েছেন। এভাবে হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে নতুন প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টার দ্বারা তিনি সামন্ততন্ত্রের বুনিয়াদকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী হিসেবে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী ছিলেন। হিন্দুবাদীত্বের অন্ধকার গলিতে প্রবেশের ফলে বাংলায় উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠার কারণে অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা তিনি দেখতে পাননি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁত শিল্পের কথা। ইংরেজ আগমনের আগে এই

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প তখনকার বিশ্বে সবচেয়ে সমৃদ্ধ বলে পরিচিত ছিল। ইংরেজ ব্যবসায়িরা এসে তাঁত শিল্পকে যেভাবে ধ্বংস করে তার কাহিনী ইতিহাস হয়ে আছে। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খ্রি.) তার একটি রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, হতভাগ্য তাঁতিদের হাড়ে এদেশের মাটি সাদা হয়ে গিয়েছিল। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র এ ঘটনার জন্য তাঁতিদেরকেই দায়ী করলেন বংশগত পেশায় আটকে থাকার ফল হিসেবে। সে সাথে তিনি এ পরামর্শও দেন যে, তারা যেন চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করে।[৩৪] বঙ্গদেশের কৃষক সংগ্রামের দিকেও তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল যা তাঁর সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রকেই উন্মোচিত করে। কারণ তিনি জানতেন যে, গণসংগ্রামের ফলাফল হতে পারে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ যার প্রতিনিধি ছিলেন তিনি নিজেও। তাই স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনসাধারণের প্রতি তিনি সহানুভূতি দেখাতে পারেননি।

অবশ্য তিনি তার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখে বাংলার কৃষকের জন্য অজস্র অশ্রু বিসর্জন করেছেন এবং কৃষক সমস্যার প্রতি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এ সকল প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে কৃষকের সামন্ততন্ত্র বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ভয়ে ভীত বঙ্কিমের আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। তিনি স্বশ্রেণিকে সতর্ক করে বলেছেন, "তুমি আমি দেশের কয়জন ? আর এই কৃষিজীবী কয়জন ? তাদের ত্যাগ করলে দেশে কয়জন থাকে ? হিসাব করলে তারাই দেশ-দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হতে আমা হতে কোন কার্য হতে পারে ? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপলে কে কোথায় থাকবে ?"[৩৫] মূলত এটাই ছিল তার প্রশ্ন যে কৃষকরা বিদ্রোহ করলে কি হবে। আর তাই সমকালীন মীর মশারফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২ খ্রি.) কৃষক বিদ্রোহ অবলম্বনে তৈরি 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩ খ্রি.) এবং নীলকর দস্যুদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াসে তৈরি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' (১৮৫৮-৫৯ খ্রি.) নাটকদ্বয়কে তিনি নিন্দা করেছেন এবং এর ফলে বিদ্রোহী কৃষক প্রশ্রয় পাবে এবং কৃষক বিদ্রোহের শক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তার মতে, জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়া নিষ্প্রয়োজন। তার এ ধরণের মতামতের কারণও ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভূস্বামী শ্রেণির বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম এমন অবস্থানে পৌঁছেছিল যে, ভূস্বামী শ্রেণির পক্ষে কোনরূপ প্রগতিশীল ভাবধারা, সংগ্রামী

Dhaka University Institutional Repository

কৃষকের প্রতি কোন সমর্থন, এমনকি সাহিত্যে সেই সংগ্রামের প্রতিফলন সহ্য করা সম্ভবপর ছিল না।

'নীল দর্পণ' ও 'জমিদার দর্পণ' এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল সমসাময়িক কালের কৃষক জনসাধারণের অবস্থা, তাদের উপর জমিদার ও নীলকর গোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ উৎপীড়ন এবং কৃষক সংগ্রাম-সমাজ বিপ্লবের দিকে কৃষক জনগণের দৃঢ় পদক্ষেপ। আর এ বাস্তব সত্য বুঝেই তিনি এ ধরণের সাহিত্যের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ভূমধ্যকারী শ্রেণি ও ইংরেজ শাসনকে রক্ষা করার জন্য সাহিত্যের মারফত সমাজ বিপ্লবের নিন্দা করে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'আনন্দমঠ' এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন – "সমাজ বিপ্লব সকল সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।"[৩৬] তিনি এ কথা ভালভাবেই জানতেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথাই কৃষকের সর্বনাশের মূল। তথাপি এই সর্বনাশা বন্দোবস্তের অবসান ঘটাতে ইংরেজ শাসকদের তিনি পরামর্শ দেননি। এমনকি ভ্রমবশতও তিনি ইংরেজদের অমঙ্গলাকাঙ্খী হননি। কারণ তার নিকট ইংরেজের অমঙ্গলাকাঙ্খী হওয়া মানে হল সমাজের ও দেশের অমঙ্গলাকাঙ্খী হওয়া।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ঐতিহাসিক মিহির আচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ভাবনাকে তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এভাবে, "১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটেছিল, এক্ষণে তাঁর সংশোধন সম্ভব না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবার সম্ভাবনা।"[৩৭] একই ভাবে বলা যায় যে, জাতিপ্রথা ও নারী জাতির সমস্যা সম্পর্কেও তিনি উদার মত পোষণ করতেন, কিন্তু তিনি সমাজের উপর তলা থেকে ঐসব কুপ্রথা উচ্ছেদের জন্য কোন শোরগোল তোলা থেকে বিরত থাকেন।[৩৮] আসলে প্রশংসা ও নিন্দার এক জটিল ছেদ বিন্দুতে তাঁর অবস্থান।

বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণির আরেকজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্ব হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার নবজাগরণে রামমোহনের যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন তিনি।[৩৯] বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর দান অপরিসীম। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে অভিহিত করেছেন। রাজা

Dhaka University Institutional Repository

রামমোহন রায়ের সংস্কারের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা রোধ হলে সমাজে বিধবাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে সমাজে দেখা দেয় নানা অনাচার। বিধবা বিবাহের জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন। বিধবারা যাতে আর্থিক নিরাপত্তা পায় সেদিকেও তিনি দৃষ্টি দেন। তিনি বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও কুলীন প্রথার বিরোধিতা করেন। সামাজিক কুপ্রথার মূলে তিনি অশিক্ষাকে দায়ী করেন। তবে এসব সমস্যার সমাধানে তিনি দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থন বিশেষ পাননি। তিনি যেন ছিলেন অনেকটা অজানা সমুদ্রের একজন নিঃসঙ্গ নাবিক। নানাবিধ প্রতিকুলতা সত্ত্বেও তিনি নারী শিক্ষার প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করতে পেরেছিলেন যার মাধ্যমে বাংলায় আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর সময়ের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণির প্রগতিশীলতার অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তার সমসাময়িক বিশ্বখ্যাত দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের (১৮১৮-৮৩ খ্রি.) মতই অগ্রসর চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তবে যেখানে কার্ল মার্ক্সের ছিল আন্তর্জাতিক চরিত্র সেখানে তার পক্ষে এমনকি জাতীয়তাবাদী হওয়াও ছিল কঠিন। কিন্তু ইংরেজদের সমষ্টিগত শাসনের সঙ্গে তার কোন বিবাদ ছিল না।[৪০] তিনি ছিলেন নিছক শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও মানবতাবাদী। তিনি রাজনীতির কাছাকাছি ছিলেন না। তাঁর সময়ে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ বিশেষ হয়নি। সুতরাং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায় না। এজন্য তাঁকে অনেকে ইংরেজ ভক্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ বলে মনে করেন। এর পক্ষে যুক্তি হল যে, বাংলার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ইংরেজ শাসনের প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তার ভাষা ছিল সংস্কৃত প্রভাবিত। একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, তৎকালীন সমাজের অংশ হিসেবে তার স্বাধীনতারও একটা সীমা ছিল।[৪১]

মনিষী অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু এবং সহযাত্রী। তিনি সমকালীন সমাজ সংস্কারমূলক উদ্যোগ ও চিন্তা ভাবনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মনে করতেন সুশাসন প্রবর্তনেই সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। তিনি বিধবা বিবাহের সমর্থনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখে জনমত গঠন করেন এবং এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তিনি তাঁর লিখিত প্রবন্ধে বিধবাদের দুঃখ কষ্টের এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করেন। মদ্যপান যে মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকারক তাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ছিলেন চলমান প্রথার বিরোধী। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে পল্লী গ্রামের কৃষক প্রজাদের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পত্রিকায় তা প্রকাশ করে এ সমস্যা লাঘবের চেষ্টা করেছেন। এককথায় তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ও কৃষক দরদী মানুষ।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এদেশে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে এই শ্রেণি দেশে নানা প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে। যদিও এ আন্দোলন ছিল প্রধানত শহর কেন্দ্রিক, তবুও এর ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তবে এ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ নাগাদ কেটে যেতে থাকে এবং বিদেশী সভ্যতার বিপরীতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্মের প্রতি নতুন করে আকর্ষণের উদ্ভব ঘটে। এসময় ভারতবাসীর মধ্যে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পের জন্য গর্বের ভাব জেগে ওঠে। বিশেষ করে শিক্ষিত হিন্দুগণ হিন্দু সভ্যতার দিকে নতুন করে আকৃষ্ট হয় এবং হিন্দু সমাজ ও ধর্মের যুগোপযোগী সংস্কার সাধনের উপরে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন। মূলত এই সামাজিক পরিবেশেই হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন বা হিন্দু রেনেসাঁসের অন্যতম স্থপতি হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২ খ্রি.) আবির্ভাব ঘটে। ইতিপূর্বে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার 'নব হিন্দুত্ববাদ' প্রচারের দ্বারা সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের যে কাজ শুরু করেছিলেন তিনি সেই কাজকে আরো বহুদূর অগ্রসর করে দেন। বঙ্কিম ছিলেন ভাবুক ও চিন্তাশীল, প্রাকৃতিক নিয়তি ও নিয়মের অনুবর্ত্তী, ক্রমবিকাশবাদী। অন্যদিকে বিবেকানন্দ আত্মার স্বশক্তিতে আস্থাবান, তিনি প্রকৃতির ধমক মানতেন না। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি যতই বিপরীত হোক, মূল সমস্যা উভয়ের নিকটেই এক; আবার তত্ত্বের দিক দিয়ে যেমনই হোক, ভাব প্রেরণায় উভয়ের স্বগোত্রতা এত অধিক যে, এককালে বাঙালি যে উভয়কে একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।[৪২]

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র। মধ্যবিত্তশ্রেণির জাতীয়তাবাদীরাও তাকেই জাতীয় বীর হিসেবে গ্রহণ করেন। কারণ তিনিই

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে ইউরোপীয় সভ্যতার মোহ হতে সদ্যমুক্ত শহুরে মধ্যশ্রেণিকে দেশের প্রতি মুখ ফিরাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং অপরদিকে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতের আহত জাতিসত্তার জয় ঘোষণা করেছিলেন।[৪৩] একারনেই পরবর্তীকালের চরমপন্থি জাতীয়তাবাদী নায়কগণ তাকে রাজনৈতিক গুরু বলে মেনে নেন। অবশ্য বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পূর্ববর্তী ব্যক্তিত্বদের মত তার চিন্তায়ও পরস্পর বিরোধী ভাবধারার পরিণতিতে স্ববিরোধীতা প্রকট হয়েছিল। তাই ইংরেজ শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা তার মনে স্থান পায়নি এবং একারনেই সম্ভবত তার অসংখ্য বক্তৃতা, চিঠিপত্র, প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্যে বঙ্গদেশের জমিদার গোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ উৎপীড়ন এবং কৃষক সম্প্রদায়ের শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলতে পারেননি বা অন্যভাবে বললে চেষ্টাও করেননি। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রধান নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেখানে প্রকাশ্যেই ইংরেজ শাসনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং কৃষক সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন তেমনি রেনেসাঁসের অপর নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ 'বেদান্ত', 'মায়া', 'মুচি, মেথর, চন্ডাল আমার ভাই' প্রভৃতি কতগুলো অর্থহীন কথার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রকৃত সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন।[৪৪]

তার চিন্তায় স্ববিরোধীতা আরো প্রকাশ পায় যখন একদিকে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন, কিন্তু সেই সভ্যতার কাছেই চেয়েছেন রজোগুণের অনুশীলন, শক্তির সাধনা, বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব। তিনি সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের ধর্মমত ও ধনতান্ত্রিক ইউরোপ এ দুই বিপরীত শক্তির সমন্বয় সাধন করে এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে বলেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিত সমাজ সংস্কার, জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে না, একথা বুঝতে পেরে তিনি সমাজ বিপ্লবের চিন্তাও করেছিলেন কিন্তু সে কার্যক্রমের অংশীদার হিসেবে ভারতের সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক শক্তি কৃষক সম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হননি তিনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো প্রতিভা শুধু বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে নয়, বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসেও দুর্লভ। সকল গবেষকই তাঁকে মেনেছেন বাংলার রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসেবে। এন. এস. বোসের মতে, "The Bengal Renaissance or indeed the

Indian awakening reached its culmination in Rabindranath who was the very symbol of a Renascent Century and the beacon light of a new one."[৪৫] বাঙালির রেনেসাঁসের অন্যতম উদাহরণ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। তবে তিনিও সমালোচনার উর্দ্ধে নন। কেননা তাঁর সাধনা ছিল নবযুগের ধারা হতে স্বতন্ত্র। তিনি প্রথমে ছিলেন ভারত পথিক, পড়ে বিশ্ব পর্যটক। কিন্তু এতে বাঙ্গালিত্ব আবিষ্কার করা গেল না।

বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলন হতে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষক সম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করা। মূলত কৃষক বিরোধী ভূমিব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল স্বরূপ মধ্যশ্রেণির জন্ম হয় যেখান থেকে পরবর্তীকালে রেনেসাঁস আন্দোলনের পথিকৃতদের আগমন ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল ভোগকারী এই মধ্যশ্রেণি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সাথে আপোষমূলক নীতি অনুসরণ করে এবং এ বন্দোবস্তই জাতীয়তাবাদের আপোষ নীতির উৎস। তৎকালীন সমাজের একমাত্র সংগ্রামী শক্তি অর্থাৎ কৃষকের বিরোধিতার ভিত্তিতে বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলন যে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেছিল তা বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ নয়, তা ছিল জমিদার ও মধ্যশ্রেণির নিজস্ব জাতীয়তাবাদ; তা ইংরেজ শাসনের সহযোগিতায় সমাজের সংগ্রামী গণশক্তির উপর তাদের নিজ শ্রেণির প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টারই এক বিশেষ রূপ। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতেই ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকগণ আন্দোলন শুরু করে। অবশ্য কৃষক সংগ্রামের এ খণ্ড খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থানগুলো ভারতের হৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপও বলা হয়। তবে সচেতন নেতৃত্বের অভাব, শ্রেণিচেতনাহীনতা, ঐক্য ও জাতীয় সংস্কৃতি বিহীন কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে এ সংগ্রাম আন্দোলনকে অখণ্ড সংগ্রামে পরিণত করা সম্ভবপর হয়নি। এ ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের জন্য এসময় যারা সর্বাধিক যোগ্য ছিলেন সেই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নায়কগণ এক্ষেত্রে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। এসময় তারা বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে শ্রেণিস্বার্থ বজায় রেখে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শিক্ষা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তারা তৎপর ছিলেন। যেখানে ব্রিটিশ শাসনকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রবক্তাগণ 'ভগবানের আশীর্বাদ' বলে স্তুতি গেয়েছেন, এর সমৃদ্ধি

চেয়েছেন সেখানে কৃষক সম্প্রদায় একে 'ভগবানের অভিশাপ' রূপে গণ্য করে এর উচ্ছেদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন।

কৃষক সংগ্রামের সময় উনবিংশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রধান কর্মীদল ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য ও কৃষকদের সমর্থন প্রদান এই দ্বিমুখী স্রোতের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে যায়। এ সময় মধ্যবিত্তশ্রেণির শহুরে অংশের মধ্যে যারা কায়েমী, স্বার্থহীন ও গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন কেবল তারাই সেই যুগের একমাত্র সংগ্রামী শক্তি কৃষকের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহানুভূতি জানাতে পেরেছিলেন এবং এর দ্বারা ভবিষ্যৎ কালের মধ্যশ্রেণির জন্য এক মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন। এখানে প্রথমত মনে রাখা দরকার যে, উনবিংশ শতকের নবজাগরণ বৈদেশিক শাসনের কাঠামোর মধ্যেই ঘটেছিল। তাঁর ফলে তাঁর মধ্যে প্রত্যাশিত সকল দিকের বিকাশ সম্ভব ছিল না। কোম্পানির শাসন ব্যবস্থার অধীনে থেকে কৃষক শ্রেণির পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিপক্ষে কোন কার্যকরী আন্দোলন করা উনবিংশ শতকের পটভূমিকায় কঠিন ছিল। নিজে জমিদার বংশের সন্তান হলেও চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় কৃষকদের কিরূপ দুরবস্থা হয়েছিল তা রামমোহন রায় সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে তুলে ধরে তাঁর সাক্ষ্যে বলেন, "চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারি এই দুই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় কৃষকদের দুর্দশার সীমা নেই। একটি ব্যবস্থার দ্বারা তাঁরা জমিদার শ্রেণির লোভ ও উচ্চাকাঙ্খার শিকার হয়েছে, অপরটির দ্বারা তাঁরা আমিন ও রাজস্ব কর্মচারীদের শোষণে জর্জরিত।"[৪৬] মধ্যবিত্তের উপর তাঁর আস্থা থাকলেও জনগণের উপরে তাঁর আস্থার অভাব দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতকের নেতারা ভারতে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণের রূপ ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারেন। এ জন্য তাঁরা ক্রমে প্রতিবাদী হন। নবজাগরণের প্রথম দিকে এ বিষয়ে তাদের অজ্ঞতা পড়ে কেটে যায়।

বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনের মূল উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত। তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে, বঙ্গীয় রেনেসাঁসে যে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা ছিল তা একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং তা সবসময়েই ছিল আপসমুখী। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনকে রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন বলা যায় কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়। অন্যদিকে ভূস্বামী প্রভৃতি কৃষক শোষণের অংশীদার সহ ইংরেজ শক্তির প্রভুত্ব ভারতভূমি হতে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ তথা ভারতের কৃষক সম্প্রদায় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালনা করেছিল সেটাই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করেছিল।

ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে খ্যাত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হলেও এটি ভারতের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানবিধ পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এ মহাবিদ্রোহের পর থেকেই মূলত ইংরেজ শাসনের প্রতি এদেশীয় মধ্যশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলের মধ্যশ্রেণির ইংরেজ ভক্তি তখনও অটুট থাকলেও শহুরে অংশটি বেকার সমস্যার ভয়াবহতা, অর্থনৈতিক সংকট, ব্রিটিশ শোষণের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করে এবং তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ ভক্তি হ্রাস পেতে শুরু করে। এসময় এ অংশটির মধ্যে ক্রমশ ইংরেজ বিরোধিতার লক্ষণও দেখা যায়। অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়ে দিশেহারা শহুরে মধ্যশ্রেণি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুপ্রেরণা খুঁজে পায় শহরের নবজাত শ্রমিক শ্রেণির আত্মরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহ হতে। সমসাময়িক কালে ঘটে যাওয়া কৃষকদের বিদ্রোহ, যেমন ১৮৬০-৬১ সালের নীল বিদ্রোহ, ১৮৭২ সালের সিরাজগঞ্জ ও পাবনার বিদ্রোহ তাদেরকে সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে বাংলার নীল চাষীদের সংগ্রাম তৎকালীন বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায়। দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীল দর্পণ' নাটকটি ঔপনিবেশিক ইংরেজদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিচয় বহন করে। এ বিদ্রোহ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং অশিক্ষিত কৃষকরাও যে সংঘবদ্ধ হতে পারে এ বিদ্রোহ তা প্রমাণ করে। এ বিদ্রোহে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি সরাসরি নেতৃত্ব না দিলেও আংশিক সমর্থন দ্বারা সরকারকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে সক্ষম হয়। এ সময় বিদ্রোহী চাষীদের পক্ষে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩ খ্রি.) প্রমুখ মধ্যবিত্তশ্রেণির নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণ হতে বোঝা যায়। এসময়ের মধ্যবিত্তশ্রেণি এ সংগ্রাম থেকেই যে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা লাভ করেছিল তা শিশির কুমার ঘোষের উক্তি

Dhaka University Institutional Repository

হতেই বোঝা যায়, "এই নীল বিদ্রোহই সর্বপ্রথম দেশের লোককে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছিল। বস্তুত বাঙলা দেশে ব্রিটিশ রাজত্বকালে নীল বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।"[৪৭]

প্রায় একই সময়ে ১৮৭৭ সালে নাগপুরের শিল্পকেন্দ্রে ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট, ১৮৮২ হতে ১৮৮৪ সালের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে কয়েকটি বৃহৎ শ্রমিক ধর্মঘট হয় এবং পাশাপাশি ১৮৭৫ সালে সমগ্র দাক্ষিণাত্যব্যাপী কৃষক বিদ্রোহ এবং মহারাষ্ট্র, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের ব্যাপক কৃষক অভ্যুত্থান ভারতবাসীর কাছে এক নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়। এসময় শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণি এ সকল আন্দোলন সংগ্রাম হতেও প্রেরণা নিয়ে নিজস্ব পন্থায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আয়োজন করে। এদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামই তথাকথিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন রূপে দেখা দেয়, যা বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকাশ লাভ করেছিল। তবে এ আপোষমূলক জাতীয়তাবাদী মনোভাব ছিল কৃষক আন্দোলনের বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম মধ্যবিত্তশ্রেণির নায়কগণকে নিশ্চিতভাবেই জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দান করেছিল ও তাদেরকেও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছিল এবং সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ও স্বাধীনতার আকাঙ্খার উন্মেষ বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর নিরবচ্ছিন্ন গণ সংগ্রাম অর্থাৎ কৃষক সংগ্রামেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। আলোচনার শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বৈদেশিক শাসনের বিরোধিতায় এবং সংগ্রামী চেতনায় উন্নত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রগতির জ্ঞানের অভাব থাকলেও কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থান নিশ্চিতভাবেই রেনেসাঁসের মহান ব্যক্তিত্বদের চিন্তা চেতনা ও ভাবধারার চেয়ে দেশের অগ্রগতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা আনয়নে অগ্রগামী এবং ইতিবাচক ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)*, বাংলা একাডেমী, ২০১২, পৃ.২২২

২। R.C. Majumdar, *Bengal in the Nineteenth Century*, Calcutta, December 1960, p.07

৩। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৪০২ (বঙ্গাব্দ), পৃ.৫১

৪। সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুক ওয়ার্ল্ড, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ.১৫০

৫। সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫১

৬। B.B. Misra, *The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times*, Oxford University Press, Delhi, 1960, p.349

৭। Karl Marx, *Selected Works*, Progress Publisher, Moscow, 1973, p.131

৮। Ramsay Muir, *The Making of British India*, Manchester : At the University Press, London, 1923, p.4

৯। Ramsay Muir, *op.cit.*, p.188

১০। A.R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Book Depot, Bombay, 1948, p.167

১১। বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪৯

Dhaka University Institutional Repository

১২। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৪

১৩। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৪-৯৫

১৪। মিহির আচার্য, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা*, লেখক সমাবেশ, কলকাতা, জুলাই ১৯৩৫, পৃ.৬২

১৫। A.R. Desai, *op.cit.*, p.167

১৬। A.R. Desai, *op.cit.*, p.168

১৭। A.R. Desai, *op.cit.*, p.169

১৮। সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৭

১৯। সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৭-১৫৮

২০। সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৫

২১। সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৫৫

২২। শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী, *বঙ্গের কৃতি সন্তান*, প্রথম ভাগ, দি নিউ কমলা প্রেস, কলকাতা, মাঘ ১৩৫২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ.০২

২৩। R.C. Majumdar, *op.cit.*, p.53

২৪। F.B. Bradley-Birt, *Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century*, Cotton Press, Calcutta, 4th Edition, p.25

২৫। B.N. Dasgupta, *The Life & Times of Rajah Rammohun Roy*, Ambika Publications, New Delhi, 1980, p.323

Dhaka University Institutional Repository

২৬। Dr. Kalidas Nag & Debajyoti Burman (ed.), *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1995, V-III, p.07

২৭। B.N. Dasgupta, *op.cit.*, p.219

২৮। Jatindra Kumar Majumdar, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India, A Selection from Records (1775-1845)*, Art Press, Calcutta, 1941, p.297

২৯। Dr. Kalidas Nag & Debajyoti Burman (ed.), *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1995, V-I, p.13-35

৩০। Dr. Kalidas Nag & Debajyoti Burman (ed.), *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1995, V-III, p.85

৩১। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৩

৩২। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৪

৩৩। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৫

৩৪। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *গ্রন্থাবলী*, প্রথম ভাগ, বসুমতি সংস্করণ, (উদ্ধৃত), আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৪

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্গদেশের কৃষক (দেশের শ্রীবৃদ্ধি)*, পৃ.০৮ (উদ্ধৃত), সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬২

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। 'আনন্দমঠ' এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ১৮৮২, (উদ্ধৃত), সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৬৪

৩৭। মিহির আচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৬

৩৮। Priti Kumar Mitra, "Hindu Reform Movements", Sirajul Islam (ed.), *History of Bangladesh (1704-1971)*, Vol-III (Social and Cultural History), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997, p.258

৩৯। Arabinda Poddar, *Renaissance in Bengal Quests and Confrontations 1800-1860*, Indian Institute of Advance Study, Simla, 1960, p.178

৪০। গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ.১৩৯

৪১। আবদুল বাছির, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২১৫

৪২। মোহিতলাল মজুমদার, *বাংলার নবযুগ*, জ্ঞানোদয় প্রেস, কলিকাতা, পৃ.৯৮

৪৩। সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৫-১৭৬

৪৪। সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৭৬

৪৫। N.S. Bose, *Indian Awakening at Bengal*, Calcutta, 1969, Preface

৪৬। Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance*, Papyrus, Calcutta, July 1979, p.93-94

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। Amrita Bazar Patrika, 22nd May, 1874. (উদ্ধৃত), সুপ্রকাশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮১

উপসংহার

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ শক্তির জয় লাভের ফলে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগ পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ পরিবর্তন কোন আকস্মিক বিষয় ছিল না। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখল ছিল তাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার ফসল। সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে শিল্প বাণিজ্যে উন্নত ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠী ভারতে আসে। এ বণিক গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক একচেটিয়াত্ব লাভের যে লড়াই চলে তাতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শক্তি জয় লাভ করে। পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে তাঁরা এদেশে ঔপনিবেশিক যুগের সূচনা করে। মুঘল রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন শুরু হয় ঔপনিবেশিক যুগে (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.)। এসময় শাসন ছিল নামে মাত্র, শোষণই ছিল বণিক শাসকের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁরা প্রথমে ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থার প্রচলন এবং ভূমি রাজস্ব হিসেবে ফসলের পরিবর্তে নগদ মুদ্রার প্রচলন এ দেশের দীর্ঘকালের গ্রাম সমাজের ভিত্তি ভেঙ্গে ফেলে। একই সঙ্গে জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হল নিজস্ব মালিকানা। এ ব্যবস্থা ছিল এদেশের মানুষের অজানা।

মুঘল আমলের (১৫২৬-১৮৫৭ খ্রি.) ভূমি ব্যবস্থা ইংরেজ শাসনামলে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায় ব্যাপকভাবে। ঔপনিবেশ পূর্ব বাংলায় ভূমির ব্যবহার ও মালিকানা নিয়ে কৃষকশ্রেণি ও সরকারের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। বাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে তখন আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার কোন পরিচয় ছিল না। ফলে কে কখন শাসক হলেন বা ক্ষমতা হারালেন তা নিয়ে জনগনের বিশেষ কোন চিন্তা ভাবনা বা আগ্রহ ছিল না। এ সময়ে রাষ্ট্রই ছিল জমির মালিক, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক যুগে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তৈরি করা হয় জমির হস্তান্তর যোগ্যতা। জমির মালিক হল তাঁরা যারা মুঘল আমলে জমিদার ও গোমস্তা ছিল। অন্যত্র গ্রাম সমাজের প্রধান হলেন জমির মালিক। এরা খাজনা আদায় করত এবং প্রয়োজনে জমি বণ্টন ও বন্ধক রাখত। এদের অত্যাচার, নির্যাতন ও লোভ লালসার কারণেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছিল। এরপর এল বাংলায় সরাসরি ইংরেজ শাসন। পাঁচসনা, একসনা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সমস্ত করের বোঝা গিয়ে পড়ল কৃষকের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

আর কৃষক নিজেই হল জমিহারা। এখন জমিদার হল জমির মালিক। এসময় মালিক-প্রজার সম্পর্ক ভালো থাকার কোন কারণই ছিল না। নব্য জমিদারের প্রত্যাশা বেশি রাজস্ব আর কৃষক ফিরে দেখতে চায় যে, মুঘল আমলে সে অনেক ভালো ছিল। আর এসময় জমিদার আর কৃষকের মাঝে অতি মুনাফা লোভী ইংরেজ দণ্ডায়মান ছিল। জমিদার নির্ধারিত দিনে জমির জমা দিতে না পারলে সূর্যাস্ত আইন অনুসারে সে জমিদারী হারাবে। এই আইনে ইতোমধ্যে অনেকে জমিদারী হারিয়ে পথে বসেছেন। যারা টিকে ছিলেন তাদের অন্যতম বর্ধমান রাজ তেজেন্দ্র রায় (১৭৭০-১৮৩২ খ্রি.) নিজের অবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য পত্তনি ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটান। জমিদারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে অন্যের কাছে পত্তনি দিয়ে নিজের অবস্থা টিকিয়ে রাখেন। অন্যরাও এসময় তাঁকে অনুসরণ করে। ফলে এ ধারায় বাংলায় অসংখ্য পত্তনিদারের সৃষ্টি হয়। এ ব্যবস্থায় নিজের দিকের কৃষকের উপর পর্যন্ত ১২ বা ১৭ স্তরের পত্তনিদারের সৃষ্টি হয়। এরা সবাই কৃষক শোষণের উপর নির্ভরশীল ছিল। আর তাঁরা ছিল বাংলায় ইংরেজ সরকারের সামাজিক ভিত্তি। কৃষক শোষণে এরা প্রত্যেকে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছিল। এরাই বাংলার আধুনিক মধ্যবিত্তের সূচনা পুরুষ। ১৮৬২ সালে ভারত সচিব চার্লস উড, ভাইসরয়ের নিকট লিখিত এক পত্রে এ আশংকা অকপটে স্বীকার করেন যে, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিজাত নতুন শ্রেণিটি সুযোগদানকারী শাসন ব্যবস্থার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। ইংরেজ সরকারও এ ব্যবস্থায় খুশি এ কারণে যে, এতে সরকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সামরিক ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে সে দিকে কারো নজর নেই।

ফলে দেখা যায় যে, ইংরেজ শাসন যতই এগিয়ে চলে কৃষকশ্রেণির সনাতন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ততই অবক্ষয়ের মুখে পড়ে। সরকারের নীতির কারণেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই কৃষক ও কারিগরশ্রেণি। ফলে ইংরেজ সরকার ও সরকার সৃষ্ট অন্যান্য আজ্ঞাবহ শ্রেণির বিরুদ্ধে বাংলার নানা স্থানে কৃষক ও কারিগরদের অসংখ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়, যা এ শাসনব্যবস্থার পতন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ঔপনিবেশিক যুগের ভূমিব্যবস্থা, বাণিজ্য প্রথা, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন-আদালত, প্রশাসন ইত্যাদি ব্যবস্থার বিপরীতে বাঙালির সনাতন সংগঠন ও নেতৃত্বের টিকে থাকা ছিল অসঙ্গতিপূর্ণ। ঔপনিবেশিক সরকারের ভূমিনীতির ফলে গ্রামীণ সমাজে নানা স্তরভেদ তৈরি হয়। ক্ষুদ্র জমিদার, অনুপস্থিত জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, জোতদার, পাইক, চাকরান ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগী ও ধনী কৃষক সমন্বয়ে উদ্ভব হয় একটি ভূমিভিত্তিক মধ্যবিত্তশ্রেণি। এছাড়াও বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এদেশে বাণিজ্য ও শিল্পভিত্তিক মধ্যবিত্তের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কলকাতা হয়ে ওঠে পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এর পাশাপাশি আধুনিক ও পাশ্চাত্য বিদ্যা ইংরেজির প্রবর্তনে এদেশে একশ্রেণির শিক্ষিত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটায়। এই নব্য উদীয়মান মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রায় সবাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাঁরা শহর কেন্দ্রিক বিলাস বহুল জীবন যাপন করতেন। অনেকে গ্রামের সাথে কোন সম্পর্কই রাখতেন না। তাদের হয়ে নায়েব গোমস্তারা গ্রামের কৃষককে নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন করতেন। যেহেতু এ সমাজে বিত্তই সব। কাজেই বিত্তকে কেন্দ্র করে তৈরি হল স্তরভেদ। বিত্তের জোরে এসেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও শিক্ষালব্ধ উদারতাবোধ। অন্যদিকটিও সত্য। এই অর্থই এনেছে স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতা ও পরশ্রীকাতরতার মত বিষয়গুলো। এই নতুন শ্রেণিটি উভয় ভাবধারা নিয়েই চলতে শুরু করে। তাদের মধ্যকার একাংশ ইংরেজি ভাষা শিখে কোম্পানির কেরানীর অভাব পূরণ করতে শুরু করে আর অন্যরা চাকুরীর স্থলে কোম্পানির ব্যবসায় বাণিজ্য ও কুঠিতে নিযুক্ত হন।

কেরানি তৈরির উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ভারতবর্ষে যে ব্যয়বহুল ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল সেই সুযোগ গ্রহণ করেই মূলত এ মধ্যবিত্তশ্রেণির আবির্ভাব হয়। নিজ স্বার্থে এ শ্রেণির জন্ম দেয়া ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। তাঁরা চেয়েছিল আধুনিক শিক্ষার গুণে এ শ্রেণিটি ইংল্যান্ডকে স্বদেশ ও ইংরেজদের পরমাত্মীয় বলে মনে করবে এবং কখনোই ইংরেজ শাসনের বিরোধী হবে না। তাদের এ উদ্দেশ্য যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তা আর বলার অবকাশ রাখে না। এর প্রমান এই যে, জন্মলগ্ন থেকেই এ শ্রেণিটির মধ্যে কার্যকর ছিল সুবিধাবাদ ও স্ববিরোধীতা। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসন

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার সনাতন শাসকশ্রেণি এবং প্রজা সাধারণ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কিন্তু পরম সুবিধা লাভ করেছিল এই নব্য মধ্যবিত্তশ্রেণি, যারা প্রচুর বিত্তের মালিক হয়ে কলকাতায় বসবাস করতেন।

কালের অতলে যখন এদেশে পুরাতন শাসকশ্রেণি তলিয়ে গিয়েছিল, তখন এই নবগঠিত মধ্যবিত্তশ্রেণি লাভ করেছিল অভূতপূর্ব সুযোগ সুবিধা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সেকালের ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কথা। এখানকার সেরা ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে বিরাট বিরাট স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু তাদের সেসব স্বপ্নের মধ্যে কৃষক ছিল না। এরা সবাই প্রকৃতই ছিলেন মেকলের মানসপুত্র। ফলে ব্রিটিশদের প্রতি এ শ্রেণির অনুরাগ ছিল অসীম। এরা সবসময় ব্রিটিশ শাসনের দীর্ঘায়ু কামনা করত এবং তাদের সব রকম সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত ছিল। এসময় আনুগত্যই ছিল সচেতনতার লক্ষণ, আর প্রতিরোধকারী সনাতন জাতীয়তাবাদীরা আখ্যায়িত হন রাজনৈতিকভাবে 'অসচেতন' ও 'পশ্চাৎপদ' শ্রেণি হিসেবে।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থায় মাঝারি ও ছোট আকারের জমিদার উপস্বত্বভোগী বিভিন্ন প্রকারের তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি সমন্বয়ে বাংলায় ভূম্যধিকারী মধ্যবিত্তশ্রেণি গঠিত ছিল যা অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। বাঙালি সমাজে এই শ্রেণিটি ক্রমে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে এবং হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষ জমিদারও নয় আবার কৃষকও নয়। সুবিধা লাভের আশায় এ শ্রেণি কখনো জমিদারদের তুষ্ট করেছে, আবার কখনো ইংরেজদেরকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করেছে।

অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে অনেকটা সময় অতিবাহিত হবার পর উনবিংশ শতকের শেষদিকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে একটি শিক্ষিত শ্রেণির উত্থান ঘটে। এই শ্রেণিটি প্রধানত ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে সৃষ্ট বিভিন্ন আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। ফলে বিংশ শতকের প্রারম্ভে মুসলমান সমাজে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণি আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষা গ্রহণ ও বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বাধীন পেশা গ্রহণ করে এই শ্রেণিটি স্বীয় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জন করে। এই মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণি আকারে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির চেয়ে ছোট হলেও মুসলমান সমাজকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার দায়িত্ব ছিল

Dhaka University Institutional Repository

এ শ্রেণিটির। ফলে দেখা যায় যে, আলোচ্য এ গবেষণায় মধ্যবিত্তশ্রেণির যে প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। এরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে কৃষির সাথে সম্পর্কহীন এবং বাংলায় ইংরেজ সরকারের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ভিত্তি স্বরূপ। এসময় তাঁরা শহরে 'বাবু কালচার' এর জন্ম দিয়েছিল। অথচ বঙ্গদেশের শতকরা ৯০ জন মানুষেরই এই কালচারের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। নব্য মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধি ও তাদের অধীনস্তরা গ্রামের কৃষককে মানুষই মনে করত না। তাদের নায়েব, গোমস্তারা যে কৃষকদের অত্যাচার ও নির্যাতন করে তাঁর খবরও এই নব্য শ্রেণিটি রাখত না। অথচ এ সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তশ্রেণিতে উন্নীত হবার মূলসূত্রই ছিল কৃষক শোষণ।

পরবর্তীকালে এই মধ্যবিত্তশ্রেণির নেতৃত্বেই উনবিংশ শতকের বাংলায় বঙ্গীয় রেনেসাঁসের জন্ম হয়েছিল, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই কৃষকদের মুক্তির কোন কথা বলা হয়নি। এমনকি বাংলার কৃষকের অধিকার ও বিদ্রোহে এই বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণির ইতিবাচক কোন মনোভাবও ছিল না। তাঁরা ছিলেন ইংরেজদের সহযোগী আর ইংরেজরা ছিল তাদের রক্ষাকর্তা। এ বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, কেশবচন্দ্র সেন, রাধাকান্ত দেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

উনবিংশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁস একদিকে এদেশে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করতে ব্যর্থ তো হয়ই, বরং অন্যদিকে তাঁরা ইংরেজ প্রভুর শাসনকে 'ভগবানের আশীর্বাদ' বলে স্বীকার করে তাদের সমর্থনে নিজেদের নতুন করে গড়ে তুলতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু দেখা যায় ঠিক এই সময়েই ইংরেজ শাসন ও জমিদারশ্রেণির বিরুদ্ধে পরিচালিত নিরবিচ্ছিন্ন কৃষক সংগ্রাম সমগ্র জাতির সম্মুখে এক নতুন সংগ্রামী ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে এই ইংরেজ জমিদার বিরোধী কৃষক সংগ্রামের সাথে শ্রমিকের শ্রেণিসংগ্রাম মিলিত হয়ে সেই বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে আরও ব্যাপক করে তুলেছিল। কৃষক শ্রমিকের এই

Dhaka University Institutional Repository

মিলিত সংগ্রামই বিংশ শতাব্দীর কম্যুনিস্ট, সমাজবাদী প্রভৃতি সকল বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল আন্দোলন ও ভাবধারার একমাত্র উৎস।

বাংলার বৃহত্তর কৃষকশ্রেণিকে এসময় যারা সচেতন করতে পারত তাঁরা ছিল মধ্যবিত্তশ্রেণি। অথচ এ মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধিরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উন্নত হয়েও কৃষক বিদ্রোহকে সমর্থন না দিয়ে সমর্থন দিয়েছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র এবং এর সহযোগীদের। অর্থাৎ সেদিনের বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণি নিজেই ছিল এই শক্তির পরিচর্যাকারী। অথচ এরূপ মধ্যবিত্তশ্রেণিই কিন্তু বিভিন্ন দেশে এমনকি ইউরোপেও কৃষককে সাথে নিয়ে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসে একত্রে কাজ করেছে। কৃষকদেরকে মুক্তি এনে দিয়েছে। কৃষকের একার পক্ষে কোন বিপ্লবে সফল হওয়া সম্ভব নয়। এখানেই প্রয়োজন হয় মধ্যবিত্তশ্রেণির। কিন্তু বাংলার কৃষক সমাজের জন্য মধ্যবিত্তশ্রেণির বিপরীত ভূমিকাই পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই বলা যায় রাজা রামমোহন রায়ের কথা। আধুনিক ভারতের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তিনি ইংল্যান্ডে যাবার সময় কলকাতায় একটি ফরাসি জাহাজ দেখে সেটিকে খালি পায়ে অভিবাদন ও সালাম জানিয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবে (১৭৮৯ খ্রি.) গণমানুষের মুক্তি এসেছিল বলে তিনি এ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। অথচ সেই তিনিই ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলেন। সেখানে প্রদত্ত ভাষণে তিনি ভারতের কৃষকদের বিরুদ্ধে এবং কোম্পানির শাসনের পক্ষে মতামত তুলে ধরেছেন। একই সাথে বলা যায়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের আরেক দিকপাল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি তাঁর প্রথম দিকের লেখা 'সাম্য'তে কৃষকের পক্ষে মতামত তুলে ধরলেও পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর রচনায় কৃষকের বিরুদ্ধেই লিখে গেছেন। বিশেষ করে তিনি তাঁর 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী' নামক উপন্যাসদ্বয়ে কৃষক বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে এমনভাবে বিকৃত করে দেখিয়েছেন যেন ভারতে ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই কৃষকগণ বিদ্রোহ করেছিল। তিনি কিংবা রাজা রামমোহন রায় তাদের এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজ শ্রেণির চরিত্র ও চিন্তাধারাই প্রকাশ করেছেন মাত্র। তবে ব্যতিক্রম ছিলেন একজন, তিনি হলেন দীনবন্ধু মিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিক আলোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, রেনেসাঁসের মূল ভাবার্থই হল গণ মানুষকে আলোকিত করা। সেটা যে কোন কালে যে কোন রাষ্ট্রের জন্যই প্রযোজ্য। মধ্যযুগ হতে আধুনিক যুগে উত্তরণের অন্যতম মাধ্যম ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এটাই ছিল মূল বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি কৃষক, মজুর, কারিগর অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণির মানুষের অধিকার রক্ষা করাও ছিল এই রেনেসাঁসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসে এ দিকটি সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়ে পড়েছিল। যেটিকে এ রেনেসাঁসের একটি অন্ধকার দিক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজ শাসনামলে বাংলায় শুরু হওয়া বঙ্গীয় রেনেসাঁস ছিল সমাজের উপর তলার জনগণের একটি ভাবনার বিষয় যা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে যেতে পারেনি। তাঁরা কখনোই সমাজের উপর তলা থেকে নেমে এসে সাধারণ মানুষের কাতারে একত্রিত হতে পারেননি। একটি পর্যায় পর্যন্ত তাঁরা এ ভাবাদর্শকে লালন করেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষকে এর সাথে সম্পৃক্ত করেননি। এ ঘটনাকে অনেকটা এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, হাওয়া বয়েছিল সমাজের উপর তলার চিলেকোঠার একটি ছোট আধখোলা জানালা দিয়ে। সেই হাওয়া সমাজের বৃহত্তর অংশের গায়েই লাগেনি, মনে তো নয়ই। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, এ রেনেসাঁস ব্যক্তিত্বরা যদি তাদের লেখনি এবং চিন্তা চেতনার মধ্যে কৃষকের পক্ষে কোন মতামত প্রদান করতেন তাহলে বঙ্গীয় কৃষক অনেক উপকৃত হতে পারত। কিন্তু পাশাপাশি একথাও সত্য যে, কৃষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামগুলোই মধ্যশ্রেণির নায়কদেরকে জাতীয়তাবাদের শিক্ষা দান করেছিল এবং তাদেরকেও জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছিল। কারণ বঙ্গীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ভারতের 'জাতীয় আন্দোলন' এর সূচনা হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক সংকটের চাপে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে মধ্যবিত্তশ্রেণি ইংরেজ শাসনের বিরোধিতার পথে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছিল যা প্রকারান্তরে জাতীয় আন্দোলনের রূপ লাভ করেছিল। কিন্তু এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রায় একই হলেও এ শ্রেণিটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক জনসাধারণকে দূরে রেখেই জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং ভারতবর্ষকে ইংরেজ শাসনের কবল হতে মুক্ত করেছিল। কিন্তু বৃহত্তর কৃষক

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হল না। এখানেই তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইউরোপীয় মডেলের কোন রেনেসাঁস বাংলায় বা বাঙালি সমাজে হয়নি। আমরা ইউরোপীয় আলোকে সব কিছু দেখতে ও বিচার করতে শিখেছি মাত্র। বঙ্গীয় রেনেসাঁস একটি পরাধীন জাতির রেনেসাঁস। একটি স্বাধীন জাতি না হলে সত্যিকারের রেনেসাঁস হয় না। বাংলার রেনেসাঁস ছিল ইংরেজদের আরোপিত ভূমি ব্যবস্থা জাত জমিদার, তালুকদার, সহযোগী ব্যবসায়ী ও ইংরেজদের বেতনভূক্ত কর্মচারী শ্রেণির দ্বারা সৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি শহর ব্যতিত বিশাল বঙ্গদেশে এর উপস্থিতি ও প্রভাব চোখে পড়েনি। রেনেসাঁসের আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন সংগ্রাম বিমুখ। বিদেশী শাসন ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে তাঁরা আর্থ-সামাজিক কোন সংগ্রামে ছিলেন না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষক শ্রেণি হারালো তাদের বহু দিনের অধিকার ভূমিস্বত্ব। নব্য জমিদার হল জমির মালিক। অনুপস্থিত জমিদাররা কলকাতায় আরাম আয়েশে ব্যস্ত। তাঁরা খাজনা আদায়ের জন্য পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সেপত্তনিদার, গাঁতিদার প্রভৃতি নানা মধ্যসত্বভোগী সৃষ্টি করল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এসব স্তরে পেল তাদের আর্থিক স্বার্থের আশ্রয়। পিরামিডের মত বাংলার কৃষক সমাজের বুকের উপর এই মধ্যসত্বভোগী শ্রেণি চড়ে বসল। তাদের সমবেত শোষণের কেন্দ্রবিন্দু হল কৃষক। এই উপস্বত্বভোগী বা মধ্যসত্বভোগী শ্রেণিই হল বাগ্গার রেনেসাঁসের ধারক বাহক। কৃষকদের দুঃখ দুর্দশার এবং দুর্দশাজাত কৃষকদের বিদ্রোহের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা ইংরেজ রাজত্বকে ‘বিধাতার আশীর্বাদ’ হিসেবে গণ্য করে কৃষক সমাজকে পরিত্যাগ করে। তাই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ফলে বাঙালি কৃষক সমাজের কোন মুক্তি আসেনি অথচ যা আসা ছিল প্রত্যাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস

Allami, Abul Fazl, *"Ain-I-Akbari"*, Translated From the Original Persian By Colonel H.S. Jarrett, Asiatic Society of Bengal, Vol-2, Calcutta, 1891.

Ali, Karam, "*Muzaffarnamah*", Translated into English : Jadunath Sarkar in *Bengal Nawabs*, Asiatic Society, Calcutta, 1985.

"The Jahangirnama, Memoirs of Jahangir, Emperor of India", Translated, Edited & Annotated by Wheeler M. Thackston, Oxford University Press, New York, 1999.

Salim, Ghulam Husain, *Riyazu-s-Salatin*, Translated by Maulvi Abdus Salam, The Asiatic Society, Calcutta, 1902.

গৌণ উৎস (ইংরেজি গ্রন্থ)

Ascoli, F.D. *Early Revenue History of Bengal and the Fifth Report, 1812*, Aruna Prakashan, Kolkata, 2002.

Ahmed, A.F. Salahuddin, *Social Ideas and Social Change in Bengal, 1818-1835*, Leiden, 1965.

Ahmed, Rafiuddin, *The Bengal Muslims, 1871-1906 : A Quest for Identity*, Oxford University Press, New York, 1981.

Bagal, J.C. *Peasant Revolution in Bengal*, Calcutta, 1953.

Bagchi, Amiya Kumar, *Reflections on Patterns of Regional Growth in India During the Period of British Rule*, Kolkata, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

Banerjee, Anil Chandra, *The Agrarian System of Bengal, (1582-1793),* Vol-I, K.P. Bagchi and Co., Calcutta, 1980.

Bannerjea, D.N. *India's Nation Builders*, Headly Bros Publishers Ltd, London, 1919.

Berard, M.Victor, *British Imperialism and Commercial Supremacy,* Translated by Foskett, H.W. Longmans, Green, and Co. London, 1906.

Bhattacharya, Sukumar, *The East India Company and Economy of Bengal from 1704 to 1740*, Luzac & Company Ltd, London, 1954.

Birt, F.B. Bradley, *Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century*, Cotton Press, Calcutta, 4th Edition.

Bolts, William, *Consideration on India Affairs*, London, 1772.

Bose, N.S. *Indian Awakening at Bengal*, Calcutta, 1969.

Buchanan, Daniel H. *The Development of Capitalist Enterprise in India*, Macmillan, New York, 1934.

Buchanan, Ogilvie R. *Economic Geography of the British Empire*, University of London Press, London, 1935.

Chandra, Bipon, *Nationalism and Colonialism in Modern India*, Orient Longman, Delhi, 1979.

Chatterjee, Sunjeeb Chunder, *Bengal Ryots; Their Rights and Liabilities*, D'Rozario and Co. Calcutta, 1864.

Chaudhuri, K. N. *The Economic Development of India Under the East India Company 1814-1858*, Cambridge University Press, Cambridge, 1971.

Dhaka University Institutional Repository

Chaudhuri, Susil, *Trade and Commercial Organization in Bengal (1650-1720)*, Firma K.L.Mukhopadhyay, Calcutta, September 1975.

Choudhuri, Nurul H. *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2001.

Dasgupta, B.N. *The Life & Times of Rajah Rammohun Roy*, Ambika Publications, New Delhi, 1980.

Desai, A.R. *Social Background of Indian Nationalism*, Popular Book Depot, Bombay, 1948.

Dutt, Romesh, *The Economic History of India Under Early British Rule*, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd. London, August 1906.

Dutt, R.P. *India Today and Tomorrow*, People's Publishing House, Delhi, 1955.

Firminger, W.K. *Historical Introduction to the Bengal Portion of "The Fifth Report"*, R.Cambray & Co., Calcutta, 1917.

Floud, Francis, *Report of the Land Revenue Commission*, Vol-I, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1940.

Forrest, George, *The Life of Lord Clive*, Vol-I, Cassell and Company, Ltd, London, 1918.

Ghosh, Aurobindo, *The Renaissance in India and Other Essays on Indian Culture*, Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry, 1997.

Gopal, Ram, *Indian Muslims : A Political History (1858-1947)*, Asia Publishing House, Bombay, 1959.

Gould, Julius and Kolt, William L. (ed.) *A Dictionary of Social Science*, Tavistock Publication, London, 1964.

Dhaka University Institutional Repository

Govil, K.L. *The Cotton Industry of India : Prospect and Retrospect*, Hind Kitabs Publishers, Bombay, 1945.

Gretton, R. H. *The English Middle Class*, 1917.

Guha, R. *A Rule of Property for Bengal*, Orient Longman Limited, New Delhi, 1959.

Habib, Irfan, *The Agrarian System of Mughal India*, 1556-1707, Asia Publishing House, Bombay, 1963.

Harington, John H. *An Elementary Analysis of the Laws and Regulations*, Vol-I,II,III, Printed at the Honorable Company's Press, Calcutta, 1814 and 1815.

Hastings, Warren : *A Letter to the Court of Directors of the East India Company*, George Rabiwon, London, 1783.

Hill, S.C. (ed.) The Indian Records : Series : *Bengal in 1756-1757*, Vol-I,II,III, Published for the Government of India, London, John Murray, Albemarle Street, 1905.

Hunter, W.W. *Annals of Rural Bengal*, Smith, Elder and Company, London, 1868.

Hunter, W.W. *The Indian Empire : Its Peoples History and Products*, AMS Press, New York, 1966.

Islam, Sirajul, *The Permanent Settlement in Bengal, A Study of its Operation (1790-1819)*, Bangla Academy, Dacca, May 1979.

Islam, Sirajul, (ed.) *History of Bangladesh (1704-1971)*, 3 Vols, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1997.

Karim, A.K. Nazmul, *Changing Society in India, Pakistan and Bangladesh*, Nawroze Kitabistan, Dacca, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

Karim, A.K. Nazmul, *The Dynamics of Bangladesh*, Nawroze Kitabistan, Dacca.

Kaye, John W. *The Administration of the East India Company; A History of Indian Progress*, London, 1853.

Kerr, Hem C. *Report on the Cultivation of, and Trade in, Jute in Bengal and on Indian Fibres*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1874.

Kling, B.B. *The Blue Mutiny : The Indigo Disturbance in Bengal*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1966.

Kling, B.B. (ed.) *Economic Foundation of Bengal Renaissance in Aspect of Bengali History and Society*, R.V.M. Baumer, Delhi, 1976.

Kling, B.B. *Partner in Empire*, Firma KLM Private Ltd. Calcutta, 1981.

Kohn, Hans, *A History of Nationality in the East*, 1929.

Kopf, David, *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, Firma K.L.Mukhopadhayay, Calcutta, India, 1969.

Kumar, Dharma, (ed.) *The Cambridge Economic History of India*, Vol-II, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1960.

Mahmood, Syed, *A History of English Education in India (1781-1893)*, Aligarh, 1895.

Majumdar, Jatindra Kumar, (ed.) *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India, A Selection from Records (1775-1845),* Art Press, Calcutta, 1941.

Majumdar, R.C. *An Advanced History of India*, Macmillan and Company Limited, Calcutta, 1950.

Dhaka University Institutional Repository

Majumdar, R.C. *Bengal in the Nineteenth Century*, Calcutta, December 1960.

Majumdar, R.C. (ed.) *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Part-II, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1965.

Malcolm, John, *The Life of Lord Clive*, Vol-I,II, John Murray, Albemarle Street, London 1830.

Malleson, Colonel G.B. *Lord Clive and the Establishment of the English in India*, Oxford, At the Clarendon Press, 1900.

Mallick, A.R. *British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856*, Bangla Academy, Dacca, June 1977.

Marshall, P.J. *East Indian Fortunes: The British in Bengal in the Eighteenth Century*, Oxford, Clarendon Press, 1976.

Marx, Karl, *The Future Results of British Rule in India*, New York, 1853.

Marx, Karl, *Selected Works*, Progress Publisher, Moscow, 1973.

Metcalf, Thomas R. *Land, Landlords and the British Raj*, University of California Press, Berkely, 1979.

Misra, B.B. *The Indian Middle Classes*, Oxford University Press, Delhi, 1960.

Misra, B.B. *The Central Administration of the East India Company 1773-1834*, Oxford University Press, India Branch, 1959.

Misra, B.B. *The Administrative History of India (1832-1947)*, New Delhi, 1970.

Dhaka University Institutional Repository

Muir, Ramsay, *The Making of British India 1756-1858*, Manchester: At the University Press, London, August, 1915.

Mukherjee, Amitabha, *Reform and Regeneration in Bengal 1774-1823*, Calcutta, 1960.

Mukerjee, Radha Kamal, *Land Problems of India*, Longmans, Green & Co. Ltd, London, 1933.

Nag, Kalidas, & Burman, Debajyoti, (ed.) *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1995, Vol-I-VII.

Natarajan, L. *Peasant Uprisings in India*, *1850-1900*, People's Publishing House, Bombay, 1953.

Nurullah, Syed, and Naik,J.P. *History of Education in India*, Macmillan & Co. Ltd. Bombay, 1943

O' Malley, L.S.S. (ed.) *Modern India and the West*, Oxford University Press, London, 1941.

Orme, Robert, *A History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan*, Vol-II, Pharoah and Co., Madras, 1861.

Parvate, Trimbak Vishnu, *Makers of Modern India*, University Publishers, Jullundur, 1964.

Phillips, C.H. and Doreen, M. *Indian Society and African Studies*, Praaeger Publishers, London, 1976.

Pillai, P.Padmanabha, *Economic Conditions in India*, George Routledge and Sons Ltd. London, 1925.

Poddar, Arabinda, *Renaissance in Bengal Quests and Confrontations 1800-1860*, Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

Powell, B.H.Baden, *A Short Account of the Land Revenue and its Administration in British India; with a Sketch of the Land Tenures*, Oxford, At the Clarendon Press, 1907.

Qureshi, I.H. *The Muslim Community of Indo-Pakistan Subcontinent, 610-1947 : A Brief Historical Analysis*, The Hague : Mouton and Company, London, 1962.

Rahim, M.Abdur, *The Muslim Society and Politics in Bengal (1757-1947)*, The University of Dhaka, 1978.

Ray, S.C. *The Permanent Settlement in Bengal*, Rai M.C. Sarkar Bahadur & Sons, Calcutta, 1915.

Roychowdhury, B.K. *Permanent Settlement and After*, The Book Company, Ltd. Calcutta, 1942.

Sarkar, Jadunath, (ed.) *The History of Bengal*, Vol-II, Muslim Period 1200-1757, The University of Dacca, Ramna, Dacca, August 1948.

Sarkar, S.C. & Datta, K.K. *Modern Indian History*, Vol-II, The Indian Press (Pubs.) Private, Ltd. Allahabad, 1959.

Sarkar, Susobhan, *On the Bengal Renaissance*, Papyrus, Calcutta, July 1979.Sen, Amit, *Notes on Bengal Renaissance*, People's Publishing House, Bombay, 1946.

Scott, James, *The Moral Economy of the Peasant : Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, Yeal University Press, New Haven, 1976.

Scrafton, Luke, *Reflections on the Government of Indostan, With a Short Sketch of the History of Bengal*, London, 1770.

Dhaka University Institutional Repository

Scrafton, Luke, *A History of Bengal : Before and After Plassey (1739-1758)*, Oxford, London, 1763, Indian Editions, Calcutta, 1775.

Seal, Anil, *The Emergence of Indian Nationalism*, Cambridge, 1963.

Sen, Amit, *Notes on Bengal Renaissance*, People's Publishing House, Bombay, 1946.

Sen, Sunil, *Agrariyan Relations In India*, New Delhi, 1979.

Shelvankar, K.S. *Problems of India*, Penguin Books, London, 1943.

Singh, S.B. *European Agency Houses in Bengal (1783-1833)*, Firma K.L.Mukhopadhayay, Calcutta, 1960.

Sinha, J.C. *Economic Annals of Bengal*, Sri Gouranga Press, Calcutta, 1926.

Sinha, N.K. *The Economic History of Bengal*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1956.

Sinha, N.K. *The History of Bengal (1757-1905)*, 2 Vols, Calcutta University Press, Calcutta, December 1967.

Spear, Percival, *The Oxford History of Modern India (1740-1975)*, Oxford University Press, Delhi, 1978.

Stewart, Charles, *The History of Bengal*, Black, Parry, and Co. London, 1813.

Taylor, James, *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca*, Military Orphan Press, Calcutta, 1840.

Dhaka University Institutional Repository

Thomas, F.W. *The History and Prospect of British Education in India*, Cambridge, 1891.

Tripathi, A. *Trade and Finances in Bengal Presidency*, Oxford University Press, Calcutta, 1979.

Vakil, K.S. & Natarajan, S. *Education in India*, Allied Publishers, Kolkata, 1954

Verelst, Harry, *A View of the Rise, Progress, and Present State of the English Government in Bengal*, London, 1772.

Weber, Max, *Essays in Sociolosy* (Trans.) by H. H. Gerth and Wright Mills, Nutt, London, 1946.

Wilbur, Marguerite Eyer, *The East India Company*, Stanford University Press, 1950.

Wolf, Eric, *Peasant Wars of the Twentieth Century*, Harper and row, New York, 1969.

বাংলা গ্রন্থ

আজাদ, লেলিন, *ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো*, ইউ পি এল, ঢাকা, ১৯৮৯।

আচার্য, মিহির, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস ও সমাজ ভাবনা*, লেখক সমাবেশ, কলকাতা, জুলাই ১৯৩৫।

আনসারী, মুসা, *ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৮।

আলী, এম. ওয়াজেদ, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

আলীম, এ. কে. এম. আবদুল, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জুলাই ২০০২।

আহমদ, এ. এফ. সালাহউদ্দিন, *বাংলার ইতিহাস, সমাজ ও ঐতিহ্য*, (প্রবন্ধমালা), প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩।

ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, চয়নিকা, ঢাকা, জুলাই ২০১৩।

ইসলাম, সিরাজুল, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

উমর, বদরুদ্দীন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৩।

উমর, বদরুদ্দীন, *বাঙলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৮৫।

করিম, আবদুল, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

খান, কে. এম. রাইছউদ্দিন, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ২০১৩।

ঘোষ, বারিদবরণ, রামগোপাল ঘোষ, জীবন ও সাধনা, কলকাতা, ১৯৮৫।

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)*, পাঠভবন, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৬০।

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০২ (বঙ্গাব্দ)।

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, মার্চ ১৯৪৮।

ঘোষ, বিনয়, *বিদ্রোহী ডিরোজিও*, মুদ্রাকর প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৭।

চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার, (সম্পাদিত) *বাংলার রেনেসাঁস প্রসঙ্গে*, কার্তিক ১৩৬০।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *গ্রন্থাবলী*, প্রথম ভাগ, বসুমতি সংস্করণ।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্গদেশের কৃষক (দেশের শ্রীবৃদ্ধি)*।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, *বাঙালির জাতীয়তাবাদ*, ইউ পি এল, ঢাকা, ২০০০।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান* (অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৪০০ (অখণ্ডসূচি-সহ একত্র প্রকাশ)।

দত্ত, রমেশ চন্দ্র (মূল) শিশিরকুমার মজুমদার (অনূদিত), *দি পিজ্যান্ট্রি অফ বেঙ্গল*, দীপায়ন, কলিকাতা, ১৩৯২।

দে, অমলেন্দু, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী*, রত্ন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮১।

দেশাই, এ আর, *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*, মনস্বিতা সান্যাল (অনূদিত), কে পি বাগচী, কলিকাতা, ১৯৯২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, *নববাবু বিলাস*, কলকাতা, ১৩৪৪।

বসু, স্বপন, *গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙলী সমাজ*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৯৮৭।

বাছির, আবদুল, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্তশ্রেণি (১৭৫৭-১৮৫৭)*, বাংলা একাডেমী, ২০১২।

ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৫।

ভট্টাচার্য, কুমুদকুমার, *রাজা রামমোহন রায়, বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি*, বর্ণ পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৯২।

মওদুদ, আবদুল, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

মজুমদার, বামাচরণ, *বাঙ্গলার জমিদার*, উইলকিনস প্রেস, কলকাতা, চৈত্র ১৩২০।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১।

মজুমদার, মোহিতলাল, *বাংলার নবযুগ*, জ্ঞানোদয় প্রেস, কলিকাতা।

মাইতি, প্রভাতাংশু, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, পুনঃমুদ্রণ ২০১২।

Dhaka University Institutional Repository

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, *প্রাক্-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭)*, কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোঃ কলকাতা, ১৩৬৫ (বঙ্গাব্দ)।

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী),* কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোঃ কলিকাতা, ১৯৫৮।

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী),* কে. পি. বাগচী এ্যান্ড কোঃ কলিকাতা, ১৯৮৭।

মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, *বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক*, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮।

মিত্র, রাধারমণ, *কলকাতা দর্পণ*, ১ম ভাগ, কলিকাতা, ১৯৮০।

রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, বুক ওয়ার্ল্ড, কলিকাতা, ১৯৯৬।

রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস*, বুক ওয়ার্ল্ড, কলকাতা, ২০০২।

রহমান, হাবিবুর, *সুবা বাংলার ভূ-অভিজাততন্ত্র* , ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৩।

রহিম, আবদুর, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১২০৩-১৫৭৬ খ্রি)*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রহিম, এম. এ. *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, মে ১৯৯৪।

রায়, বিনয় ভূষণ, 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি', এক্ষণ, ১৭শ বর্ষ, ১-২ সংখ্যা, ১৯৩১।

সরস্বতী, শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, *বঙ্গের কৃতী সন্তান*, দি নিউ কমলা প্রেস, কলকাতা, মাঘ ১৩৫২।

সুর, অতুল, *আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৫।

সেন, সুনীল, *বাংলার কৃষক সংগ্রাম*, কলকাতা, ১৯৭৫।

সেনগুপ্ত, প্রমোদরঞ্জন, *নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬০।

Dhaka University Institutional Repository

হক, আবুল কাসেম ফজলুল, *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮।

হাবিব, ইরফান, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)*, (অনুবাদ), কে পি বাগচী, কলিকাতা, ১৯৮৫।

হালদার, গোপাল, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৬৫।

হালদার, গোপাল, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, দ্বিতীয় খণ্ড (নবযুগ), এ,মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৫।

হাশমী, তাজুল ইসলাম, *ঔপনিবেশিক বাঙলা*, প্যাপিরাস, কলিকাতা, ১৯৮৫।

হায়দার, জুলফিকার, *বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম*, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৪।

হোসেন, আমজাদ, *বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পড়ুয়া, শাহবাগ, ঢাকা, ২০০৩।

পত্র-পত্রিকা (বাংলা)

আহমদ, সালাহ্উদ্দীন, আমাদের রেনেসাঁ ভাবনা, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ৩ জুন, ২০০১।

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ চন্দ্র, "মুঘল সম্রাটদের তিনটি ফরমান এবং বঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর সৌভাগ্য লাভ", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ঢাকা, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository